জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

তৃতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

এখন দরকার জনগণের সরকার
মিছিল
গোলামীর জিঞ্জির
ছিন্ন করেছি
দিল্লির দাসত্ব
মানি না মানবো না

স্বাধীনতা
২.০
৩৬শে
জুলাই
২০২৪
তারা কি ফিরবে
আজ সুপ্রভাতে

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	৩য় খন্ড (সিলেট বিভাগ)	
১২৯	শহীদ তারেক আহমেদ	৭-৯
১৩০	শহীদ সোহেল আহমাদ	১০-১২
১৩১	শহীদ এটিএম তুরাব	১৩-১৫
১৩২	শহীদ পঙ্কজ কুমার কর	১৬-১৮
	(ঢাকা বিভাগ)	
১৩৩	শহীদ রিয়াজুল ফরাজী	১৯-২১
১৩৪	শহীদ মো: সজল	২২-২৬
১৩৫	শহীদ মো: শাকিল হোসেন	২৭-২৯
১৩৬	শহীদ নুর মোহাম্মদ সরদার	৩০-৩২
১৩৭	শহীদ মানিক মিয়া	৩৩-৩৫
১৩৮	শহীদ মো: ফরিদ শেখ	৩৬-৩৮
১৩৯	শহীদ মো: আল আমিন	৩৯-৪০
১৪০	শহীদ মো: সাইদুল ইসলাম শোভন	৪১-৪৩
১৪১	শহীদ মো: ইরফান ভূঞা	৪৪-৪৬
১৪২	শহীদ পারভেজ হাওলাদার	৪৭-৪৯
১৪৩	শহীদ ছলেমান	৫০-৫২
১৪৪	শহীদ আফিকুল ইসলাম সাদ	৫৩-৫৫
১৪৫	শহীদ **শহীদুল**	৫৬-৫৮
১৪৬	শহীদ সুমাইয়া বেগম	৫৯-৬০
১৪৭	শহীদ সৈয়দ মো: মোস্তফা কামাল রাজু	৬১-৬৩
১৪৮	শহীদ মো: মনির হোসেন	৬৪-৬৬
১৪৯	শহীদ হয়রত বিল্লাল	৬৭-৬৮
১৫০	শহীদ মো: হোসেন	৬৯-৭০
১৫১	শহীদ শাইখ আস-হা-বুল ইয়ামিন	৭১-৭৪
১৫২	শহীদ মো: হৃদয়	৭৫-৭৬
১৫৩	শহীদ মো: তুহিন	৭৭-৭৮
১৫৪	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৭৯-৮১
১৫৫	শহীদ মো: ছায়াদ মাহমুদ খান (অন্তর)	৮২-৮৫
১৫৬	শহীদ সজল মিয়া	৮৬-৮৮
১৫৭	শহীদ আবদুর হান্নান	৮৯-৯১
১৫৮	শহীদ মো: আদিল	৯২-৯৪
১৫৯	শহীদ আব্দুর রহমান	৯৫-৯৬
১৬০	শহীদ মো: মাবরুর হুসাইন	৯৭-৯৮
১৬১	শহীদ মো: মেহেদী হাসান	৯৯-১০১
১৬২	শহীদ ইমরান হাসান	১০২-১০৩
১৬৩	শহীদ মো: স্বজন	১০৪-১০৬

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
১৬৪	শহীদ মো: মাহফুজ	১০৭-১১০
১৬৫	শহীদ মোশারফ	১১১-১১৪
১৬৬	শহীদ মো: তুহিন	১১৫-১১৮
১৬৭	শহীদ মোহাম্মাদ নুরু	১১৯-১২২
১৬৮	শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ	১২৩-১২৬
১৬৯	শহীদ মো: জুয়েল রানা	১২৭-১৩১
১৭০	শহীদ নাদিমুল ইসলাম এলেম	১৩২-১৩৫
১৭১	শহীদ মো: আরিফুল মিয়া	১৩৬-১৩৮
১৭২	শহীদ মো: সুজন খান	১৩৯-১৪২
১৭৩	শহীদ মো: কবির	১৪৩-১৪৫
১৭৪	শহীদ মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৪৬-১৪৯
১৭৫	শহীদ হাফেজ মো: শরিফুল ইসলাম	১৫০-১৫২
১৭৬	শহীদ মো: তাজুল ইসলাম	১৫৩-১৫৫
১৭৭	শহীদ মো: জাকির হোসেন	১৫৬-১৫৯
১৭৮	শহীদ মো: জুয়েল মিয়া	১৬০-১৬৩
১৭৯	শহীদ মো: নজরুল ইসলাম	১৬৪-১৬৭
১৮০	শহীদ মো: এলিম হোসেন	১৬৮-১৭০
১৮১	শহীদ জাকারিয়া হাসান	১৭১-১৭৪
১৮২	শহীদ মো: রশিদ	১৭৫-১৭৭
১৮৩	শহীদ কামাল মিয়া	১৭৮-১৮০
১৮৪	শহীদ শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত	১৮১-১৮৪
১৮৫	শহীদ মো: অহিদ মিয়া	১৮৫-১৮৮
১৮৬	শহীদ মো: সামিউ আমীন নূর	১৮৯-১৯২
১৮৭	শহীদ মো: রুখতন মিয়া	১৯৩-১৯৬
১৮৮	শহীদ জিয়াউর রহমান	১৯৭-১৯৯
১৮৯	শহীদ মোহাম্মাদ সাইফুল হাসান	২০০-২০২
১৯০	শহীদ মো: সুজন মিয়া	২০৩-২০৫
১৯১	শহীদ ফয়যুল ইসলাম রাজন	২০৬-২০৮
১৯২	শহীদ মো: আশিকুল ইসলাম রাব্বি	২০৯-২১১
১৯৩	শহীদ মো: ইমন মিয়া	২১২-২১৪
১৯৪	শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমান	২১৫-২১৯
১৯৫	শহীদ মো: শাওন	২২০-২২৪
১৯৬	শহীদ সুমন মিয়া	২২৫-২২৯
১৯৭	শহীদ জাহাঙ্গীর আলম	২৩০-২৩৪
১৯৮	শহীদ মো: মহসিন	২৩৫-২৩৭
১৯৯	শহীদ আমজাদ হোসেন	২৩৮-২৪০
২০০	শহীদ রিয়া গোপ	২৪১-২৪৩
২০১	শহীদ আহসান কবির শরীফ	২৪৪-২৪৮

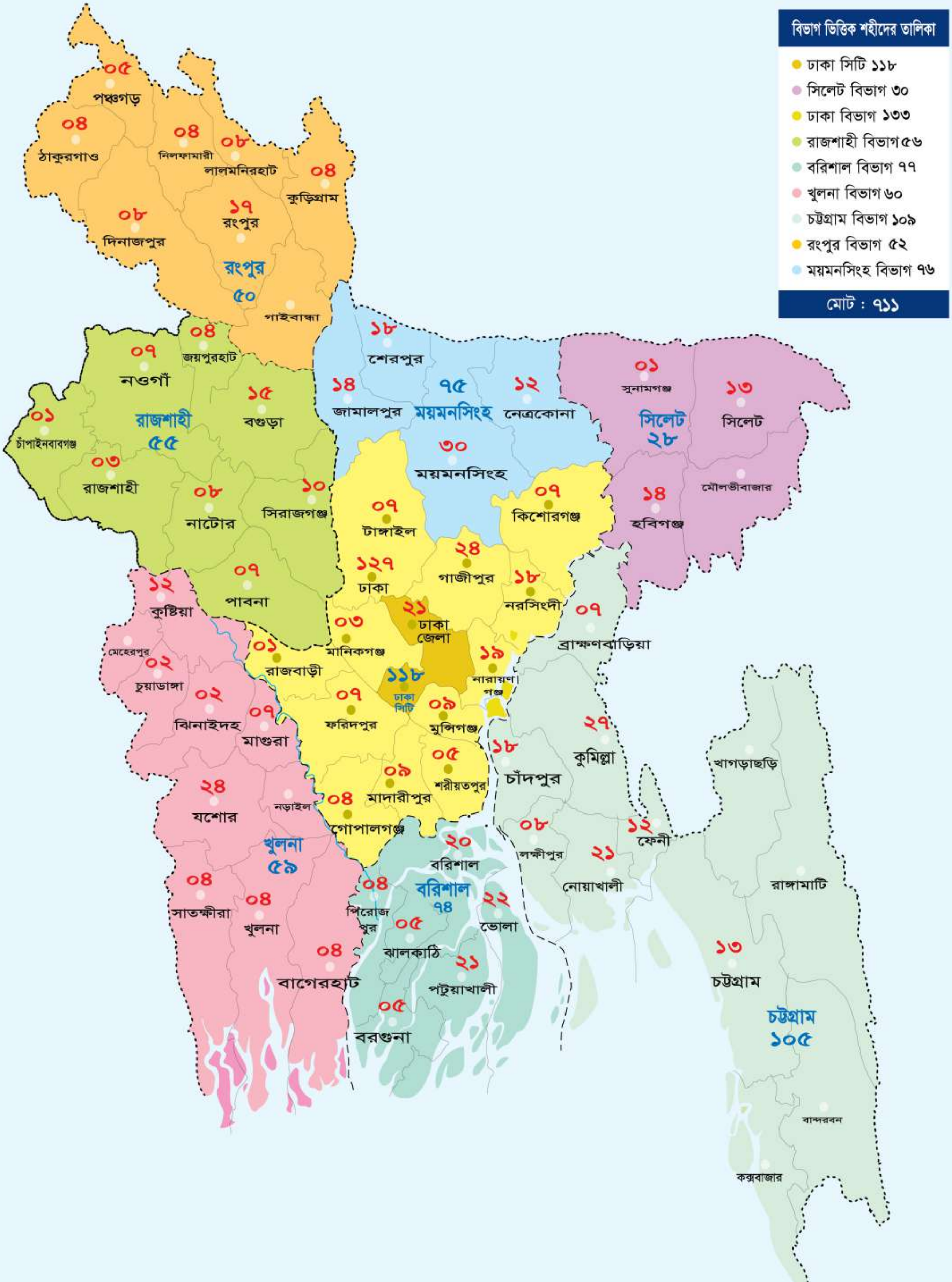

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
১৭ রংপুর
০৮ দিনাজপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
ময়মনসিংহ ৭৫
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০৭ কিশোরগঞ্জ
০১ সুনামগঞ্জ
সিলেট ২৮
১৩ সিলেট
১৪ হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
০৭ টাঙ্গাইল
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
১১৮ ঢাকা সিটি
১৯ নারায়ণগঞ্জ
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
০৮ লক্ষীপুর
১২ ফেনী
২১ নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
২০ বরিশাল
বরিশাল ৭৪
০৪ পিরোজপুর
০৫ ঝালকাঠি
২২ ভোলা
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার

"সন্তানের মুখে বাবা ডাক শোনা হলো না তারেকের"

শহীদ তারেক আহমেদ

ক্রমিক : ১২৯

আইডি : সিলেট বিভাগ ০২৩

পরিচিতি

শহীদ তারেক আহমেদ পেশায় একজন রং মিস্ত্রী। শহীদ হওয়ার মাত্র ২ বছর আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তার ঘরে ৪ মাসের একটি সন্তান রয়েছে। তিনি খুব ভালো একজন মানুষ। দারিদ্র্যতার কারনে জীবনের কোন শখই পূরণ করতে পারেননি। তারেকের ঘরে যখন একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তানের জন্ম হয় তখন আনন্দ নেমে আসে তাঁর জীবনে। ভেবেছিলেন ছেলে বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে স্বপ্ন পূরণ করবেন। কিন্তু মৃত্যুই যেন ছিল তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি। স্বপ্ন আর পূরণ হল না। আওয়ামী ঘাতকের আঘাতে তাঁকেও প্রাণ দিতে হল।

শহীদ তারেক আহমেদের জন্ম ২০০১ সালে সিলেটের বিয়ানীবাজারের নিদনপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। পিতা তাঁকে বাল্যকালেই এতিম করে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেন। তার মাতা মোসা: ইরানুন্নেসা একজন বৃদ্ধ মহিলা, বয়স ৫৫ বছর। পরিবারের অভাব অনটন আর বাবার অকাল মৃত্যুতে তার আর পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি। রং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ শুরু করে পরিবারের হাল ধরেন। থাকার মত কোন ঘর নেই তাঁদের। তাই পরিবার নিয়ে তাঁর চাচার বাড়িতে থাকতেন।

ঘটনার বর্ণনা

আগস্টের ৫ তারিখ, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সারা দেশে থমথমে পরিবেশ। মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলন যেন বড় হতে না পারে সেজন্য সরকার ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন প্রদান করে। সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। ফলে দেশে বিদেশে সকল ধরনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পেশাজীবী, সাংবাদিক, দিনমজুর, রিকশা চালক, ভ্যান চালক, খেটে খাওয়া মানুষ সবাই নেমে এসেছিল সেদিন অধিকার আদায়ের দাবিতে।

তাদেরই একজন ছিলেন শহীদ তারেক আহমেদ

ঐদিন দুপুরে শহীদ তারেক আহমেদ তার বন্ধুদের সাথে সিলেটের বিয়ানীবাজারে আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্ত হন। মিছিল নিয়ে থানার সামনে গেলে স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ বাহিনী আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি নিক্ষেপ করে। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শতাধিক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে আরও অনেকে। শুরুতে দুইটা ছোড়রা গুলি এসে লাগে শহীদ তারেক আহমেদের গায়ে। আরেকটি গুলি এসে লাগে তাঁর বুকে। মানুষ আতঙ্কে ছুটাছুটি করতে থাকে। গুলি বিদ্ধ হয়ে তারেক আহমেদ সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কংক্রিটের রাস্তায় পড়ে থাকে শহীদের নিথর দেহ। আন্দোলনকারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শহীদ তারেক মাহমুদের লাশ পুলিশ টেনে হিঁচড়ে থানার ভিতরে নিয়ে যায়। নিয়ে ফেলে রাখে লাশের স্তুপে। সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে মা ও বোন বাতাসের গতিতে চলে আসেন থানায়। অন্ধকার কুঠুরির ভিতরে ছেলের লাশ দেখে ভয়ে কেঁপে উঠেন মা। মসজিদের মুয়াজ্জিনের সহযোগিতায় ছেলের লাশ শনাক্ত করতে সক্ষম হন তাঁর পরিবার। শোকের সাগরে ভাসতে থাকে তার পরিবার। মায়ের আহাজারি, বউয়ের কান্না, বোনের চিৎকারে ছুটে আসে এলাকাবাসী। ৪ মাসের ছেলে আরিয়ান আহমদ রাফি জানেই না যে সে আর কোনদিন বাবা ডাকতে পারবে না।

দাফন

৬ আগস্ট ফজরের পর শহীদের লাশ বাড়িতে আনা হয়। সেখানেই তার দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়।

পারিবারিক অবস্থা

ছোট বেলায় বাবাকে হারান শহীদ তারেক আহমেদ। বাবাহীন পৃথিবী যে কতটা কঠিন এটা যার বাবা নেই শুধু সেই জানে। তার মা বৃদ্ধ, বয়স ৫৫ বছর। তাঁর একটি ছোট বোন আছে। শহীদ হওয়ার ২ বছর আগে বিয়ে করেছেন। তার একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের বয়স ৪ মাস। তাদের নিজেদের বাড়িটি অনেক

পুরনো এবং জরাজীর্ণ। সংস্কার করার সামর্থ্য নেই। তাই স্ত্রী-সন্তান ও মা বোন কে নিয়ে তাঁর চাচার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। রংমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাতেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে সংকট নেমে আসে। সংসার কে চালাবে? আর ৪ মাসের শিশুর দায়িত্বই বা কে নিবে?

মৃত্যুর প্রমাণ পত্র

নাম: তারেক আহমেদ (২৬ বছর)

পিতা/স্বামীর নাম: পিতা- মৃত রফিক উদ্দিন

ঠিকানা:

বয়স: ২৬ বছর পুরুষ/মহিলা: ধর্ম: ইসলাম পেশা:

ভর্তির তারিখ: সময়:

মৃত্যুর তারিখ: 06/৮/২৪ সময়: 8.20 am

রোগের নাম/মৃত্যুর কারণ: cardiorespiratory arrest

স্বাক্ষর:

হাসপাতাল:

তারিখ:

আবাসিক চিকিৎসক/

ডাঃ শিরিন সুলতানা

কোড: ১৪০২৭২

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ তারেক আহমেদ
পেশা	: রংমিস্ত্রী
জন্ম তারিখ	: ০১/০১/২০০১
জন্ম স্থান	: সিলেটের বিয়ানীবাজার
পিতা	: মৃত রফিক উদ্দিন
মাতা	: মোসা: ইরানুন্নেসা
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: কটুখালিপাড়, মোল্লাপোর, বিয়ানীবাজার, সিলেট

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া

২. এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান

৩. শহীদ পরিবারের সকল খরচ নিশ্চিত করা

শহীদ সোহেল আহমদ

ক্রমিক : ১৩০

আইডি: সিলেট বিভাগ ০২৪

জন্ম পরিচয়

সোহেল আহমদ, জন্ম ১৭ জুন ২০০৩ সালে, সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার কাকুরা গ্রামে। সাধারণ এক গ্রামীণ পরিবারে তার বেড়ে ওঠা। তার পিতা তাখলাসুর রহমান একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন এবং মা পারভীন বেগম সংসারের সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আট সদস্যের এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই সীমিত ছিল, কিন্তু সুখ-শান্তিতে দিন কাটছিল তাদের।

সোহেল ছোটবেলা থেকেই খুব পরিশ্রমী ছিল। তার স্বপ্ন ছিল একদিন পরিবারের দারিদ্র্যতা দূর করবে। তবে তার জীবনের বাস্তবতা ছিল কঠিন। পরিবারের আর্থিক চাপ কমাতে সে টাইলসের কাজ করত। কিশোর বয়সেই তাকে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

বড় হওয়ার সাথে সাথে সোহেল নিজেকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলেছিল। ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার মান এবং ছাত্রদের অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল সোহেলও। সে ছিল সত্যের পক্ষে কণ্ঠস্বর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী।কিন্তু সেই আন্দোলনই তার জীবনের শেষ পরিণতি নিয়ে আসে। ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সহিংসতার শিকার হয়ে সে প্রাণ হারায়। দেশের অনেক তরুণের মতো সোহেলও এক অকাল মৃত্যুর শিকার হয়, তার স্বপ্নগুলো অপূর্ণ রয়ে যায়। সোহেলের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, পুরো গ্রামের জন্য ছিল এক গভীর শোকের বিষয়। তার কষ্টের জীবনের শেষটা যেমন ছিল মর্মান্তিক, তেমনি ছিল তার ত্যাগের ইতিহাসও।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

সোহেল আহমদের বাবা তখলিছুর রহমান স্মৃতি চারণ করে বলেন, "সোহেল আমার বড় ছেলে ছিল, অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত নিয়মিত। ছোট বয়সেই সংসারের হাল ধরেছিল, নিজের স্বপ্নগুলো ত্যাগ করে ভাইবোনদের পড়াশোনার জন্য সবকিছু করত। আমাদের পরিবারের জন্য সে ছিল আশার আলো। তার এভাবে চলে যাওয়া মেনে নেওয়া খুব কঠিন।"

ঘটনাার বিস্তারিত

২০২৪ সালের ২০ জুলাই বিকেল ৪টার সময় নারায়ণগঞ্জে কারফিউ চলছিল। চারদিকে উত্তেজনা, ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সেই সময়ে বিক্ষোভকারীরা নারায়ণগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো ভবন জুড়ে। সেদিন সোহেল আহমদ সেই ভবনের ৩য় তলায় ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি শাখায় টাইলসের কাজ করছিল। সে তার স্বাভাবিক দিনের কাজ করছিল, জানত না, এটাই তাঁর জীবনের শেষ দিন। ওই ভবনের ৮ম তলায় পুলিশের একটি ক্যাম্প ছিল। বিক্ষোভকারীরা যাতে ওই ক্যাম্পে আক্রমণ করতে না পারে, এইজন্য পুলিশ গেট বন্ধ করে দেয়। এর ফলে যারা ভবনের ভেতরে আটকা পড়ে, তাদের জন্য আর কোনো পথ খোলা থাকেনি। আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর সোহেলসহ তিনজন আগুনে আটকে যায়। পুলিশি গেট বন্ধ থাকায় কেউই নিচে নেমে আসতে পারেনি, বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় পুড়ে সোহেল আহমদসহ তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।পরবর্তীতে ময়নাতদন্তে তাদের পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়। সোহেলের মৃতদেহ যখন তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিয়ানিবাজারের কাকুরা গ্রামে নিয়ে আসা হয়, পুরো গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার হারালো তাদের একমাত্র আশার আলোকে। সোহেল, যে ছোটবেলা থেকেই পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল, সেই সোহেল আর ফিরল না। সে নিজে পড়াশোনা না করলেও, ভাইবোনদের জন্য নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করেছিল। তার স্বপ্ন ছিল, ভাইবোনদের মানুষ করা এবং পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়া। সোহেলের এই অকাল মৃত্যু তার পরিবারকে দিশাহারা করে তুলেছে। আট সদস্যের পরিবার এখন চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি আর নেই। সোহেলের মৃত্যুতে শুধু তার পরিবারের নয়, পুরো গ্রাম এবং তার পরিচিতজনদের স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা

সোহেল আহমদ ছিলেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার একজন পরিশ্রমী যুবক, যিনি দারিদ্র্যতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছিলেন। তার পরিবার ছিল আটজনের, যেখানে সবার দায়িত্ব তার কাঁধে। বাবা তখলিছুর রহমান একজন বর্গা চাষী, যার নিজের জমি নেই, পরের জমিতে ফসল ফলিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করতেন। মা পারভীন বেগম ঘরের কাজ সামলাতেন, কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপ তাদের জীবন থেকে কখনো কাটেনি। সোহেল টাইলসের কাজ করতেন–কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য উপার্জন, যা দিয়ে পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়া এবং ভাইবোনদের লেখাপড়ার খরচ চালানো ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। তবুও, সোহেল কখনো হাল ছাড়েননি। তার ইচ্ছা ছিল ভাইবোনদের শিক্ষিত করা, তাদের একটা ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া।কিন্তু এই স্বপ্নগুলো আজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সোহেল আর বেঁচে নেই। তার হঠাৎ মৃত্যু পুরো পরিবারটিকে এক অবর্ণনীয় শূন্যতার মাঝে ফেলে দিয়েছে। পরিবারের যে আশার আলো ছিল, সেই আলো নিভে যাওয়ার পর সংসারটাও যেন থমকে গেছে। ভাইবোনদের পড়াশোনা, পরিবারের খাবার–সবকিছুই এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে আছে। এই পরিবারের দারিদ্র্যতা এখন আরও করুণ, আরও গভীর। সোহেলের মৃত্যুতে শুধু তার জীবন নয়, পরিবারের সব আশাকেও যেন নিঃশেষ করে দিয়েছে।

প্রস্তাবনা

সোহেল আহমদের পরিবার মূলত তার উপর নির্ভর করতো। শহীদ হওয়ার পরেই পরিবারের রুজি রুটির উপর প্রভাব পড়ে। কারণ সোহেল ছিলো পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এত বড় পরিবারের জন্য মাত্র একটি কাঁচা ঘর রয়েছে, যাতে তাদের একসাথে বসবাস করা খুবই কষ্টসাধ্য। নতুন একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তাদের জন্য উপকার হতো। বাবার জন্য একটি ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দুমুঠো ডাল ভাতের জোগাড় হবে। সেই সাথে স্কুলগামী ভাই-বোনদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: সোহেল আহমদ
পেশা	: দিনমজুর
জন্ম তারিখ	: ১৭/০৬/২০০৩
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: কাকুরা, ইউনিয়ন : কাকুরা, থানা: বিয়ানিবাজার, জেলা: সিলেট
পিতা	: তখলিছুর রহমান
বয়স	: ৫০, পেশা: কৃষি
মাতার নাম	: পারভীন বেগম পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪০
পারিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৯ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৩ বোন ৩ ভাই ১. রুবেল আহমেদ, বয়স: ১৮, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: জমশেদ আহমাদ উচ্চ বিদ্যালয় ৯ম শ্রেণি ২. জুয়েল আহমদ, বয়স ১২, পেশা: শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান: রহমতাবাদ দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদ্রাসা, ৬ষ্ঠ ৩. তুয়েল আহমদ, বয়স: ১১, প্রতিষ্ঠান: কাকুরা সরকারি প্রা: বিদ্যালয়, ৫ম শ্রেণি ৪. ফরিদা খাতুন, বয়স ১৬, প্রতিষ্ঠান: জমশেদ আহমাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ৮ম শ্রেণি ৫. আবেদা খাতুন,বয়স: ১৩, প্রতিষ্ঠা: জমশেদ আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়, ৮ম শ্রেণি ৬. আনজুমা খাতুন, বয়স: ৭, প্রতিষ্ঠান: জমশেদ আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়, ১ম শ্রেণি

সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ফেরার সুযোগ পেলনা তুরাব

শহীদ এটিএম তুরাব

ক্রমিক : ১৩১

আইডি : সিলেট বিভাগ ০২৫

জীবনশৈলী

শহীদ এটিএম তুরাব ১ জুলাই ১৯৯০ সালে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার ফতেহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম (মৃত) মোঃ আব্দুর রহিম, মাতার নাম মমতাজ বেগম। তিনি মোটামুটি একটি স্বচ্ছল পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করেন। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। সবসময় সবার চোখের মণি হয়ে থাকতেন। বড় ভাই-বোনের আদরেই শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তুরাবের। ছোটবেলা থেকে হাস্যোজ্জ্বল প্রাঞ্জল একজন শিক্ষার্থী ছিল তুরাব। বড় আপার সাথে খুনসুটি, ভাইদের সাথে মারামারি আবার পরক্ষণেই গলাধরে খেলার মাঠে যাওয়া সবই ছিল তার জীবনের স্মৃতিপটে।

ধীরে- ধীরে হাটি- হাটি, পা-পা করে স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজ, কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমায় সে। এর মধ্যে তার বড় আপা ফাতেহা বেগম চলে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে বড় ভাইও ফ্রান্সে চলে যায়। তার বুকের একপাশ খালি হয়ে যায়। কিন্তু করার কিছু নেই। জীবনে সবকিছুই মেনে নিতে হয়, এই ভেবে সেও সবকিছু মেনে নিতে শুরু করে। তখন সে তার মা এবং সমবয়সী ভাই আবুল আহসানের সাথে থাকে।

বিবাহিত জীবন

মাত্র দুই মাস আগে বিয়ে হয়েছিল সাংবাদিক এটিএম তুরাবের। বিয়ের কিছুদিন পর দেশ ছেড়ে চলে যান তার যুক্তরাজ্য প্রবাসী স্ত্রী তানিয়া ইসলাম। তুরাবের মৃত্যুর দিন তার স্ত্রী খবর পেয়েও টিকিটের জোগাড় করতে না পারায় আসতে পারেনি। একমাত্র মাধ্যম ছিল তুরাবকে অনলাইনে শেষ দেখাটা দেখে নেয়া। কিন্তু স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের অন্যতম কেনা গোলাম জুনায়েদ পলক বাংলাদেশের মানুষকে বেখবর রাখার জন্য ১৭ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ রাখে। যার ফলে তুরাবের নতুন স্ত্রী তানিয়া তাকে শেষ দেখাটাও দেখতে পারেননি। এতে তুরাবের স্ত্রী তানিয়া পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। কিন্তু প্রবাসে তার স্ত্রীকে স্বান্তনা দেয়ার মত কেউ ছিলনা। একজন নববধূর কান্নায় প্রকম্পিত হয় যুক্তরাজ্যের আকাশ পাতাল। বুকফাটা কান্না করে হৃদয়ের দুঃখ মেটানো ছাড়া কোনো উপায় তার হাতে ছিলনা।

কথা ছিল, তুরাবকেও সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করবেন তানিয়া, কিন্তু তা আর তুরাবের ভাগ্যে হলো না।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

৫ জুলাই শিক্ষার্থীদের কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এরপর তা একনাগারে চলতে থাকে এবং দিন যেতে থাকে আর মিছিল, মিটিং সমাবেশ এক পা দু পা করে কঠোর হতে থাকে। কিন্তু ১৫ তারিখে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের গুন্ডা ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হয়। এতে বিক্ষুব্ধ হয় সাধারণ ছাত্র-জনতা। এক সময় তারাও হাতে লাঠি, স্ট্যাম্প, বাঁশ যে যা পারে তাই তুলে নেয়। এরই মধ্যে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা বলেন,' "মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিদের চাকরি দিবনা তো কি রাজাকারের নাতি-পুতিদের চাকরি দিব?' যা ছিল আগুনে পানি ঢালার বদলে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘি ঢালার মতো অবস্থা। এতে শিক্ষার্থীদের গরম রক্ত বারুদে রূপান্তরিত হতে থাকে।"

এই বিপ্লবে অংশ নেয়নি এমন কোনো শ্রেনি পেশার লোক নেই। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী, রিক্সাওয়ালা, সিএনজি ওয়ালা, সবজি ওয়ালা, মুদি দোকানদার। এদেরকে বলা হয় মাঠ কর্মী। কিন্তু দেশের মানুষ কে যারা সকল বিষয়ে খবর দিতে থাকেন অর্থাৎ সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেন ন্যাপরায়ণ, সৎ, আদর্শবান সাংবাদিক গোষ্ঠী।

সেরকমই একজন গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক তুরাব সিলেটের অবস্থা সকলকে জানানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। কর্মজীবনে তিনি সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। তিনি দৈনিক জালালাবাদ এর স্টাফ রিপোর্টার এবং দৈনিক নয়া দিগন্তের ব্যুরো চিফ ছিলেন ।

যেভাবে শহীদ হলেন

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ১৯ জুলাই দুপুরে নগরের বন্দরবাজার এলাকা থেকে সিলেটের ছাত্র-জনতা মিছিল বের করলে আচমকাই সেখানে নির্যাতক পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায় মিছিলকারীদের।

স্বৈরাচার হাসিনার অস্ত্রধারী পুলিশ বাহিনী মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ঐদিন আরও কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তুরাব। আচমকা সংঘর্ষ শুরু হলে তৎক্ষণাৎ নিজেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ পাননি তিনি। পুলিশের ছোঁড়া গুলি হঠাৎ তুরাবের চোখে এবং গায়ে লাগে। সেখানে কাতরাতে থাকে তুরাব কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে ঘাতক পুলিশ বাহিনীর এলোপাতাড়ি গুলির মাঝে তৎক্ষণাৎ তার সহকর্মীরা তাকে সরাতে পারেনি।

সংঘর্ষ শুরুর কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত সহকর্মীরা দেখেন তুরাব মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে তার সহকর্মীরা তাকে সিলেটের ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে তুরাবের অবস্থা দেখে তাকে চিকিৎসার জন্য ইবনেসিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

পরে সেখান থেকে তাকে নগরের সোবহানীঘাট এলাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে নেয়া হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ইবনে সিনা হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থান তুরাবের মৃত্যু হয়। পরের দিন ২০ জুলাই ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তুরাবের মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান শামসুল ইসলাম জানান, নিহতের শরীরে ৯৮টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। গুলিতে তার লিভার ও ফুসফুস আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মাথায় ঢিলের আঘাতও ছিল। এ কারণেই তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তার মৃত্যুর ঘটনা সিলেটের আপামর জনসাধারণের কাছে সারা দেশে একটি আলোচিত ঘটনা হয়ে ওঠে, যা স্বৈরাচারী পতনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শহীদ তুরাবকে সিলেটের বিয়ানীবাজার ফতেহপুরস্থ পারিবারিক কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: এটিএম তুরাব
জন্ম তারিখ	: ১ জুলাই ১৯৯০
পিতার নাম	: মো: আব্দুর রহিম (মৃত)
মাতার নাম	: মমতাজ বেগম
পেশা	: সাংবাদিক, স্টাফ রিপোর্টার জালালাবাদ, ব্যুরো চিফ দৈনিক নয়াদিগন্ত
পারিবারিক সদস্য	: ৫ জন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ফতেহপুর, ইউনিয়ন: ফতেহপুর, থানা: বিয়ানীবাজার, জেলা: সিলেট
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: ১০৫ নবপুষ্প, এলাকা: যতরপুর, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: সিলেট
ঘটনার স্থান	: কোর্ট পয়েন্ট, সিলেট
আঘাতকারী	: পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই, জুমার নামাজ পরে
নিহত হাওয়ার সময়	: ঐ
প্রস্তাবনা	: ১. রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদান

"আনন্দ মিছিলে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরলেন"

শহীদ পঙ্কজ কুমার কর

ক্রমিক : ১৩২

আইডি : সিলেট বিভাগ ০২৬

পরিচিতি

শহীদ পঙ্কজ কুমার জন্মগ্রহণ করেন ২০০১ সালের ২ ডিসেম্বর। তার জন্মস্থান ঝালোপাড়া, ভার্থকলা, সিলেট। তার পিতা নিখীল চন্দ্র কর পেশায় একজন সিএনজি চালক। আর মাতা অর্চনা রানী কর একজন গৃহিণী। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন।

শহীদ পঙ্কজ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। দারিদ্র্যতার কারনে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দিতে সিএনজি চালানো শিখেন পঙ্কজ। বাবা-ছেলে দুজনেই ভাড়ায় সিএনজি চালিয়ে সংসার চালাতেন। আর ছোট দুই ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট ভাই পল্লব কুমার কর দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আর ছোট বোন অনন্যা কর ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

বিস্তারিত ঘটনা

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পতন ঘটে। স্বৈরশাসক খুনী হসিনা সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে গোপনে পালিয়ে যায়। এর আগে খুনী হাসিনার সরকার দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে। গুম-খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অন্যায়, জুলুম, অবিচার, অত্যাচার, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, অর্থ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। তাদের অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা পূর্বাপর সকল স্বৈরশাসককে ছাড়িয়ে যায়। দীর্ঘদীনের ক্ষোভ জনগনের মনে দানা বেঁধে উঠে আন্দোলনে রুপ লাভ করে। দলীয় পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে জনগনের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পুলিশের পৈশাচিকতা ৭১'র পাক হানাদার বাহিনীকেও ছাপিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলন রুপ নেয় স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে সরকার মারমুখি নীতি অবলম্বন করে। ক্যাম্পাসগুলাতে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলো ছিল ছাত্রলীগের টর্চার সেল। শিবির ট্যাগ দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। দেশের পক্ষে কথা বলায় বুয়েটের আবরার ফাহাদ কে ছাত্রলীগের টর্চার সেলে নিয়ে রাতভর অত্যাচার চালায়। সকালে তার মৃত দেহ বের করে আনে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিবির সন্দেহে হিন্দু ধর্মের বিশ্বজিৎ কে কুপিয়ে হত্যা করে। ব্যবসায়ীরা চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তুলে নিয়ে নির্যাতন করত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। ধর্ষণ, মাদক কারবারি, চোরাচালান, হল দখল সব ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল কুখ্যাত ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ করলে যেন সকল কিছুই জায়েজ। শত শত অপরাধ করেও পার পেয়ে যেত ছাত্র সংগঠনের নামে ইতিহাসের কলঙ্কিত ঘৃণ্য ছাত্রলীগের এসব সন্ত্রাসীরা। সরকারের এমপি মন্ত্রীদের শেলটারে অপরাধ করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরাত এসব অপরাধীরা।

দীর্ঘদীনের ক্ষোভ জনগনের মনে দানা বেঁধে উঠে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। দীর্ঘ ৩৬ দিন রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈচারের পতন ঘটে।

৫ আগস্ট খুনি হাসিনার দেশ পলায়নের খবর ছড়িয়ে পরলে সারা দেশে আনন্দ মিছিল বের হয়। বিকেল ৪:৩০ এর দিকে পঙ্কজ তার এলাকার বন্ধুদের সাথে বিজয় মিছিলে অংশ নেয়। কিন্তু আর বাড়ি ফিরেনি। এদিকে অনেক রাতেও বাড়িতে ফিরতে না দেখে তার পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়ে। সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরিবার পরিজনের সাথে আত্মীয়স্বজনরাও যুক্ত হন। তারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে ব্যর্থ হয়। কোথাও না পেয়ে সিলেট ওসমানী হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে খোঁজ করতে থাকেন। এদিকে ছেলেকে হারিয়ে মা পাগলপ্রায়। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেন। এভাবে ৩ দিন কেটে যায়। শহীদ পঙ্কজের কোন খোঁজ মেলে না। আগস্টের ৮ তারিখ সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটা অজ্ঞাত নাম্বার থেকে কল আসে। ফোন কল থেকে জানতে পারে কোতোয়ালি থানায় কয়েকটি বেওয়ারিশ লাশ পড়ে আছে। পঙ্কজের লাশ আছে কিনা এসে দেখতে বলে। আবার কালিঘাটের মসজিদ থেকেও কয়েকটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত থানায় যায় শহীদের পরিবার। থানায় গিয়ে অনেকগুলো লাশ দেখে হতম্ব হয়ে যান তারা। এমন ভয়ানক দৃশ্য তারা আগে কখনো দেখেননি। দেয়ালের পাশে ছেলের লাশ দেখে চিহ্নিত করতে আর কষ্ট হয়নি মায়ের। ছেলেকে এমন বীভৎস অবস্থায় দেখে কান্নায় ফেটে পড়েন। তাকে খুব নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ঘাতকের দল হায়েনার মত অত্যাচার করেছে শহীদ পঙ্কজ কে। কোন সুস্থ মানসিকতার মানুষের পক্ষে এমন নির্মমভাবে কাউকে হত্যা করা সম্ভব না। ঘাতকেরা হত্যার পূর্বে তার হাত-পা ও বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। তাতেও ক্ষান্ত হননা। বুকের ভিতর বুলেট নিক্ষেপ করে হত্যা করে।

শেষকৃত্য

সেদিনই থানা থেকে শহীদ পঙ্কজের লাশ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। শহীদের লাশ চিতার আগুনে পুড়তে থাকে আর এদিকে তার পরিবার আত্মীয়স্বজনদের বুকে স্বজন হারানোর কষ্টের আগুন জ্বলতে থাকে।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ পঙ্কজের পরিবার আর্থিকভাবে অসচ্ছল। তার পিতা নিখীল চন্দ্র কর পেশায় একজন সিএনজি চালক। আর মাতা অর্চনা রানী কর গৃহিণী। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন।

শহীদ পঙ্কজ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। দারিদ্র্যতার কারনে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরিবারে আর্থিক সহযোগিতা দিতে সিএনজি চালানো শিখেন। বাবা-ছেলে দুজনেই ভাড়া সিএনজি চালিয়ে সংসার চালান। আর ছোট দুই ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Banglad
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: পংকজ কুমার কর
Name: PONKOJ KUMAR KOR
পিতা: নিখীল চন্দ্র কর
মাতা: অর্চনা রানী কর
Date of Birth: 02 Dec 2001
ID NO: 8723702703

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ পঙ্কজ কুমার কর
পেশা	: সিএনজি চালক
জন্ম তারিখ	: ০২/১২/২০০১
জন্ম স্থান	: ঝালোপাড়া, ভার্থকলা, সিলেট
পিতা	: নিখীল চন্দ্র কর
মাতা	: অর্চনা রানী কর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নৃ শিংহ, জিউর আখড়া ইউনিয়ন: ঝালোপাড়া, ভার্থখলা থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নৃ শিংহ, জিউর আখড়া ইউনিয়ন: ঝালোপাড়া, ভার্থখলা থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া
২. এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
৩. শহীদ পরিবারের সকল খরচ নিশ্চিত করা

শহীদ রিয়াজুল ফরাজী

ক্রমিক : ১৩৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০১

শহীদের পরিচয়

সহায় সম্বলহীন একেবারেই নিঃস্ব পরিবারের সন্তান দিনমজুর রিয়াজুল ফরাজী ১৯৮৪ সালের ৫ মে ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভিটেমাটি এবং কৃষি জমি কিছুই ছিল না শহীদের। দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরতা মেয়ে খুকুমণি এবং স্ত্রীকে সাথে নিয়ে অন্যের জমিতে ঘর তুলে বসবাস করতেন তিনি। মহাবীর রিয়াজুল ফরাজী দিনমজুরি করে কোনক্রমে জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাকে হারিয়ে চার সদস্যের এই পরিবারটি এখন দিশেহারা। বর্তমানে শহীদের স্ত্রী অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা কোটাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। আন্দোলনের নামকরণ করা হয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যার যাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে গ্রাম হতে শহর অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দোলন দমাতে মারণাস্ত্র হাতে তৎপর ছিল খুনি হাসিনার পুলিশ, বিজিবি, ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান সহযোগী বিতর্কিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। গত ১৫ বছরে সরকারি বাহিনী এবং দলীয় সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে পুরো দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল আওয়ামী হায়েনারা। তাদের অপতৎপরতা রুখে দিতে তৎপর হয়ে উঠে এদেশের স্বাধীনতাকামী আপমর জনসাধারণ। একপর্যায়ে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। জনসাধারণের এমন তৎপরতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ফ্যাসিস্ট সরকার। নির্বিচারে গণহত্যায় মেতে উঠে ঘাতক দল। এই গণহত্যায় বাদ পড়েনি শিশু থেকে শুরু করে দিনমজুর।

মুক্তিকামী জনতা রাতের পর রাত নির্ঘুম অবস্থায় অতিবাহিত করে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নির্ভীক ছাত্র জনতা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। স্নাইপার, রাইফেল, হেলিকপ্টার হতে গুলিবর্ষণ কোন কিছুই তোয়াক্কা করেনা তারা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের আহবানে সাড়া দিয়ে রাজপথে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সারাদেশে বাংলাব্লকেড, কমপ্লিট শাটডাউনসহ নানামুখী কর্মসূচী পালন করা হয়।

আন্দোলনের একপর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। ০৪ আগস্ট উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুন্সীগঞ্জ জেলার পিটিআই মোড়ে অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা। মুক্তিকামী জনতার সাথে রিয়াজুল ফরাজিও সেদিন উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে উক্ত কর্মসূচিতে নরখাদক খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেয়া আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা দেশী-বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বেধড়ক লাঠি পেটা করে শহীদ রিয়াজুল ফরাজীকে। আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও ক্ষান্ত হয়নি নরখাদকেরা। মানবতার চরম দুশমন আওয়ামী হায়েনারা ফরাজীর মৃত্যু নিশ্চিত করতে এক পর্যায়ে তাঁর মাথায় কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। অতঃপর ঘটনাস্থলেই এই নিঃস্ব দিনমজুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্থানীয় লোকজন মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়াজুল ফরাজীকে মৃত ঘোষণা করেন। মুন্সীগঞ্জের মাটিতেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

দেশ মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গকারী রিয়াজুল ফরাজীর ভিটে-মাটি, কৃষি জমি কিছুই নেই। এই মুহূর্তে সংসারে দুমুঠো আহার যোগান দাতা কিংবা পরিবারের হাল ধরার মত কোন অবলম্বন অবশিষ্ট নেই। ফলে বাধ্য হয়ে হৃদরোগী বিধবা রুমা বেগম অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ শুরু করেছেন। অসুস্থ শহীদ পত্নীর দৈনন্দিন প্রায় দেড়শ টাকার ওষুধ প্রয়োজন হয়। রিয়াজুলের ছোট মেয়ে খুকুমণি দশম শ্রেণির ছাত্রী। বড় মেয়ে রিয়ামনি বিবাহিতা। তার একটি ছেলে সন্তানও রয়েছে। তবে স্ত্রী ও সন্তানের খবর রাখে না শহীদ জামাই। এমতাবস্থায় চার সদস্যের এই পরিবারটি দিশেহারা অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: রিয়াজুল ফরাজী
পিতার নাম	: মৃত কাজীম উদ্দিন ফরাজী
মাতার নাম	: মৃত শামসুন্নাহার বেগম
জন্ম তারিখ	: ৫ মে ১৯৮৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর ইসলামপুর, ইউনিয়ন: উত্তর ইসলামপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর ইসলামপুর, ইউনিয়ন: উত্তর ইসলামপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
স্ত্রী	: রুমা খাতুন
ছেলে-মেয়ে	: দুই মেয়ে। বড় মেয়ে রিয়ামনি বিবাহিতা। ছোট মেয়ে খুকুমণি দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত
শহীদ হওয়ার স্থান	: পিটিআই মোড়, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ
শহীদ হওয়ার সময়	: ৪ আগস্ট ২০১৪, সকাল ১০:৩০ মিনিট
যাদের আক্রমণে শহীদ	: খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনী। (আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগ বাহিনী)

পরামর্শ

১. পরিবারে কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় পরিবারটির নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন
২. ছোট মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করা জরুরি
৩. অসুস্থ বিধবা স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয় বহন করা দরকার
৪. বড় মেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার

নিউজ লিংক

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/l8qzupc741
https://www.rtvonline.com/country/292108
https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/khobor/113708

শহীদ মো: সজল

ক্রমিক নং : ১৩৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০২

শহীদ পরিচিতি

১৯৯৩ সালের ২০ অক্টোবর এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার উত্তর ইসলামপুর গ্রামে জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর মোল্লা ও মৃত সাহিদা বেগমের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় বীর মুক্তিকামী তেজস্বী মো: সজল। বাল্যকাল থেকে অভাবের আচ্ছাদন থাকায় লেখাপড়া হয়নি শহীদের। কিশোর বয়সে পরিবারের দায়িত্ব এসে বর্তায় তাঁর উপর। দিনমজুরি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে উপার্জন শুরু করেন। এরপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর। নিজেকে ধীরেধীরে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যায় মহাবীর সজল। শহীদ সহোদরদ্বয় পেশায় দিনমজুর। সজল বাবার বয়স ৭২ বছর হয়েছে। বয়সের ভারে চলাফেরা করতে অক্ষম তিনি। শহীদ তাঁর উপার্জন দিয়েই অসুস্থ পিতাকে নিয়ে বসবাস করতেন। বিপত্নীক বৃদ্ধ আকবর মোল্লার সজলই ছিলেন একমাত্র ভরসাস্থল।

আন্দোলনের দিনগুলো (৫ জুন থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪)

৫ জুন : মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে হাইকোর্ট।

৬ জুন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

৯ জুন : কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন তারা। বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দেয়। কোটা বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৪ জুলাই দিন নির্ধারণ করা হয়।

১ জুলাই : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটা বাতিলের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় ঢাবিসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহবান জানানো হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়।

২ জুলাই : ঢাবির ছাত্ররা মিছিল নিয়ে এক ঘন্টা শাহবাগ অবরোধ করে রাখে। জাবির ছাত্ররাও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ২০ মিনিটের জন্য অবরোধ করে।

৩ জুলাই : ঢাবির ছাত্ররা শাহবাগ মোড় দেড় ঘণ্টার মতো অবরোধ করে রাখে। ময়মনসিংহে রেললাইনে ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক অবরোধ করে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার মোড়ে সড়ক অবরোধ করে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

৪ জুলাই : প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ 'নট টুডে' বলে আদেশ দেন। পরের সপ্তাহে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে বলে ওই দিন অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় থেকে জানানো হয়। ছাত্ররা ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে ৫ ঘণ্টা।

৫ জুলাই : এই দিন শুক্রবারেও চট্টগ্রাম, খুলনা ও গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনকারী ছাত্ররা।

৬ জুলাই : দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের দিনের মতোই বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্দোলনকারীরা সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেন। নাম দেয়া হয় 'বাংলা ব্লকেড'।

৭ জুলাই : বাংলা ব্লকেডে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

৮ জুলাই : ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ অবরোধ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। সারাদেশের ছাত্রদের নিয়ে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করা হয়।

৯ জুলাই : হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে দুই শিক্ষার্থী আবেদন করে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪ ঘন্টা অবরোধ কর্মসূচি 'বাংলা ব্লকেড' পালন করা হয়। পরদিন সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা 'বাংলা ব্লকেড'-এর ঘোষণা দেয়া হয়।

১০ জুলাই : কোটার বিষয়ে পক্ষগুলোকে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে নির্দেশ আপিল বিভাগের। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। শুনানির জন্য আগামী ৭ আগস্ট দিন রাখা হয়। ছাত্ররা ভুল করেছে মর্মে বক্তব্য রাখেন প্রধান বিচারপতি। তিনি আরো বলেন, রাস্তায় স্লোগান দিয়ে রায় পরিবর্তন করা যায় না। এটি সঠিক পদক্ষেপ না।

১১ জুলাই : পুলিশের বাঁধার মুখেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ পালন করেন আন্দোলনকারীরা। তৎকালীন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করছেন। এটি অনভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বেআইনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছে।

১২ জুলাই : শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। রেলপথ অবরোধ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

১৩ জুলাই : আরাফাত বলেন, বিচারাধীন বিষয়ে সরকারের এখন কিছু করার নেই।

১৪ জুলাই : রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয়। শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারী

ছাত্রদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে রাত নয়টার দিকে ঢাবির বিভিন্ন হলে শ্লোগান ওঠে, তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার! এই শ্লোগান এতোই জনপ্রিয় হয় যে, মুহূর্তেই দেশের সকল পাবলিক ভার্সিটিতে পৌঁছে যায়। সকল ভার্সিটিতেই এই শ্লোগান চলে রাতভর। রাতে চবিতে ছাত্রদের মিছিলে ঘাতক ছাত্রলীগ হামলা চালায়।

১৫ জুলাই : ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলে, আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে। ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম মন্তব্য করে, যাঁরা 'আমি রাজাকার' স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের শেষ দেখিয়ে ছাড়বো। কাদের ও সাদ্দামের মন্তব্যের পর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হানাদার বাহিনী ঢাবির আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। ছাত্রদের ওপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়। ভয়াবহ আক্রমণে ২৯৭ জন ছাত্র আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নেয়। হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগ উভয়ে সমাবেশ করার ঘোষণা দেয়।

১৬ জুলাই : পুলিশের গুলিতে রংপুরে আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে ওয়াসিম, শান্ত, ফারুক ও ঢাকায় সবুজ আলী ও শাহজাহান শাহদাতবরণ করেন। সাদ্দাম আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলে, আমরা দেখে নেব, কত ধানে কত চাল।

১৭ জুলাই : ঢাবিসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়িত করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে সাধারণ ছাত্ররা। পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কফিন মিছিল পণ্ড হয়ে যায়। সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, গায়েবানা জানাজা, কফিন মিছিল এবং দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে সাতটায় জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ছয়জন নিহত হওয়ার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হল বন্ধের ঘোষণা ও পুলিশের তৎপরতার মুখে অনেক শিক্ষার্থী সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পাস ছেড়ে যান। তবে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে রাতেও অনেক ছাত্রছাত্রী হল ও ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিলেন। মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় সরকার।

১৮ জুলাই : ছাত্রদের ঘোষণা অনুসারে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলে হানাদার আওয়ামী পুলিশ বাহিনীর হামলা। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এদিন আন্দোলনের মূল হাল ধরে। মুগ্ধসহ মোট ৪০ জন শাহদাতবরণ করেন। সংঘর্ষ বেশি হয় ঢাকায়। সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন করে স্বৈরাচার সরকার।

১৯ জুলাই : শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়। পুলিশ ও বিজিবির নৃশংস গুলিতে ১১৯ জন শাহাদাতবরণ করেন। এদিন আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এদিন রাস্তায় ছাত্রদের চাইতেও বেশি ছিল নানান শ্রেণি পেশার মানুষ। বলাবাহুল্য সারাদেশের চেয়ে রাজধানী ঢাকা ছিল বেশি অগ্নিগর্ভ। ঢাকার যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, রামপুরা-বাড্ডা, সায়েন্সল্যাব, মিরপুর ১ ও ১০, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, সাভার ছিল আন্দোলনের মূল হটস্পট। রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন। সকল ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তথ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সারাদেশ।

২০ জুলাই : দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন। সাধারণ ছুটি ঘোষণা। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ধাওয়া ও গুলি। উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর। পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে মোট ৭১ জন শাহদাতবরণ করেন। প্রধান সমন্বয়ক নাহিদকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক তিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আট দফা দাবি পেশ। সমন্বয়কদের আরেকটি অংশ ৯ দফা দাবি পেশ করে।

২১ জুলাই : কোটা সংস্কার করে ৭% কোটা রেখে রায় প্রদান করে আদালত। এদিনও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। হানাদার পুলিশ ও বিজিবির নির্মম গুলিতে ৩১ জন শাহদাতবরণ করেন। চার দফা দাবি পূরণের জন্য বৈষম্যবারোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা ৪৮ ঘন্টা সময় বেঁধে দিলেন। চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা, শিক্ষার্থীদের আসার ব্যবস্থা করে দিয়ে হল খুলে দেওয়া, আন্দোলনের সমন্বয়কদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কারফিউ তুলে দেওয়া। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন চারজন সমন্বয়ক। নাহিদকে ব্যাপক নির্যাতন করে রাস্তায় ফেলে রেখে যায় পুলিশ।

২২ জুলাই : কোটা সংস্কার করে প্রকাশিত রায়ের প্রজ্ঞাপনের প্রস্তুতি চলে। প্রতিদিন মানুষ হত্যার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। তবে আন্দোলন স্তিমিত হতে থাকে। এদিনও ১০ জন শাহদাতবরণ করেন। এর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আগের আহত হওয়া।

২৩ জুলাই : কোটাপ্রথা সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারি। সরকার কয়েক হাজার মামলা দিয়ে গণগ্রেপ্তার শুরু করে।

২৪ জুলাই : কোটা আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া গেছে। নিখোঁজ থাকার পাঁচ দিন পর আসিফ ও বাকেরকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দুজনই জানিয়েছেন। আর রিফাত আত্মগোপনে আছেন। ব্লক রেইড দিয়ে গণগ্রেপ্তার চলছেই।

২৫ জুলাই : আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও অন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কোটা সংস্কারের যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, সেটিকে তাঁরা চূড়ান্ত সমাধান মনে করছেন না। যথাযথ সংলাপের পরিবেশ তৈরি করে নীতিনির্ধারণী জায়গায় সব পক্ষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন দিতে হবে।

২৬ জুলাই : এলাকা ভাগ করে চলছে 'ব্লক রেইড'। সারা দেশে অভিযান। সারা দেশে অন্তত ৫৫৫টি মামলা। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬ হাজার ২৬৪। সাদা পোশাকে ডিবি হারুনের সন্ত্রাসীরা হাসপাতাল থেকে ছাত্রনেতাদের তুলে নিয়ে যায়।

২৭ জুলাই : ১১ দিনে গ্রেপ্তার ৯ হাজার ১২১ জন। আতঙ্কে মানুষ ঘরছাড়া। ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করতে থাকে ডিবি হারুন।

২৮ জুলাই : মোবাইল ইন্টারনেট ১০ দিন পর সচল। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে হেফাজতে নিয়েছে ডিবি হারুন। ডিবি হারুন জোর করে গান পয়েন্টে ছাত্রনেতাদের দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি আদায় করে। আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক মাহিন সরকার, আব্দুল কাদের ও আব্দুল হান্নান মাসুদ অজ্ঞাত স্থান থেকে আগের বিবৃতি প্রত্যাহার ও ৯ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।

২৯ জুলাই : ছাত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য খুনী হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলের মিটিং-এ জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়। একইসাথে ছাত্রআন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে খুনসহ অন্যান্য মামলা দিয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গণহত্যাকারী ১৪ দল। ডিবি হারুন কর্তৃক জোর করে বিবৃতি আদায়ের ঘটনায় ছাত্ররা আবার বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জাবি ও রাবিতে পুলিশ ছাত্রদের ওপর হামলা করে। অনেক ক্যাম্পাসে ছাত্রদের সাথে শিক্ষকরাও বিক্ষোভ করে

৩০ জুলাই : হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল করে ছাত্র ও শিক্ষকরা। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান। ফেসবুকের প্রোফাইল লাল রঙের ফ্রেমে রাঙিয়েছেন সারাদেশের মানুষ। গণহত্যাকারীরা কালো ফ্রেম দিয়েছে। তবে সেটা নিতান্তই নগণ্য। নাটক ও সিনেমা সংশ্লিষ্ট মানুষরা খুনী হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেন।

৩১ জুলাই : ছাত্ররা 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস' কর্মসূচি পালন করে। ৯ দফার পক্ষে জনমত গঠন করতে থাকে ছাত্ররা। সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের তোপের মুখে পড়েন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ঢাবির শিক্ষকরা সমন্বয়কদের ছাড়াতে ডিবি অফিসে গেলে পুলিশ তাদের হেনস্তা করে। পরিবারের সাথেও দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

১ আগষ্ট : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দিয়েছে ডিবি।

২ আগষ্ট : ৯ দফা আদায়ের দাবিতে সারাদেশে গণমিছিল করে ছাত্র জনতা। রাজধানীসহ বিভিন স্থানে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে ৩ জন শাহদাতবরণ করেন। পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে ১৫ হাজার মানুষ।

৩ আগস্ট : ৯ দফা না মেনে গণগ্রেপ্তার ও গণহত্যা চালু রাখার প্রতিবাদে শহীদ মিনারে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করে ছাত্র জনতা। সেনাপ্রধান তার সেনা কমান্ডার নিয়ে মিটিং করেন। সেখানে তিনি এই বার্তা পান যে, সেনাবাহিনী আর গুলি করতে প্রস্তুত নয়। কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে নয় দফা বাদ দিয়ে ১ দফার (খুনী হাসিনার পদত্যাগ) ঘোষণা দেয় ছাত্রনেতারা। হাসিনা ছাত্রদের আলোচনা করার প্রস্তাব দেয়। প্রয়োজনে মন্ত্রীদের কয়েকজন পদত্যাগ করার ঘোষণাও দেন। ছাত্ররা সব আলোচনা নাকচ করে দেন। আবারও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় সরকার। শহীদ আবু সাইদের খুনী দুইজন পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ছাত্রজনতাকে রাস্তায় প্রতিহত করতে কড়া নির্দেশ দেয় খুনী হাসিনা।

৪ আগস্ট : রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরাও ছাত্রদের উপর গুলি করে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র ইট পাটকেল দিয়ে সন্ত্রাসী ও হানাদার পুলিশ বিজিবিকে প্রতিরোধ করে। কয়েকটি স্থানে সেনাবাহিনীও গুলি করে। সারাদেশে ১৩০ জন খুন হন। পরদিন ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র জনতা। অনেক আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অফিস ও বাড়িতে আগুন দেয় প্রতিশোধ পরায়ণ ছাত্র-জনতা।

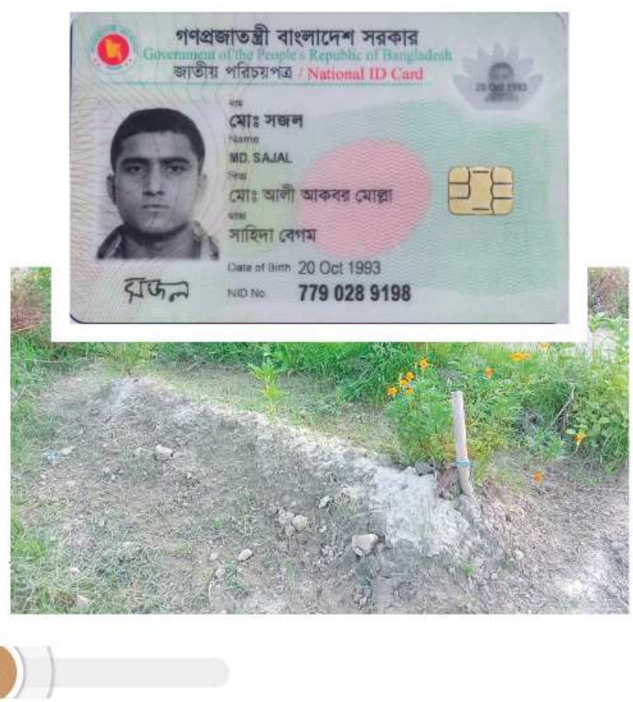

ছাত্র জনতার সাথে। সকাল সাড়ে দশটার পর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হাসিনা পালিয়ে যায়। কর্মরত পুলিশরা এই খবর না জানিয়ে তারা জনতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অনেক মানুষকে তারা খুন করতে থাকে। সেনাবাহিনীর প্রধান দুপুর দুইটায় ভাষণ দিবেন বলে ঘোষণা দেন। ১২ টায় শাহবাগের পুলিশ ও সেনাবাহিনী রাস্তা ছেড়ে দেয়। ১টায় মানুষ জেনে যায়, হাসিনা পালিয়ে গেছে। সারাদেশের বিশেষভাবে ঢাকার মানুষ সব রাস্তায় নেমে নেচে গেয়ে উদযাপন করতে থাকে। গলিতে গলিতে মিষ্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। দেশে বিভিন্ন মোড়ে থাকা স্বৈরাচার মুজিবের সকল মুর্তি ভেঙ্গে দেয় আন্দোলনকারী ছাত্রজনতা। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে। অনেকেই ছাত্রজনতার কোপানলে পড়ে খুন হয়। রাজধানীর মানুষদের একটা বড় অংশ গণভবনে গিয়ে হাসিনার ওপর রাগ ক্ষোভ গণভবনের ওপর ঝাড়ে।

৬ আগস্ট : বাংলাদেশে উদিত হয় নতুন সূর্য।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

রাজধানীর অদূরে অবস্থিত মুন্সিগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রাচীন জনপদ। ঢাকা জেলার নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণেই যেকোনো আন্দোলন সংগ্রামের ঢেউ খুব দ্রুত এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এ অঞ্চলবাসী সারাদেশের ছাত্র-জনতার সাথে অংশগ্রহণ করে। অবৈধ স্বৈরাচার খুনি হাসিনার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ও আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন দমাতে খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনীর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান শত্রু বিতর্কিত আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তৎপর ছিল। পুলিশ, বিজিবি, আনসার, র‍্যাব মারণাস্ত্র হাতে নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশে ৪ আগষ্ট ২০২৪ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। উক্ত কর্মসূচিতে শহীদ সজল অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে আওয়ামী যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা দেশী-বিদেশী অস্ত্র নিয়ে এলোপাথাড়ি হামলা চালায়। ছাত্র-জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। সেই গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তেজস্বী বীর শহীদ সজল। ঘটনাস্থলেই নিঃস্ব দিনমজুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্থানীয় লোকজন মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

দেশ মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ সজলের ভিটে-মাটি, কৃষি জমি কিছুই নেই। ৭২ বছরের অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে শহীদ ও তাঁর ভাই একত্রে সংসার গড়েছিলেন। সহোদরদ্বয় দিনমজুরি করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। এই পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন। বড় ভাই বিয়ে করে স্ত্রী পরিবার নিয়ে আলাদা বসবাস করছেন। উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে শহীদ পিতা পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছেন। বাকরুদ্ধ বৃদ্ধ বাবা প্রায়ই কান্নাকাটি করছেন। বিয়োগের যাতনায় মাঝে মাঝে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলছেন।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: সজল
পিতার নাম	: মোহাম্মদ আলী আকবর মোল্লা
মাতার নাম	: মৃত সাহিদা বেগম
জন্ম তারিখ	: ২০ অক্টোবর ১৯৯৩
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর ইসলামপুর, ইউনিয়ন: উত্তর ইসলামপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: একই
ভাই বোন	: দুই ভাই (বিবাহিত)
শহীদ হওয়ার স্থান	: পিটিআই মোড় মুন্সিগঞ্জ সদর
শহীদ হওয়ার সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১০:৩০ মিনিট
যাদের আক্রমণে শহীদ	: আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বৃদ্ধ পিতার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

২. শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি স্থায়ী আবাসস্থল তৈরি করে দেয়া

৩. একেবারেই অসচ্ছল এই পরিবারটির জন্য একটি নিয়মিত আয়ের উৎস তৈরি করে দেয়া

শহীদ মোঃ শাকিল হোসেন

ক্রমিক : ১৩৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০৩

শহীদ পরিচিতি

২০০২ সালের ৩ নভেম্বর লক্ষীপুর জেলার ১ নং উত্তর হামছাদী ইউনিয়নের কাপিলাতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোঃ শাকিল হোসেন। শহীদ পিতা জনাব বেলায়েত হোসেন একজন ব্যবসায়ী। জননী পারভীন আক্তার চিরাচরিত গৃহিণী। শাহাদত বরণের পূর্বে টঙ্গী সরকারি কলেজের বিএসএস (পাস) ও মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবিএ ৩য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন শাকিল। বাবা মায়ের সুযোগ্য সন্তানের ব্যবহারে যে কেউ মুগ্ধ হত। অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এই তেজস্বী বীর।

শহীদ পিতা গাজিপুর টঙ্গির এরশাদনগর এলাকায় ব্যবসা করেন। তাঁর মাসিক আয় বার হাজার টাকা। এক সময় বেলায়েত হোসেনের ব্যবসা রমরমা ছিল। বর্তমানে বয়স হওয়ায় আগের মত চলাফেরা করতে পারেন না। বেশির ভাগ সময় দোকান বন্ধ রাখতে হয়। ফলে ব্যবসায় লাভের হার তুলনামূলক হ্রাস পেয়েছে। বাধ্য হয়ে দোকানের কর্মচারীকেও অব্যহতি দিতে হয়েছে। দোকান ভাড়া, বাড়ি ভাড়া, সংসারের যাবতীয় খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয় শহীদ পিতাকে। সংসারের আর্থিক টানাপড়েন দেখে টিউশনি শুরু করেছিলেন শাকিল। পাশাপাশি দৈনিক ভোরের আওয়াজ পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে পরিবারের হাল ধরেছিলেন তিনি। ধীরেধীরে অর্থাভাব কমতে শুরু করে। পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

টিউশনি শেষে উত্তরায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে যায়। বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে আমাকে ফোন করে জানায়, আপা উত্তরার পরিস্থিতি খুব খারাপ। হয়তো যে কোনো সময় মারা যেতে পারি। চিন্তা করো না। আমরা যারা অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছি, সবার জন্য মাকে দোয়া করতে বলো। মৃত্যুর আগে মেসেজ করে জানিয়ে দেব। পরবর্তীতে জানতেও পারিনি আমার ভাই কখন স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে গিয়েছে। আজ আন্দোলন সফল হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই আন্দোলনের ফসল দেখে যেতে পারেনি। আমার মায়ের মতো আর কারও মায়ের বুক যেন এভাবে খালি না হয়। শহীদ পিতা বেলায়েত হোসেন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন- 'আমি গ্রামের বাড়ি থাকাবস্থায় ১৮ জুলাই

শাকিল হোসেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। যেখানে সেমিস্টার ফি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। ফলে প্রতি সেমিস্টারে একত্রে অনেক গুলো অর্থের প্রয়োজন হয়। যে কারণে শহীদ জনক নিকট আত্মীয়দের থেকে সন্তানের লেখাপড়া বাবদ ছয়লক্ষ টাকা ঋণ করেন। শহীদ ছিলেন বিবাহিতা তিন বোনের আদুরে একমাত্র ছোট ভাই। শহীদ জননী নয় বছর আগে স্ট্রোক করে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন- 'যদি কোনদিন টিউশনি শেষে শাকিলের বাসায় ফিরতে দেরি হতো আমি ততক্ষণ পর্যন্ত না খেয়ে থাকতাম। এখন আমার শাকিল নেই। আমি ওঁর মা জীবিত হয়েও যেন জীবন্ত লাশ হয়ে পড়েছি।' ছেলের শোকে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন পারভিন আক্তার। শাকিলের শার্টটি (জামা) সব সময় নিজের কাছে আগলে রাখেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শাকিলের বড় বোন বিউটি আক্তার ভাইয়ের শেষ স্মৃতির কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ১৮ জুলাই বেলা ১১টায় আমার ভাই

বিকাল ৫টার দিকে খবর পাই আমার ছেলে আর নেই। সেদিন বিভিন্ন স্থানে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে কুমিল্লার গৌরীপুর পর্যন্ত পৌছাতে পারি।

ততক্ষণে শাকিলের লাশ নিয়ে মানারত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আমার স্বজনরা গৌরীপুর পোঁছায়। আমি ঢাকায় ফিরে না গিয়ে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের দিকে রওনা করি। সেখানে কাফিলাতলী গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে আমার সন্তানকে নিজ হাতে দাফন করি।

আমার ছেলেকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। গুলি তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়ে পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আমি শাকিল হত্যার বিচার চাই। আমার বুকের মানিক হত্যার বিচার চাই। আমার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে শাকিল ছিল একমাত্র ছেলে। আজ সবই আমার কাছে স্মৃতি হয়ে আছে। আমি এখন ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছি। আমি চাই আমার ছেলে যে উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থে জীবন দিয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সফল হোক। আমার ছেলেসহ যারা শহিদ হয়েছে, তাদের রক্তের বিনিময়ে যেন এ দেশে শান্তি ফিরে আসে।

প্রস্তাবনা

১। শহীদ পরিবারের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২। শহীদ জননীর চিকিৎসা খরচ দেয়া যেতে পারে

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: শাকিল হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০৩/১১/২০০২
পিতা	: মো: বেলায়েত হোসেন
মাতা	: পারভীন আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কাপিলাতলী, ইউনিয়ন: ১ নং উত্তর হামছাদী, থানাঃ লক্ষীপুর, জেলা: লক্ষীপুর
পেশা	: ছাত্র
ঘটনার স্থান	: আজমপুর উত্তরা পূর্ব থানার সামনে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৮ জুলাই ২০২৪ ইং সময় : ৪:৩০ মিনিট
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৮ জুলাই ২০২৪ ইং সময় : ৫:৩০ মিনিট, রেডিক্যাল হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি করা হয়
আক্রমণকারী	: পুলিশ

শহীদ নুর মোহাম্মদ সরদার

ক্রমিক ১৩৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০০৪

শহীদ পরিচিতি

দিনমজুর নুর মোহাম্মদ সরদার ২০০৫ সালের ১ মার্চ ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার একমাত্র ভাই দিনমজুর রুবেলকে সাথে নিয়ে নানীর সাথে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। শহীদ নূর মোহাম্মদ সরদারের বয়স যখন ৫ কিংবা ৭ বছর এবং তার ছোট ভাইয়ের বয়স আরো কম তখন তার বাবা তাদের ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান। পরবর্তীতে তাদের মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান। এখন পর্যন্ত তাদের কোনো খোঁজ খবর নাই। অনাথ দুই শিশু সন্তানের আশ্রয় হয় নানীর কাছে। এই মহীয়সী নারী ভিক্ষা করে তাদের প্রতিপালন করেন। সেই নানীকে সঙ্গে নিয়ে তারা একত্রে বসবাস করতেন ভাড়া বাড়িতে। নিহত শহীদ নূর মোহাম্মদ সরদারদের ভিটেবাড়ি, কৃষি জমি এবং আয়ের কোনো উৎসই নেই। বৃদ্ধা নানী উপার্জনক্ষম নাতিকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারাদেশের মানুষ এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অবৈধ দখলদার স্বৈরাচার খুনি হাসিনার দুঃশাসনে সব শ্রেণির মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তারা স্বপ্ন দেখতো এই দুঃশাসন একদিন দূরীভূত হয়ে ন্যায় ও সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শহীদ নূর মোহাম্মদ সরদারের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। দ্বিতীয়বার দেশ স্বাধীনের মাত্র একদিন পূর্বে অর্থাৎ বিজয়ের মাত্র একদিন আগে আওয়ামী হায়েনাদের হাতে নিষ্ঠুর আক্রমণের শিকার হয়ে পরপারে পাড়ি জমান তিনি। ৪ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুন্সীগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পিটিআই মোড়ে অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে। শহীদ নূর মোহাম্মদ সরদার উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়ার যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মীরা অস্ত্রসহ উক্ত কর্মসূচিতে আক্রমণ করে এবং শহীদ নূর মোহাম্মদ সরদারকে বেদম প্রহার করে। এ সময় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে ক্রমাগত মাথায় গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্থানীয় লোকজন মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শহীদ শহীদ সজলকে মৃত ঘোষণা করেন। মুন্সীগঞ্জের মাটিতেই তাকে কবরস্থ করা হয়।

এ ঘটনায় শহীদ নুর মোহাম্মদের নানী সেফালী বেগম বাদী হয়ে মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় মামলাটি করেন। মামলায় ৩১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ২০০-৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ৪ আগস্ট সকালে মুন্সিগঞ্জ শহরে সুপার মার্কেট এলাকার কৃষি ব্যাংকসংলগ্ন স্থানে ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। ওই সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফয়সাল, মৃণাল কান্তি দাস ও সাগুফতা ইয়াসমিন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো: মহিউদ্দিনের যৌথ নির্দেশে অস্ত্র, ককটেল, ছুরি, রামদা নিয়ে আসামিরা ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালান। ওই সময় শহর ছাত্রলীগের সভাপতি নসিবুল ইসলাম, পঞ্চসার ইউপির চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা ও তাঁর ভাই গোলাম কিবরিয়াসহ ১২ জন গুলি চালান। নুর মোহাম্মদকে লক্ষ্য করে বুকে গুলি করে মামলার ১৮ নম্বর আসামি শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাত হোসেন। পরে অন্য আসামিরা তাঁকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করেন। এ ছাড়া তাঁরা ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে, ককটেল বিস্ফোরণ করে, পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ নুর মোহাম্মদ সরদারদের ভিটে-মাটি, কৃষি জমি কিছুই নেই। এক সময়ে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহকারী নানী অন্যের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। উপার্জনক্ষম নাতিকে হারিয়ে তিনি একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছেন। বাকরুদ্ধ বৃদ্ধ নানী প্রায়ই কান্নাকাটি করে দিনাতিপাত করছেন।

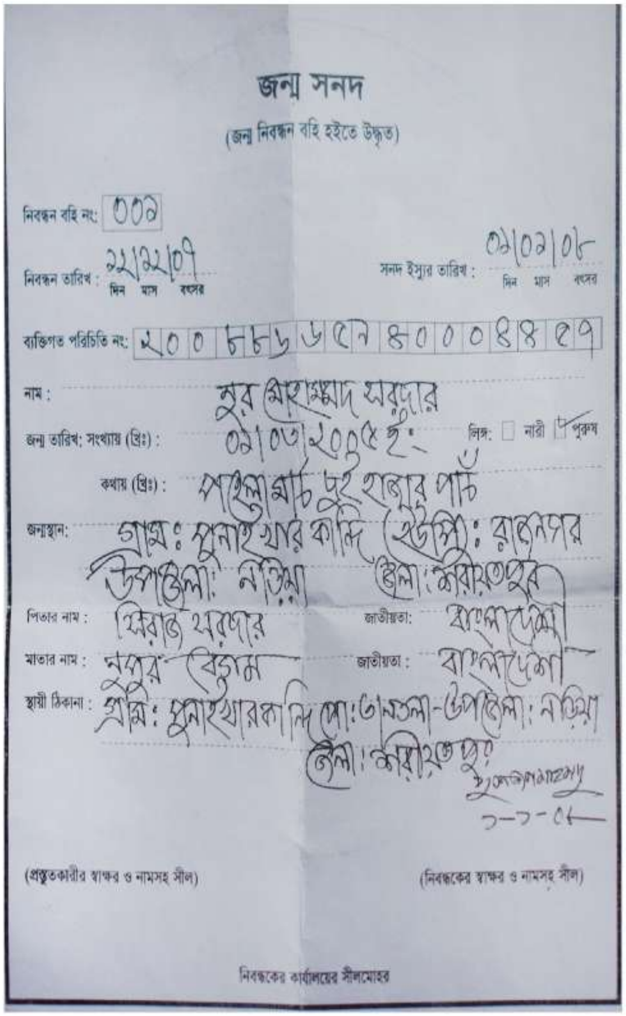

জন্ম সনদ

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ০০২

নিবন্ধন তারিখ: ২২/১২/০৭ (দিন মাস বৎসর)

সনদ ইস্যুর তারিখ: ০১/০২/০৮ (দিন মাস বৎসর)

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ২ ০ ০ ৮ ৮ ৬ ৬ ৫ ৭ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৪ ৫ ৭

নাম: নুর মোহাম্মদ সরদার

জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রিঃ): ০১/০৩/২০০৫ ইং

লিঙ্গ: ☐ নারী ☑ পুরুষ

কথায় (খ্রিঃ): পহেলা মার্চ দুই হাজার পাঁচ

জন্মস্থান: গ্রাম: পুনাইখার কান্দি (ইউপি): রাজনগর উপজেলা: নড়িয়া জেলা: শরীয়তপুর

পিতার নাম: সিরাজ সরদার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: নুপুর বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পুনাইখারকান্দি পো: [illegible] -উপজেলা: নড়িয়া জেলা: শরীয়তপুর

১-১-০৮

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: নুর মোহাম্মদ সরদার
পিতার নাম	: সিরাজ সরদার
মাতার নাম	: নুপুর বেগম
জন্ম তারিখ	: ০১ মার্চ ২০০৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর ইসলামপুর, ইউনিয়ন: উত্তর ইসলামপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: একই
ভাই বোন	: এক ভাই (দিনমজুর)
শহীদ হওয়ার স্থান	: পিটিআই মোড়, মুন্সিগঞ্জ সদর
শহীদ হওয়ার সময়	: ৪ আগস্ট ২০১৪, সকাল ১০:৩০ মিনিট
যাদের আক্রমণের শহীদ	: আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বৃদ্ধা নানী এবং ছোট ভাইয়ের জন্য একটি স্থায়ী আবাসস্থলের ব্যবস্থা করে দেওয়া

২. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করা

৩. ছোট ভাইয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া

শহীদ মানিক মিয়া

ক্রমিক : ১৩৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মানিক মিয়া ১৯৯৮ সালের ২২ শে জুলাই মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: আনিস চৌধুরী এবং মাতা মৃত কানিজ রাবেল। মাতৃহীন শহীদ মানিক মিয়া সরকারি তুলারাম কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মানিক মিয়ার মৃত্যুর ৬ বছর পূর্বে তার মা ইন্তেকাল করেন। দুই ভাই ও এক বোনকে নিয়ে তার ৬৫ বছর বয়স্ক বাবা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নিজের ভিটেমাটি ছাড়া অন্য কোনো জমি না থাকাই অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করতেন। শহীদ মানিক মিয়া পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি ও ফ্রিল্যান্সিং করে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতেন। বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে শহীদ মানিক মিয়া পড়াশুনা শেষ করে পরিবারের হাল ধরবেন। শহীদ মানিক মিয়ার অকাল মৃত্যুতে সেই স্বপ্ন অংকুরেই শেষ হয়ে গেল। তার মৃত্যুতে ভাই, বোন ও বাবা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি শহীদ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের আয় উপার্জন করার মতো আর কেউ থাকলো না।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

কোটা বিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট হাসিনা বিরোধী এক দফা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ছাত্র জনতাসহ দেশের আপামর জনসাধারণ খুনি হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ আন্দোলনে রাজধানী ঢাকার অধিবাসীরা জীবনবাজি রেখে সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশব্যাপী মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ডাক দেয়। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এবং পুলিশ অস্ত্রসস্ত্রসহ উক্ত কর্মসূচিতে আক্রমণ পরিচালনা করে। এসময় শহীদ মানিক মিয়া মাথায় গুলিবিদ্ধ হন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিটে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়। বিজয়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গিত করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

দেশ মাতৃকারের জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ মানিক মিয়ার বাবার ভিটে-মাটি ছাড়া কৃষি জমি বলতে কিছুই নেই। ছোট ভাই আহমাদ চৌধুরী (২০) বিবিএ অধ্যানরত এবং বোন মুক্তার লীলা (১৪) নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিটিকে হারিয়ে পুরো পরিবার দিশেহারা।

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন

মুন্সীগঞ্জের যেসব ছাত্র-জনতার গিয়েছে প্রাণ

মো: সজল

রিয়াজুল ফরাজী

মোস্তফা জামান সমুদ্র

মেহেদী হাসান

আল-আমিন খলিফা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মানিক মিয়া
Name
MANIK MIAH
পিতা
মোঃ আনিস চৌধুরী
মাতা
মৃত কানিজ রাবেল
Date of Birth 22 Jul 1998
NID No. 511 369 8632

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মানিক মিয়া
পিতার নাম	: মো: আনিস চৌধুরী
মাতার নাম	: মৃত কানিজ রাবেল
জন্ম তারিখ	: ২২ জুলাই ১৯৯৮
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রাম গোপালপুর, ইউনিয়ন: দক্ষিণ রাম গোপালপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: রাম গোপালপুর, ইউনিয়ন: দক্ষিণ রাম গোপালপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
ভাই বোন	: এক ভাই, এক বোন
শহীদ হওয়ার স্থান	: ঢাকা চানখারপুল
শহীদ হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২:৩০ মিনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আক্রমণের শহীদ	: আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী এবং পুলিশ

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের বৃদ্ধ পিতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
৩. বিবিএ অধ্যয়নরত ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করা এবং পড়াশোনা শেষে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া
৪. ছোট বোনের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করা

শহীদ মোঃ ফরিদ শেখ

ক্রমিক নং : ১৩৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০৬

শহীদের পরিচয়

শহীদ মোঃ ফরিদ শেখ ১৯৯৩ সালে ঢাকার নিকটবর্তী মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব মোঃ সুলতান মিয়া এবং মাতার নাম মোছাঃ আলো বেগম। শহীদ মোঃ ফরিদ শেখ পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন চলাকালে স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরন করেন।

শহীদ মো: ফরিদ শেখ পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁর পিতা জনাব সুলতান মিয়ার বয়স ৭২ বছর। তিনি কোন কাজ করতে পারেননা। মাতা আলো বেগমের বয়স ৬৪ বছর। তিনি একজন গৃহিণী। শহীদ ফরিদ ছিলেন পরিবারের একমাত্র সন্তান। বৃদ্ধ পিতা-মাতার একমাত্র ভরসার জায়গা। তিনি একাই পিতা-মাতার দেখাশোনা করতেন। তাঁর ক্ষুদ্র আয়েই পরিবার চলত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের বন্যা বইতে শুরু করেছে। তাঁর ছোট একটি মেয়ে আছে। মেয়ের নাম ফাতেমা। বয়স মাত্র দুই বছর। এই অসহায় পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার মত বর্তমানে কেউ নেই।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল বিশ্বের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তরুণরা। তরুণদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পতন হয় স্বৈরাচারী রিজিমের। শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থাকলেও ক্রমান্বয়ে রুপ নেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এরপর সরকার পতনের এক দফা দাবি এবং সর্বশেষ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

অবলম্বন করে। এমনকি মানুষ খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠে; সরকার তখন পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, ডিজিএফআই সহ সকল বাহিনীর সদস্যদের লেলিয়ে দেয় আন্দোলকারীদের বিরুদ্ধে। এর সাথে যুক্ত হয় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের বন্দুকধারী হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা। তারা নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করে। মানুষের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। বাড়ি থেকে তুলে এনে গুলি করে হত্যা করে নিরপরাধ মানুষকে। পুরো জুলাই মাস জুড়ে এ হত্যাযজ্ঞ চালায়।

৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর অন্যায়ভাবে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও ছাত্রলীগ মিলে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ির শনির আখরাতে আন্দোলকারীরা অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে শহীদ মো: ফরিদ শেখ ছিলেন অন্যতম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক ফরিদ সাহসের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। আন্দোলন দমনে সরকারের ঘাতক বাহিনী টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, একে ফরটি, গ্রেনেড, গুলি, ছররা গুলি ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সাধারণ জনতা রাস্তার ধার থেকে ইট পাটকেল

এ বিজয় এমনি এমনি আসেনি। এর জন্য দিতে হয়েছে অজস্র তাজা প্রাণ। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে হাজারো মানুষ। জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে এদেশের আপামর জনতা। আন্দোলনের দিনগুলো ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রতিটা মুহূর্ত কেটেছে ভয় আর আতংক নিয়ে। প্রিয় জনের মৃত্যুর খবর দিয়ে দিন শুরু হয়েছে অসংখ্য মানুষের। কত মা তাঁর সন্তানকে হারিয়েছে। বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে অনেকে। স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে সব ধরনের অসৎ উপায়

নিয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করে। পুলিশের বুলেটের সামনে সাধারণ মানুষ টিকতে পারছে না। পুলিশের গুলিতে একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আন্দোলনকারীরা। চারিদিকে টিয়ারশেলের ধোঁয়া আর এলোপাথাড়ি গুলিতে আশপাশের এলাকা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। টিয়ারশেলের ধোঁয়া চোখে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে। এর মধ্যেই লড়ে যাচ্ছিলেন শহীদ ফরিদ। হঠাৎ একটি গুলি এসে ফরিদের শরীরে বিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর শরীর থেকে অনবরত রক্ত

পড়তে থাকে। কিন্তু তাঁকে দেখার মত কেউ ছিল না। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে যায়। হসপিটালেও তখন নাজেহাল অবস্থা। হসপিটালে রোগীর ভিড় এতই বেশি যে সীট পাওয়া ছিল কষ্টকর ব্যাপার। অবশেষে তাঁকে সেখানে ভর্তি করা হয়। অপারেশন করে গুলি বের করা সম্ভব হলেও তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় ৬ আগস্ট ২০২৪ তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেন।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: শহীদ মো: ফরিদ শেখ
জন্ম	: ২৭-০৪-১৯৯৩
জন্ম স্থান	: মুন্সিগঞ্জ
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
পিতা	: জনাব মো: সুলতান মিয়া
মাতা	: মোছা: আলো বেগম
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৪ আগস্ট, যাত্রাবাড়ির শনির আখরাতে
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ৬ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শেখ বাড়ি, ইউনিয়ন: সুখবাসপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: শেখ বাড়ি, ইউনিয়ন: সুখবাসপুর, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

শহীদ মো: আল আমিন

ক্রমিক : ১৩৯
আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আল আমিন মুন্সিগঞ্জ জেলায় ২০০৫ সালের ৭ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আইয়ুব খলিফা (৫০) এবং মাতা আছিয়া বেগম (৪৫)। পিতা এবং অসুস্থ মাকে গ্রামে রেখে আপন বড় ভাই ও চাচাতো ভাইয়ের সাথে রাজধানী ঢাকা শহরে জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন। তিনজন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দিনমজুরির কাজ নেন এবং একই ঘরে ভাড়ায় থাকতেন। মাসিক আয় থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে গ্রামে বসবাসরত বাবা এবং অসুস্থ মায়ের জন্য পাঠাতেন। অন্যের দোকানের কর্মচারী হয়েও দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে আন্দোলন সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন শহীদ মো: আল আমিন। আন্দোলনের একেবারে শুরুর দিকে উনিশে জুলাই তিনি আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ইন্তেকাল করেন ।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের ডাকে বাংলা ব্লকেড চলাকালীন সময়ে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে সরাসরি গুলি করে পৈশাচিকভাবে হত্যা করলে সারাদেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাসহ রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, বাড্ডা, রামপুরাসহ পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে ওঠে ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণার ফলে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের আহবানে সাড়া দিয়ে ঢাকার অন্যান্য এলাকার মত ঢাকা উত্তরার ১১নং সেক্টরের সাধারণ মানুষও ছাত্রদের সাথে মাঠে নেমে আসে এবং কমপ্লিট শাটডাউন এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় দিশেহারা হয়ে সরকারের পেটুয়া বাহিনীর সাথে খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সংগ্রামরত ছাত্র জনতার ওপর আক্রমণ শুরু করে। তাদের বেপরোয়া ছোড়া গুলির মুখে ছাত্র জনতা একের পর এক আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে শহীদ আলামিন মাথায় গুলিবদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার বড় ভাই এলাকার লোকজনের সহায়তায় তাকে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

আর্থিকভাবে অসচ্ছল তৃতীয় বিশ্বের এক দারিদ্র পীড়িত দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে খ্যাত এ আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। শহীদ মো: আল আমিনও এর ব্যতিক্রম নন। দিনমজুর বাবার ভিটেমাটি ও কৃষি জমি নেই। অন্যের জমিতে ঘর তুলে বসবাস করেন। অভাবের কারণে বেশিদূর লেখাপড়াও করতে পারেননি। বাবা অসুস্থ তাই সংসারে সাহায্য করার জন্য নিজেকে দিনমজুরের কাজে নিয়োজিত করেন। মাও অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। শহীদ আল আমিনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে অসুস্থ পিতা-মাতা বাকরুদ্ধ। বড় দুই বোন হাফিজ আক্তার এবং রুমা আক্তার বিবাহিত হলেও অপর বোন সুমা আক্তার এখনো ছাত্রী। নিঃস্ব এই পরিবারটির মাসিক আর্থিক সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: শহীদ মো: আলামিন
পিতার নাম	: আইয়ুব খলিফা (৫০)
মাতার নাম	: আছিয়া বেগম (৪৫)
জন্ম তারিখ	: ৭ আগস্ট ২০০৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- বালাশুর, ইউনিয়ন: বাট্টাখাল, থানা: মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: একই
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা, ১১ নং সেক্টর জমজম টাওয়ারের মোড়
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই, বিকাল ৩:০০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ০৩:৩০ মিনিট, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আক্রমণের শহীদ	: আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী এবং পুলিশ

পরামর্শ

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করা ২. শহীদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

৩. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া

৪. ছোট বোনের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ করা এবং পড়াশোনা শেষে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া

শহীদ মো: সাইদুল ইসলাম শোভন

ক্রমিক : ১৪০
আইডি : ঢাকা বিভাগ-০০৮

শহীদ পরিচিতি

'সেদিন ছিল শুক্রবার। শোভন দুপুরে বিরিয়ানি খাচ্ছিল, ওর বন্ধুরা তখন বার বার ফোন দিচ্ছিল। ছেলেটা আমার তাড়াহুড়া করে খেয়ে চলে গেলো..আমি কি জানতাম ওটাই আমার ছেলের শেষ খাওয়া!' কাঁদতে কাঁদতে বলেন শোভনের মা শাহনাজ বেগম।

শহীদ সাইদুল ইসলাম শোভন মুন্সিগঞ্জ জেলা শ্রীনগর থানার রাইখাল ইউনিয়নের উত্তর কোলাপাড়া গ্রামে ২০০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মো: নজরুল ইসলাম এবং মাতার নাম শাহনাজ বেগম । তিনি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। শহীদ পিতা ব্যবসায়িক কারণে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বসবাস করতেন। শহীদ শোভন শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে লেখাপড়া করতেন। সম্ভাবনাময় এই মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য জাপানে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। এমনকি প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রাদিও প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। এই সময়টাতেই শুরু হয় দেশকে রক্ষা করার আন্দোলন। ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে হটিয়ে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এদেশের আপামর জনসাধারণ রাজপথে নেমে আসে। এই আন্দোলনে শহীদ শোভন দ্বিধাহীন চিত্তে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার সাথে অবস্থান নেন। উনিশে জুলাই আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং পুলিশ ছাত্র-জনতার সমাবেশে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে তার মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। স্থানীয় জনগণ তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯ জুলাই ২০২৪ ছিল একটি মাইলফলক দিন। এদিন ছাত্র নেতৃবৃন্দ কমপ্লিট শাটডাউন নামক এক অভূতপূর্ব কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উক্ত কর্মসূচিতে সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ একত্র ঘোষণা করেন।

আমজনতার ব্যাপক অংশগ্রহণ দিশেহারা স্বৈরাচার খুনি হাসিনা সরকারকে ভীত বিহ্বল করে তোলে। যেকোনো মূল্যে আন্দোলন দমাতে তারা তৎপরতা শুরু করে। ব্যাপক অপপ্রচার, আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কার্যসিদ্ধি হাসিল, পুলিশ বিজিবি দিয়ে মানুষ হত্যা প্রভৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ করে। ছাত্র জনতাও পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করে উনিশে জুলাই। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ছাত্র জনতা রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিউমার্কেটে অবস্থান নেন। শহীদ সাইদুল ইসলাম শোভন বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার সাথে একাত্ম হয়ে তিনিও নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসী বাহিনী আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা পুলিশের সাথে এক হয়ে উক্ত কর্মসূচিতে হামলা চালায়। তাদের এলোপাথাড়ি গুলির আঘাতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। আন্দোলনরত জনতা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ শোভনের ব্যাপারে কথাগুলো জানিয়েছে আরেক আন্দোলনকারী আলমগীর হোসেন-

'আমরা তখন নিউমার্কেট পেট্রোল পাম্পের সামনে। ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলছে। গুলির শব্দ হচ্ছে মুহুর্মুহু। পেছনে তাকিয়ে দেখি একটা ছেলে সেজদার ভঙ্গিতে উঁবু হয়ে বসে আছে। ততক্ষণে আমাদের ছাড়িয়ে পুলিশ আরো সামনের দিকে চলে গেছে। দৌড়ে গেলাম ছেলেটার কাছে। ওকে আঁকড়ে ধরলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই, আমাকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যান, প্লিজ।' একথা বলতে না বলতেই আমার গায়ে শরীর এলিয়ে দিলো। আমরা দ্রুত একটা রিকশা নিলাম। তখনো বেঁচে ছিল ছেলেটা। ওর আঙুল দিয়ে ওর ফোন আনলক করালাম। গলায় ঝুলানো আইডি কার্ডে লেখা 'সাইদুল ইসলাম শোভন, কলেজ শেখ বোরহানউদ্দিন'। ডায়ালড নাম্বার লিস্ট থেকে একটা নাম্বারে কল দিয়ে জানালাম, 'শোভনের গুলি লেগেছে। ওকে আমরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছি, তার পরিবারকে যেন খবর দেয়া হয়।'

'যাওয়ার পথে শোভন একটা বড় নিশ্বাস নিলো। আশঙ্কা হলোঃ হয়তোবা শোভন মারা গেছে।'

হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ওখানে আহত-নিহত মানুষের ছড়াছড়ি। চারদিকে কান্নাকাটি আর হুড়োহুড়ি। একজন ডাক্তার পার্লস দেখে বললেন, 'আগেই মারা গেছে।'

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

সন্ধ্যার দিকে পাশের বাড়ির এক ছেলে এসে বলে, 'আন্টি শোভনের গুলি লেগেছে, ওকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হইছে। ওর বাবা তখন ইন্ডিয়াতে। পাগলের মত ছুটে গেলাম হাসপাতালে... গিয়ে দেখি ইমার্জেন্সির এক কোণায় একটা ট্রলিতে আমার শোভন পড়ে আছে, কয়েকটা ছেলে ওর পাশে দাঁড়ানো... শোভনের কাছে দৌড়ে গেলাম, আমার ছেলের দেহ নিথর। কত্ত ঝাঁকুনি দিলাম, ছেলে কিছু বলে না। আমার শোভন তখন আর নাই!' একথা বলে ঢুকরে কেঁদে ওঠেন শাহনাজ।

শোভনের মা শাহনাজ বেগম বলেন, 'আমরা তো জানতাম না আমার ছেলের দেশের প্রতি এই রকম ভালোবাসা ছিল, ও যে নিজেই দেশের জন্য শহীদ হয়ে গেল! কত স্বপ্ন ছিলো ছেলেটাকে নিয়ে, সব শেষ হয়ে গেলো। আমার সাজানো-গোছানো সংসারটা শেষ হয়ে গেলো! জানি না বাকি জীবনটা কিভাবে কাটবে আমাদের! সরকারের কাছে আমাদের কিছু চাওয়ার নাই। শোভন দেশের জন্য যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে মারা গেছে- শোভন যেমন দেশ চেয়েছিল সেরকম হোক এই দেশটা। দেশের মানুষ যেন আমার সন্তানকে মনে রাখে, ওর আত্মত্যাগের কথা ভুলে না যায়।'

বোরহানউদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'শোভন খুব সাহসী ছিল। সে আমাদের জাতীয় বীর। শোভনের মত তরুণদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই এই দেশের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। আমরা এই জাতীয় বীরদের অবদান ভুলব না'।

শোভনের মামা মনির হোসাইন বলেন, 'এই সন্তানকে নিয়ে তার বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। পরিবারের সবার ইচ্ছে ছিল শোভন বড় হয়ে বাবা-মায়ের সব স্বপ্ন পূরণ করবে। কিন্তু দেশের জন্য শহীদ হয়েছে শোভন।'

পুলিশের গুলিতে শ্রীনগরের শোভন নিহত

উচ্চশিক্ষার জন্য জাপান যাওয়া হলো না

...ত্তর ডেস্ক

...ম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের ...তে নিহত হন শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট ...জুয়েট কলেজের ছাত্র সাইদুল ইসলাম ...ভন। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের ...র কোলাপাড়া গ্রামের মো. নজরুল ...লাম ও শাহনাজ বেগম দম্পতির একমাত্র ...ন। সূত্রমতে, মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রথম শহিদ ...ভন। তার বাবা মো. নজরুল ইসলাম ...নর কামরাঙ্গীরচর এলাকার একজন ...ক ব্যবসায়ী। মা গৃহিনী। দুই-ভাইবোনের ...া শোভন বড়। ব্যবসার কারণে তারা ...রাঙ্গীরচর এলাকায় বসবাস করেন।

বাবা-মা ও বোনের সঙ্গে তোলা শো...

হাসপাতালে ছট...

ভূঞাপুরের ইম...

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: শহীদ মো: সাইদুল ইসলাম শোভন
পিতার নাম	: মো: নজরুল ইসলাম
মাতার নাম	: শাহনাজ বেগম
জন্ম তারিখ	: ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর কোলাপাড়া, ইউনিয়ন: রাড়িখাল, থানা: শ্রীনগর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা, নিউ মার্কেট
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই দুপুর ১২:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২:৩০ মিনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আক্রমণের শহীদ	: আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী এবং পুলিশ।

পরামর্শ

১. আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই তবে পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার

শহীদ মো: ইরফান ভূঞা

ক্রমিক নং : ১৪১

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০০৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ইরফান ভূঞা নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর থানার সাতগ্রাম ইউনিয়নের কান্দাইল গ্রামে ২০০১ সালের ১১ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মো: আমিনুল ইসলাম এবং মাতার নাম মোসলেমা। এই দম্পতির দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে শহীদ ছিলেন সবার বড়। শহীদ পিতা মো: আমিনুল ইসলাম প্রাইভেট চাকুরী করেন। চাকুরীর সুবাদে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বর্তমানে বসবাস করছেন। এখানে তার নিজস্ব বাড়িও রয়েছে। শহীদ ইরফান রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতেন। সম্ভাবনাময় এই মেধাবী শিক্ষার্থীকে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও বিজিবি গুলি করে হত্যা করে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশের সব জনতার মত শহীদ ইরফানও অংশগ্রহণ করেছিলেন। খুনি হাসিনা সরকারের কর্মসূচিতে বিকেল তিনটায় হামলা চালায়। পুলিশ ও বিজিবির ছোড়া গুলিতে মাথায় ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। একটি গুলি তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায় এবং

পতনের লক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দ একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করছিলেন। তাদের ঘোষিত কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শহীদ ইরফান ভূঞা সাধারণ ছাত্রদের সংগঠিত করেন। ১৮ই জুলাই ২০২৪ তারিখে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একদল ছাত্র নিয়ে যাত্রাবাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করেন। যাত্রাবাড়ী আন্দোলন সংগ্রামের শুচিকাগার হয়ে ওঠে। এখানকার আন্দোলন সংগ্রাম সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। ব্যাপক উপস্থিতি আর অনড় মনোভাব ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার মসনদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। শংকিত খুনি হাসিনা এ আন্দোলন দমাতে লেলিয়ে দেয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের। বিজিবি ও পুলিশের সাথে এক হয়ে লেলিয়ে দেওয়া খুনি বাহিনী উক্ত আরেকটি গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হয়। ফলে ঘটনাস্থানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: ইরফান ভূঞা
পিতার নাম	: মো: আমিনুল ইসলাম
মাতার নাম	: মোসলেমা
জন্ম তারিখ	: ১২ নভেম্বর ২০০১
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম+ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, থানা: নরসিংদী সদর, জেলা: নরসিংদী
বর্তমান ঠিকানা	: নিমাইকাশারী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: কাজলা যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময	: দুপুর ১২:২৫ মিনিট
যাদের আক্রমনে শহীদ	: যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বৃদ্ধ পিতার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

২. শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি স্থায়ী আবাসস্থল তৈরি করে দেওয়া

৩. একেবারেই অসচ্ছল এই পরিবারটির জন্য একটি নিয়মিত আয়ের উৎস তৈরি করে দেওয়া

নিউজ লিংক

1. https://www.prothomalo.com/education/campus/0hqgx16tnq

‘মারা গেলে আমার লাশ ফেলে যাইস না’

শহীদ পারভেজ হাওলাদার

ক্রমিক : ১৪২
আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ পারভেজ হাওলাদার নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৯৯ সালের ২৫ নভেম্বর। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শহীদ পারভেজ হাওলাদার বাল্যকালেই পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে জীবিকার তাগিদে চায়ের দোকানে কাজ নেন। চা দোকানের কর্মচারী শহীদ পারভেজ হাওলাদার সামান্য বেতন দিয়ে বৃদ্ধ মাকে নিয়ে ভাড়া বাসাতে দীনহীনভাবে জীবন যাপন করতেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ ও বিজিবির সম্মিলিত আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদত বরণ করেন।

শহীদের স্বপ্ন

পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক পারভেজ হাওলাদার। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট। পরিবারের আদরের ছেলেটির স্বপ্ন ছিল বিদেশ যাবে। তারপর একটা সুন্দর বাড়ি করবে। সেই বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকবে। তবে বাড়ি করতে না পারলেও পারভেজের নামে একটি সড়কের নামকরণ করেছে এলাকাবাসী। কারণ বাড়ি করার স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে একটি বুলেট। নিভে গেছে পারভেজের জীবন প্রদীপ। কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেয়া পারভেজ শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মাত্র দুই ঘণ্টা আগে মাথায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। সকালে ফেসবুকে সে তার আইডি থেকে শেষ স্ট্যাটাস দেয় 'আল্লাহ তুমি ভালো পরিকল্পনাকারী, আল্লাহ তুমি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জীবনের খেয়াল রাইখো। দেশের জন্য দশের জন্য যেইটা ভালো হয় তাই কইরো আল্লাহ। আজকে যেন কোনো মায়ের কোল খালি না হয়। আমিন'। আর আন্দোলনের মাঠে বন্ধুদের বলেছিল, 'আমি মারা গেলে আমার লাশ ফেলে যাইস না, পরিবারের কাছে লাশ পৌঁছে দিস, বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে যেন আমার দাফন না হয়'।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ পারভেজ হাওলাদারের জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে হলেও জীবিকার তাগিদে তিনি ঢাকায় বসবাস করতেন। চায়ের দোকানের একজন সামান্য কর্মচারী হয়েও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। ৫ আগস্ট ছিল স্বৈরাচার খুনি হাসিনার শাসনামলের শেষ দিন। এদিন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের আর সব মুক্তিকামী জনতার সাথে শহীদ পারভেজও মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার সাথে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় অবস্থান নেন। সিংহাসন রক্ষায় মরিয়া হাসিনা সরকার এদিন মরণ কামড় দেওয়ার পরিকল্পনা এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর তৎপরতায় সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তবুও মাঠে তৎপর ছিল আওয়ামী হায়েনা গোষ্ঠী ও তাদের দোসররা। শেষ পর্যন্ত লেজ গুটিয়ে তাদের রক্ষক ও প্রশ্রয়দাতা ভারতের দিল্লিতে পালিয়ে যায় খুনি হাসিনা। বিজয়ের একেবারে পূর্ব মুহূর্তে দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় যুবলীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, পুলিশ ও বিজিবি মুক্তিকামী ছাত্র জনতার উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। এদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন শহীদ পারভেজ হাওলাদার। সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলি শহীদ পারভেজ হাওলাদারের মুখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন অংশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

পারভেজের বড় বোন সেলিনা আক্তার বলেন, "আমি আমার বোন রোকসানা ও আমার মেয়ে মাহমুদা আক্তার কোটা সংস্কার আন্দোলনে সাইনবোর্ড এলাকায় কয়েকদিন গিয়েছি।" যখন একের পর নিহত হচ্ছিল ছাত্ররা। তখন পারভেজ বলে, তোমরা বাসায় থাকো। গুলি খেয়ে মরে গেলে তো এক কথা। আর না মরলে পঙ্গু হয়ে গেলে তো তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারবা না। তার ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তাকে বলি ঠিক আছে আমরা যখন আন্দোলনে যাবো না তাহলে তুমিও যেতে পারবে না। সে বলে আচ্ছা কিন্তু সকালে নাস্তা খেতে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে যায়। সকাল ১০টার দিকে ফোন দিলে বলে ঠিক আছি কোনো চিন্তা করো না। বলি সাবধানে থাকিস। বলে কোনো সমস্যা নাই। আবার ১১টার দিকে ফোন দিলে বলে, ঠিক আছি। সাড়ে ১১টায় বন্ধু মহসিনকে বলে' 'আমি মারা গেলে আমার লাশ ফেলে যাইস না, পরিবারের কাছে লাশ পৌঁছে দিস, বেওয়ারিশ ভাবে যেন আমার দাফন না হয়'। ১২ টার পর শাকিল ফোন করে বলে পারভেজ মারা গেছে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সেলিনা আক্তার বলেন, 'পারভেজ বলতো আমি ছাত্র ছিলাম। এখন ছাত্রদের আন্দোলনে কি ঘরে বসে থাকা যায়। জীবন দিয়ে হলেও তাদের সঙ্গে আছি। আর্থিক সংকটের কারণে বেশিদূর পড়তে পারেনি সে। এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে কাজ করে সংসারে কিছুটা সহায়তা করতো। আর বলতো আমাকে বিদেশ পাঠিয়ে দাও। বিদেশ গিয়ে এই নিমাইকাশারীতে একটা বাড়ি করবো। সবাইকে নিয়ে সেই বাড়িতে থাকবো। বলতাম এতো টাকা কই পাবো। ধৈর্য ধরো, টাকা যোগাড় হলে বিদেশ পাঠাবোনে। সে বলতো 'স্বপ্ন দেখতে সমস্যা নাই। স্বপ্ন পুরন করবো আল্লাহ'। কিন্তু ভাইয়ের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলো।

পারভেজের মা হাসি বেগম বলেন, গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি দিঘীরপাড় এলাকায় নদী ভাঙ্গায় সব শেষ হয়ে গেছে। ৩৫-৪০ বছল আগে গ্রাম থেকে চলে আসি। স্বামী মজিবুর রহমান ঢাকার সদরঘাটে ফেরি করে। কালিগঞ্জের চরে আশ্রয় নেই। এরপর পারভেজের বয়স যখন ৬ বছর তখন নিমাইকাশারী এলাকায় ভাড়া বাসায় উঠি। গ্রামে কিছুই নাই। তাই এখানেই ভোটার হই। ১৪ মাস আগে পারভেজের বাবা মারা যায়। সবার ছোট পারভেজ অনেক আদরের সন্তান ছিল আমার। মাঝে মাঝেই আমার হাতে খেত। ৪ আগস্ট রাতেই নিজ হাতে খাওয়াইছি। আজ আমার বাবা (পারভেজ) নাই। কান্নায় ভেঙে পড়েন হাসি বেগম। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার কিছু চাওয়ার নাই। আমার ছেলেকে যেন মানুষ ভুলে না যায়। সে দেশের মানুষের জন্য শহীদ হয়েছে। সরকার যেন তার নাম শহীদ হিসেবে লিখে রাখে।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ পারভেজ হাওলাদার জন্মগ্রহণ করেছিলেন একেবারেই নিঃস্ব পরিবারে। বাবা মজিবর হালদার অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেন। ষাটোর্ধ্ব অসুস্থ বৃদ্ধ মাকে নিয়ে ছিল তার সংসার। বাবার ভিটে বাড়ি এবং জমিজমা কিছুই নেই। বড় ভাই ফারুক হাওলাদার (৪৬) বিবাহ করে আলাদা সংসার করছেন। বোন হালিমা বেগম (৪০), সেলিমা বেগম(৩৬) ও রোকসানা আক্তার (২৭) গৃহিণী। তার মা বর্তমানে একাকী নিঃস্ব অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

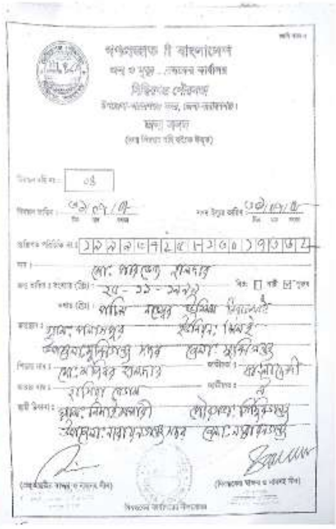

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
/ সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: পারভেজ হাওলাদার
Name: PARBEG HALDAR
পিতা: মোঃ মজিবর হালদার
মাতা: হাসি বেগম
Date of Birth:
ID NO:

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ পারভেজ হাওলাদার
পিতার নাম	: মৃত মোঃ মজিবর হালদার
মাতার নাম	: হাসি বেগম (৬০)
জন্ম তারিখ	: ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- নিমাইকাশারী, ইউনিয়ন: সিদ্ধিরগঞ্জ, থানা: সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা: সিদ্ধিরগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: নিমাইকাশারী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: কাজলা যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময়	: দুপুর ১২:২৫ মিনিট
যাদের আক্রমনে শহীদ	: যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেওয়া
২. শহীদের বৃদ্ধ মায়ের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের বৃদ্ধ মায়ের চিকিৎসার খরচ নির্বাহ করা

নিউজ লিংক

১। https://m.mzamin.com/news.php?news=122882

“আপনি ভয় পান কেন? আমি মারা গেলেতো শহীদ হব” ভগ্নিপতিকে উদ্দেশ্য করে শহীদ হাফেজ ছলেমান।

শহীদ হাফেজ ছলেমান

ক্রমিক : ১৪৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ হাফেজ ছলেমান নারায়ণগঞ্জ জেলার শিমরাইল সানারপাড়ে ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মিরাজ বেপারী এবং মাতার নাম রোকসানা। মিরাজ-রোকসানা দম্পতির এক মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে শহীদ ছলেমান ছিলেন বড়। পিতা মিরাজ বেপারী সৌদি প্রবাসী। পিতা মাতার স্বপ্ন ছিল একমাত্র সন্তান শহীদ হাফেজ ছলেমানকে কোরআনের হাফেজ ও অনেক বড় মাপের আলেম বানানোর। পিতার ইচ্ছায় তিনি বাল্যকালে হাফেজি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে হিফজুল কোরআন সম্পন্ন করেন। এরপর ভর্তি হন মিরপুর দারুদ রাশাদ মাদ্রাসার কিতাব বিভাগে। এখানেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন এবং শরহে বেকায়া ক্লাসে উত্তীর্ণ হন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

সারাদেশ মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রসর হলে কুরআনের পাখি নির্ভীক শহীদ হাফেজ ছলেমানও সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়েন। খুনি হাসিনা সরকারের পতনের লক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সুদক্ষ সেনা নায়কের ন্যায় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতাকামী জনতা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে রাজপথে নেমে আসেন। তারা ৫ আগস্ট মার্চ ঢাকা কর্মসূচির ডাক দেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা ঢাকার যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় সমবেত হন। এই সমবেত জনতার ওপর খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনী আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং বিজিবি ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়ে একের পর এক মানুষকে হত্যা করে। এই সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হাফেজ ছলেমান মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘাতকের একটি বুলেট তার পিট দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বেরিয়ে যায়। শহীদ হাফেজ ছলেমানের নিথর দেহটি রাস্তায় নেতিয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বিকাল পাঁচটায় শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

শহীদ ছলেমানের ভগ্নিপতি মাওলানা শাহাদাত হোসেন বলেন, 'শহীদ হাফেজ ছলেমান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং ভদ্র। তিনি সবসময় শাহাদাতের আশঙ্কা পোষণ করতেন। ঘটনার একদিন আগে আমি তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করলে তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি ভয় পান কেন? আমি মারা গেলে তো শহীদ হব।'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: ছলেমান
Name: SOLAIMAN
পিতা: মিরাজ বেপারী
মাতা: রোকসানা
Date of Birth: 01 Jan 2003
ID NO: 4211197027

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ হাফেজ ছলেমান
পিতার নাম	: মিরাজ বেপারী
মাতার নাম	: রোকসানা
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি ২০০৩
স্থায়ী ঠিকানা	: আল নূর টাওয়ার, মাদানীনগর, ইউনিয়ন: শিমরাইল সানারপাড়, থানা: নারায়ণগঞ্জ সদর, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: আল নূর টাওয়ার, মাদানী নগর,শিমরাইল, সানারপাড়, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: কাজলা যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময়	: বিকাল পাঁচটা
যাদের আক্রমনে শহীদ	: যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত শহীদ ভাতা প্রদান করা দরকার

২. একমাত্র সন্তানের শাহাদাতের ফলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরি

'মা তুমি চিন্তা করো না, আমি মরে গেলে তোমাকে বীরের মা বলে ডাকবে মানুষ'

শহীদ আফিকুল ইসলাম সাদ

ক্রমিক : ১৪৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১২

শহীদ জীবনী

শহীদ আফিকুল ইসলাম মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার দরগ্রামে ৩০ মার্চ ২০০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শফিকুল ইসলাম মাতার নাম আঞ্জমান আরা। ছোটবেলাতেই মা-বাবার সাথে ঢাকায় চলে আসেন শহীদ সাদ। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। পিতা মাতার কাছ থেকেই তিনি উত্তম আদর্শ শিক্ষা লাভ করেন। জীবনে নিজের সততা এবং উত্তম আদর্শ দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। ইসলামের প্রতি ছিল তার গভীর ভালোবাসা। ছোট ভাই সাজিদুল ইসলামকে বন্ধুর মত মনে করতেন। তার স্বপ্ন ছিল দেশ এবং ইসলামকে নিয়ে। ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নতি হবে এটাই ছিল তার চাওয়া। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন তিনি। অনেক বড় স্বপ্ন থাকলেও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী পুলিশের মাধ্যমে তাকে হত্যা করে তার স্বপ্ন নস্যাৎ করে দেয়।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

'মা তুমি চিন্তা করো না, আমি মরে গেলে তোমাকে বীরের মা বলে ডাকবে মানুষ, তুমি শহীদের মায়ের সম্মান পাবে। তোমাকে সবাই শ্রদ্ধা করবে' ৫ আগস্ট দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মা বাধা দিলে এ কথা বলে বেরিয়ে যান সাদ। এটাই মায়ের সঙ্গে সাদের শেষ কথা।

দুই ভাইয়ের মধ্যে সাদ বড়। সাদের মা আঞ্জুমান আরা জানান, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার সাথেই শেষ কথা হয় আফিকুল ইসলাম সাদের। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলে আমার কাছ থেকে ২০ টাকা চায় সে। তারপর সেই টাকা নিয়েই বেরিয়ে পড়ে সাদ। তখন আমি বারবার আন্দোলনে যেতে নিষেধ করি। এর কিছুক্ষণ পরই সাভার উপজেলা ও থানার মধ্যবর্তী হার্ডিঞ্জ স্কুলের সামনে মাথায় গুলিবিদ্ধ হন আফিকুল ইসলাম সাদ। আঞ্জুমান আরা আরোও বলেন, সাদ বের হওয়ার পরপরই আমার ছোট ছেলে সাজিদুলও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপরই কানে ভেসে আসে গোলাগুলির শব্দ। এলাকাবাসী বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় সাজিদুলকে। সাজিদুলের কাছেই জানতে পারি সাদ আন্দোলনে গেছে। বারবার ফোনে খোঁজ নিচ্ছিলাম। দুপুরে পরপর দুবার কথাও হয়। তৃতীয়বার বিকেল ৩টার দিকে ফোন দিলে আর ফোন রিসিভ করে না। তখনই মনের ভেতর কেমন যেন করতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পর অপরিচিত একটি নম্বর থেকে ফোন আসে আমার কাছে। বলে, আন্টি আফিকুল তো মাথায় আঘাত পেয়েছে, ওকে আমরা সবাই স্থানীয় ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষন পরে আবারও ফোন দিয়ে বলে, এখানে রাখেনি, আমরা ওকে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, আপনারা চলে আসুন। তখন আমরা সবাই দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে দেখি গুলিবিদ্ধ আমার ছেলে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তখন দ্রুত তাকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের আইসিইউতে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিন দিন পর ৮ আগস্ট সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সাদ। সাদের মৃত্যুতে ভেঙ্গে গেছে একটি পরিবারের স্বপ্নও। আদরের সন্তানের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না শহীদ সাদের বাবা-মা। জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের শুরু থেকেই সাদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদী বিভিন্ন পোস্ট দিয়ে নিজের সমর্থনের কথা জানান দেন। ৪ আগাস্ট ফেসবুকে পোস্ট করেন, 'কুড বি এ নিউ রাইজ'। এরপর লেখেন, 'যেই দেশের ইতিহাস রক্ত দিয়ে শুরু হয়েছে ওই ইতিহাস আবার লিখতে রক্তই লাগবে। সাদের বাবা শফিকুল ইসলাম বলেন, 'কোথা থেকে কী হয়ে গেলো, আমি হতবাক। আমার পুরো পরিবারটি এলোমেলো হয়ে গেল। এ শোক কীভাবে কাটাব আমরা। তিনি বলেন, ৮ তারিখ সকালে যখন চিকিৎসকরা বলল সাদ আর নেই, তখন আমি সাদের সামনে গিয়ে ওকে তিনবার বাবা বাবা বলে ডাকি। কিন্তু আমার বাবা আর উঠল না। আমার ছেলেটা অত্যন্ত মেধাবী ছিল। পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছে তার গ্রাফিক্স ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। চাকরির প্রতি আগ্রহ না থাকলেও সাদের বাড়িতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, পড়ার টেবিলে তার বিভিন্ন পুরস্কারের ট্রফি ও স্বপ্ন লেখা। একটি বুলেটে সবকিছুই শেষ হয়ে গেল। ট্রফিগুলো শোভা পাচ্ছে মতের অনাচে-কানাচে। সবই আছে নেই শুধু সাদ। সকাল গড়িয়ে দুপুর, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত, আজও যেন প্রতীক্ষায় বাবা-মা আর ভাই। তবু ফেরে না সাদ। ছেলেকে হারিয়ে অ্যালবামের ছবি, আলমারিতে রাখা খেলার ট্রফির মাঝেই মা আঞ্জুমান আরা খুঁজে নাড়ি ছেঁড়া ধন ছেলের স্মৃতি। সাদের অনুপস্থিতি মানতে পারছেন না বাবা শাফিকুল ইসলাম কিংবা আদরের ছোট ভাই সাজিদুল ইসলাম। তার ছোট ভাই সাজিদুল বলেন, 'সাদ আমার বড় ভাই হলেও তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। আমাকে অনেক ভালোবাসত সে। যেকোনো কিছুই আমার সঙ্গে শেয়ার করত। কোথাও গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। কেন যে আমাকে সেদিন সঙ্গে নিল না, বুঝতে পারছি না। ভাইয়ের জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।

শহীদের বাবার বক্তব্য

সাদ নিয়মিত মসজিদে যেত এবং নামাজের পর পড়তে বসতো। সর্বদা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতো। সে তার পিতা-মাতাকে সম্মান করতো।

০৪নং দড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান এর কার্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Register, Birth and Death Registration
Daragram Union Parishad
Saturia, Manikganj

Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuence
12/09/2024	20065617038102620	12/09/2024

Date of Birth : 30/03/2006 Sex : Male
Date of Death : 08/08/2024
In Word : Eighth of August Two Thousand Twenty Four

Name : Afiqul Islam Saad
Mother : Anjuman Aara
Nationality : Bangladeshi
Father : Md. Shafiqul Islam
Nationality : Bangladeshi
Place of Death : Dhaka, Bangladesh
Cause of Death : Murder

12.09.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

12.9.24
Seal & Signature
Registrar
Chairman

একনজরে শহীদ মোঃ আফিকুল ইসলাম সাদ

নাম	: আফিকুল ইসলাম সাদ
জন্ম তারিখ	: ৩০-০৩-২০০৬
জন্মস্থান	: দড়গ্রাম সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
পেশা	: ছাত্র, সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ডি-৮৫
এলাকা	: পূর্ব কায়েতপাড়া , থানা: ধামরাই , জেলা: ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: দড়গ্রাম, সাটুরিয়া , মানিকগঞ্জ
পিতার নাম	: মোঃ শফিকুল ইসলাম (৫৩) সাধারণ চিকিৎসক
মাতার নাম	: আঞ্জমান আরা (৩৮) গৃহিণী
আঘাতকারীর	: পুলিশ
আহত হওয়ার, স্থান ও সময়	: হার্ডিঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ গেইট, ধামরাই, ঢাকা
তারিখ ও সময়	: ০৫-০৮-২০২৪ , বিকেল ৩:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ০৮-০৮-২০২৪ রাত ৭:৩০ টায়,এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা
জানাজা	: ০৯-০৮-২০২৪ দুপুর ২:৩০
কবরস্থান	: দড়গ্রাম কবরস্থান, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

প্রস্তাবনা

নিয়মিত মাসিক সহযোগিতা করা যায়

শহীদ শহীদুল খান

ক্রমিক : ১৪৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১৩

শহীদ জীবনী

শহীদুল খান ১৯৬৮ সালে ১৭ জানুয়ারি মাদারিপুর জেলার কালকিনী উপজেলায় পিতা লালু খান ও মাতা চাহেরেনের সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় তিনি কৃষক ছিলেন। কৃষিকাজের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এলাকায় বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচারী সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে একে একে সমস্ত বিরোধী দল ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করতে থাকে। শেখ হাসিনা ও তার অবৈধ সরকার কয়েকটি বড় কেলেংকারী ও গণহত্যার জন্য দায়ী। এসব দূর্নীতি ও হত্যাকান্ডের সঠিক বিচার শুরু হলে আওয়ামী লীগ ও তার প্রত্যেক সন্ত্রাসী, দূর্নীতিবাজ ও চাটুকার সমর্থকদের ১০০ বছর কারাদন্ড প্রদান করলেও তা খুব কম হয়ে যাবে। ২০০৬ সালে জোট সরকারের শেষ মুহূর্ত্বে শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে নির্দেশ দেয় লগি-বৈঠা দিয়ে বিরোধীদের হত্যা করতে। যার প্রেক্ষিতে ২৮ অক্টোবর বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ চলাকালে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে পিটুনিতে তাৎক্ষনিক ৭ জন এবং বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলাকালে মোট ৪০ জন নিহত হয়।

২০০৮ সালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্ষমতায় এসেই পরিকল্পনা করে দেশপ্রেমিক সেনাদের হত্যা করার। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার অভ্যন্তরে ভারতীয় ঘাতকদের মাধ্যমে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করে। পরবর্তীতে স্বাক্ষ্যদাতাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি স্বৈরশাসক ও দূর্নীতিবাজ ভারত সৃষ্ট সরকার শেখ মুজিব ও তার হিংস্র রক্ষীবাহিনীকে নির্মূল করতে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ৪ জনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় এবং ১ জনকে শেখ হাসিনা বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে জবাই করেন।

২০১২ সালে সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকান্ড ছিল আলোচিত। যাতে খুনিরা আওয়ামীলীগের তাবেদারী করে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ২০১২ সালে জামায়াত নেতা আবদুল কাদের মোল্লাসহ বিভিন্ন নেতাদের আন্যায়ভাবে ফাঁসি। মিথ্যা বানোয়াট যুদ্ধাপরাধীর **অভিযোগ তুলে** এবং সেসব অভিযোগের কোন যাচাই-বাছাই না করে জামায়াত নেতা, আ কা মোল্লা, কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামীদের আটক করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া। এছাড়াও গোলাম আজম, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী, সালাউদ্দিন কাদের প্রমুখ ব্যক্তিদের ফাঁসি প্রদান।

২০১৩ সালে ইসলাম ধর্মের অবমাননার কারণে হেফাজতে ইসলামের সম্মেলনে নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা।

২০১৭ সালে ভারতের সাথে দেশ বিরোধী গোপণ চুক্তি।

১৯৯৬ ও ২০১০ সালে দেশের ইতিহাসে বড় দুইটি শেয়ার কেলেংকারীর ঘটনা ঘটে। ১৯৯৬ সালে যখন শেখ হাসিনা প্রথমবারের মত ক্ষমতায় আসে তখন ঐ বছরের শেয়ার বাজারে ঘটে মহা দূর্নীতি। যেখানে ৪০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট করা হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে এই ঘটনা ঘটে। এই কেলেঙ্কারিতে যাদের নাম আলোচনায় আসে এবং যাদের নামে মামলা করা হয় তাদের মধ্য অন্যতম বেক্সিমকো গ্রুপের সালমান এফ রহমান ও আসিফ এফ রহমান। এছাড়াও রয়েছে, অলিম্পিক গ্রুপের মোহাম্মদ ভাই ও আজিজ মোহাম্মদ ভাই, টি কে গ্রুপের আবু তৈয়ব, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান পরিচালক রকিবুর রহমান, ডিএসইর সাবেক পরিচালক মুসতাক আহমেদ সাদেক প্রমুখ। এ ছাড়া '৯৬ সালের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন।

স্থায়ীভাবে দেশের বাইরে চলে গেছেন বেশ কয়েকজন। ১৯৯৭ সালের ২ এপ্রিল ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে এ নিয়ে মামলা করা হয়। মামলার পর পরই অভিযুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। নিম্ন আদালতে মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর দিনই শাইনপুকুর হোল্ডিংসের মালিক শেখ হাসিনার বর্তমান উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এবি সিদ্দিকুর রহমান, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের সালমান এফ রহমান, সোহেল এফ রহমান ও ডিএইচ খান উচ্চ আদালত থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান। শুধু জামিনই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই গঠন করা যাবে না বলে উচ্চ আদালত থেকে জানানো হয়। উচ্চ আদালতের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে এসইসি, অজানা কারণে সেই আপিলের নিষ্পত্তি আজ পর্যন্ত হয়নি। ৮ ডিসেম্বর ২০১০, বুধবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত সোয়া ঘন্টায় শেয়ারবাজার থেকে কত টাকা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল তার পরিসংখ্যানে কেউ বলেছে ১৮ হাজার কোটি টাকা, কেউ বলেছে ২২ হাজার কোটি টাকা। আবার কারো কারো মতে ৮৬ হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখের হিসাবের সঙ্গে এর আগের অন্তত ১৫ দিনের হিসাব মিলালে ৮৬ হাজার কোটি টাকা হাওয়া হয়ে যাওয়া বাস্তব ভিত্তি পায়। তবে সে ৮৬ হাজার কোটি টাকা, পরবর্তী সময়ে যাঁরা অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা একা নিতে পারেননি। সে টাকা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছেও গিয়েছে। ফর্মুলাটি ছিল নেই-দেই, নেই-দেই, নেই-দেই, নেই আর-দেই না। ৮ ডিসেম্বর এসে দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। একবারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা।

৩০ লাখ বিনিয়োগকারী সে টাকা নেয়নি, নিয়েছে পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যক্তি। যাদের ছবি প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। তদন্ত প্রতিবেদনে তাদের নাম উঠে এসেছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে ডিএসই, সিএসই, এসইসি, সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা সবাই নিশ্চিত হয়েছে পাঁচ-ছয়জন দুরাচারের বিষয়ে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অর্থমন্ত্রী তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পরও বলেছিলেন, তাদের নাম প্রকাশ করা যাবে না; করলে অসুবিধা আছে।

আওয়ামী সরকার আরো যেসব কেলেংকারীর সাথে জড়িত বলে জানা যায় তা হলো- হলমার্ক গ্রুপ ঋণ কেলেংকারি, বিসমিল্লাহ গ্রুপ ঋণ কেলেংকারি, পদ্মা সেতু পরামর্শক নিয়োগ কেলেঙ্কারি। বাংলাদেশে বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্প পদ্মা সেতুর তদারকির কাজ পেতে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমানসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী, রাজনীতিক ও প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কয়েক কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব দেয় কানাডীয় কোম্পানি এসএনসি-লাভালিন। এই অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পর ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় সাপেক্ষ পদ্মা সেতু প্রকল্পে ১২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায় বিশ্বব্যাংক। এরপর অন্যান্য দাতা সংস্থা পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিল করে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরামর্শকের কাজ পাওয়ার জন্য দশ শতাংশ ঘুষের প্রস্তাব দেয় এসএনসি। এর মধ্যে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের জন্য ৪ শতাংশ, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরীর জন্য ২ শতাংশ, চিফ হুইপ নূরে আলম চৌধুরীর ভাই মুজিবুর রহমান নিক্সনের জন্য ২ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা মসিউর রহমানের জন্য ১ শতাংশ এবং সাবেক সেতু সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার জন্য ১ শতাংশ ঘুষ বরাদ্দ করা হয়েছিল। এসএনসি-লাভালিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রমেশ সাহার ডায়রিতে এ হিসাব লেখা ছিল। হাসিনা আমলে কয়েকটি ব্যাংকের কেলেংকারী ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেসিক ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারি- ক্ষমতায় আসার পর বেসিক ব্যাংকে রাজনৈতিক বিবেচনায় চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয় শেখ আবদুল হাই বাচ্চুকে। এরপরই ব্যাংকটিতে ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটে। যার পরিমান প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। ফারমার্স ব্যাংক কেলেঙ্কারি- মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও মাহবুবুল হক চিশতী ঋণ জালিয়াতি, দুর্নীতি-অনিয়ম ও লুটপাট করেই কেবল ক্ষান্ত হননি, গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে নিজেদের অ্যাকাউন্টে অর্থ সরিয়ে নেয়ার মতো গুরুতর অপরাধ করতেও পিছপা হননি তারা।

সোনালী ব্যাংকে সুরঙ্গপথে চুরি ও অর্থ কেলেঙ্কারি- সোনালী ব্যাংকে সুড়ঙ্গ কেটে একই পদ্ধতিতে দুইবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রথম চুরির পরিমান ১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। পরবর্তীতে চুরি হয় ৩২ লাখ ৫১ হাজার ৮৮৪ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি- ২০১৬ সালে অজ্ঞাতপরিচয় হ্যাকাররা ভুয়া ট্রান্সফার ব্যবহার করে নিউ ইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ থেকে সুইফটের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ কোটি ১০ লক্ষ ডলার অর্থ হাতিয়ে নেয়।। এর মধ্যে দুই কোটি ডলার চলে যায় শ্রীলঙ্কা এবং ৮ কোটি ১০ লক্ষ ডলার চলে যায় ফিলিপিনের জুয়ার আসরে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঐ ঘটনাকে এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে । বড় ব্যাংক তহবিল চুরির একটি বলে ধরা হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা অবহেলা অথবা ইচ্ছাকৃত যোগসাজশেই এই ভয়াবহ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে বলেও পর্যবেক্ষণে প্রমানিত হয়। এদিকে চুরির কয়েক বছর পার হলেও এখনো এই ঘটনায় ব্যাংকের ভেতরে কারা জড়িত তা বের করতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। চুরি হওয়ার সেই ঘটনা সেসময় প্রায় একমাস তা গোপন রাখে বাংলাদেশ ব্যাংক। শেষ পর্যন্ত এর দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হয় তৎকালীন গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে। অর্থ চুরি নিয়ে সেসময় সরকারিভাবে একটি তদন্তও হয়। তবে সেই তদন্ত প্রতিবেদনটি পরে আর আলোর মুখ দেখেনি।

আওয়ামী আমলের লুটপাট- দূর্নীতির ফলে দেশপ্রেমিক জনতা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। দেশে আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন ইস্যু তৈরী হলেও ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্ভব হচ্ছিলনা। আওয়ামী আমলের শুরু থেকে যত গুলো প্রতিবাদী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সবগুলো আওয়ামীলীগ দমণ করেছিল খুবই নির্মমভাবে। তারপরেও ছাত্র-জনতা অপেক্ষায় ছিল পরিবর্তনের। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনটি দমন করতে শেখ হাসিনা অতীতের মতো গনহত্যার নির্দেশ প্রদান করে। ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে। তাদের ইচ্ছা ছিল সাধারণ ছাত্র-জনতাকে রাজপথে জামায়াত-শিবির অভিযোগ তুলে নির্মমভাবে খুন করবে। জুলাই মাস জুড়ে সরকারী বাহিনীর হাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ এবং শত শত মানুষ নিহত হলেও আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। ছাত্র-জনতা আক্রমনাত্মক হয়ে উঠেনি। ১ আগস্টে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ হওয়ায় গণহত্যার কথা জেনে যায় মানুষ। ৪ আগস্ট দেশব্যাপী প্রতিরোধ শুরু হয়। ছাত্র নেতারা মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচী ঘোষণা করে। দেশবাসীকে বঙ্গভবন ঘেরাও করতে অনুরোধ জানায়। ৫ আগস্ট দেশবাসী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রাজপথে নেমে পড়ে। অনেকে বাসায় বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে আসে।

শহীদ হলে যাতে সবাই তাকে ক্ষমা করে দেয়। ছাত্র-জনতার কেউ কেউ কাগজে ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখে তা পকেটে রেখে রাস্তায় নেমে আসে। রাজপথের বিপ্লবীরা জানে হাসিনার খুনি বাহিনীর বুলেট যেকোন সময় তাদের শরীরে এসে বিদ্ধ হতে পারে। ভয়-ডরহীন এমন জনতাকে রুখে দেয়ার সাহস ঘৃণিত মুজিব কন্যা হাসিনার ছিলোনা। সকাল সকাল সেনাপ্রধান ওয়াকারের সহায়তায় শেখ হাসিনা তার অপর দূর্নীতিবাজ ছোটবোন শেখ রেহানাকে নিয়ে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ভারতে পালিয়ে যায়। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার আগে তার খুনি বিভিন্ন বাহিনী যেমন- পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিজিবি প্রভৃতিকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যায়। একারণে ৫ আগস্ট হাসিনার পলায়নে সারাদেশে ছাত্র-জনতা খুশিতে বিজয় মিছিলে বেরিয়ে এলে স্বৈরাচারী সরকারকে যারা ১৫ বছর টিকিয়ে রেখেছিল সেসব খুনি বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। রক্তাক্ত হয় রাজপথ। খুন হয় জনতার একাংশ। আহত জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা খুনি হাসিনার সন্ত্রাসী ও চাটুকারদের আস্তানায় হামলা চালায়। আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন অফিসে আগুন দেয়। শহীদুল খান মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচীতে অংশ নিতে মাদারিপুর থেকে ঢাকায় ছুটে আসেন। তিনি কোথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তা তার পরিবার জানতে পারেনি। ঢাকা মেডিকেল থেকে ফোন যায় বাড়িতে। শহীদুল খানের পরিবার জানতে পেরে ঢাকায় ছুটে আসেন। ঢাকা মেডিকেল থেকে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে পপুলার মেডিকেলে স্থানান্তর করেন। ১০ আগস্ট আইসিইউ তে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

নিজেদের বাড়ি ছাড়া আর কোন জমি নেই। ছোট সন্তান বেকার। বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর্থিক অবস্থা দূর্বল থাকায় যেতে পারছেননা।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহিদুল খান
জন্ম	: ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮
পেশা	: কৃষি কাজ
পিতা	: লালু খান
মাতা	: চাহেরন
স্ত্রী	: মাহমুদা বেগম
সন্তানদের তথ্য	: ১. সুমন খান- প্রবাসী, ২. আব্বাস খান, প্রবাসী, ৩. হাফিজ খান, বেকার, ৪. লায়লা বেগম, গৃহিনী
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: খান বাড়ি, গ্রামঃ নতুন চর দৌলত খান, ডাকঘরঃ চর দৌলত খান, উপজেলাঃ কালকীনি, মদারিপুর
ঘটনার স্থান	: ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, বিকাল ৩ টা (আনুমানিক)
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১০ আগস্ট ২০২৪, আইসিইউ, পপুলার মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: খানবাড়ি কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

২. ছোট ছেলেকে চাকুরী প্রদানে সহযোগিতা করা

শহীদ সুমাইয়া বেগম

ক্রমিক : ১৪৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সুমাইয়া বেগম বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মৃত সেলিম মাদবর এবং মাতা আসমা বেগম। পিতৃহীন আসমা বেগমের দু'বছর পূর্বে বিবাহ হয়েছিল জাহিদ হোসেনের সঙ্গে। বিবাহের পর থেকে স্বামী জাহিদ সুমাইয়া বেগমের কোনো খোঁজ খবর নিতেন না ফলে বাধ্য হয়ে সুমাইয়া গার্মেন্টসে চাকরি নেন। পরবর্তীতে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এ পর্যায়ে সুমাইয়া গর্ভবতী হলে স্বামী জাহিদ হোসেন যৌতুক হিসেবে ২ লাখ টাকা দাবি করেন। শহীদ সুমাইয়া বেগম টাকা দিতে অপারগ হলে স্বামী জাহিদ হোসেন আবারো তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। খোঁজ খবরই আর নিতেন না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করতে এক পর্যায়ে পুলিশ-র‍্যাব আন্দোলনকারীদের ওপর হেলিকপ্টার হতে গুলি বর্ষণ শুরু করে। এ সময় একুশে জুলাই নিজ বাড়ির ছাদে শহীদ সুমাইয়া বেগম গুলি বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সুমাইয়াকে খোঁজে তাঁর সন্তান

২০ জুলাই সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে সুমাইয়া আক্তার (২০) বাসার বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তাঁর আড়াই মাস বয়সী একটি শিশু সন্তান রয়েছে। তিনি পরিবারের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের পাইনাদিতে একটি ভবনের ছয়তলায় বাস করতেন। সুমাইয়ার মা আসমা বেগম গত রোববার প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সময় বাইরে সংঘর্ষ চলছিল। র‍্যাবের হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছিল। তিনি হেলিকপ্টার দেখতে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। ওই সময় মেয়ে সুমাইয়া শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। হঠাৎ করেই সুমাইয়া ঢলে পড়তে থাকেন।

আসমা বেগম বলেন, তিনি ভেবেছিলেন মেয়ে হয়তো ভয় পেয়েছে। সুমাইয়াকে জড়িয়ে ধরার পর দেখেন তাঁর মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। তাঁর মাথায় গুলি লেগেছে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুমাইয়ার স্বামী জাহিদ হোসেন কাঁচপুরে একটি পোশাক কারখানায় অপারেটর হিসেবে কাজ করেন। সুমাইয়া মায়ের কাছে গিয়েছিলেন সন্তান হওয়ার আগে। আসমা বেগম বলেন, সুমাইয়ার মেয়ে সোয়াইবা এখন তাঁর কাছেই আছে। সে মায়ের স্পর্শ খোঁজে, বুকের দুধ খোঁজে। ঘুমানোর সময় বুকের দুধের জন্য ছটফট করতে থাকে।

আসমা বেগমের প্রশ্ন, 'মেয়ে হত্যার বিচার কার কাছে দেব?'

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমাতে নিজ দেশের জনগণের ওপর কি জঘন্যই না নারকীয় তান্ডব চালিয়েছিল ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার সরকার। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হাসিনা সরকার নিজ দেশের জনগণের ওপর হেলিকপ্টারের ওপর থেকে গুলি বর্ষন করবে তা মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল। একই ভাষাভাষী নিজ দেশের শাসকগোষ্ঠী আন্দোলন দমাতে কত ভয়ানক পন্থা অবলম্বন করতে পারে তার অন্যতম একটি উদাহরণ হল শহীদ সুমাইয়া বেগমের হত্যাকাণ্ড। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য তৎকালীন সরকারের অনুগত পুলিশ ও র‍্যাব বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে নির্বিচারে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সুমাইয়া তার বাসার ছাদে গেলে হঠাৎ হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া একটি গুলি তার মাথায় ঢুকে পেছন দিক থেকে বের হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শহীদ সুমাইয়া বেগম।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

নাম	: শহীদ সুমাইয়া বেগম
পিতার নাম	: মৃত সেলিম মাদবর
মাতার নাম	: আসমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: আলিমাবাদ, ইউনিয়ন: আলিমাবাদ, থানা: মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: ৩৭৮, রোড-৪, ১ নং ওয়ার্ড পাইনাদি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: ৩৭৮, রোড-৪, ১ নং ওয়ার্ড পাইনাদি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪ সময়: সন্ধ্যা ৬:০০ টা (নিজ বাসার ছাদে)
শহীদ হওয়ার সময়	: সন্ধ্যা ৬টা (নিজ বাসার ছাদে)
যাদের আক্রমনে শহীদ	: পুলিশ এবং বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেওয়া
২. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের মাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
৪। সন্তানের ভরণপোষণ ও শিক্ষার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা

নিউজ লিংক

১। https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/vj5ntzbyno
২। https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/vj5ntzbyno

শহীদ সুমাইয়া বেগমের পিতা মৃত এবং মা বৃদ্ধ। হতদরিদ্র শহীদ সুমাইয়া বেগমের মাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা খুবই প্রয়োজন।

“জানি না সন্তানদের নিয়ে বাকি জীবনটা কিভাবে কাটাবো? সবার কাছে আমার একটাই চাওয়া– ‘আমাকে একটা চাকরির সুযোগ করে দিন। আমি আমার তিন সন্তানকে নিয়ে কোনোরকম বেঁচে থাকতে চাই” - সৈয়দ মোস্তফা কামাল রাজুর (৩৬) স্ত্রী আকলিমা আক্তার

শহীদ সৈয়দ মোঃ মোস্তফা কামাল রাজু

ক্রমিক : ১৪৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সৈয়দ মো: মোস্তফা কামাল রাজু লক্ষ্মীপুর জেলায় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা: সৈয়দ আব্দুল হাকিম এবং মাতা: মায়া বেগম। শহীদ মুস্তফা কামাল ওয়ার্কশপের ব্যবসা করতেন। দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তার সুখের সংসার। গ্রামের বাড়িতে বাবার কিছু আবাদী জমিও রয়েছে। তিনি তার ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রাইনাদী সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। উপার্জনক্ষম কর্তাব্যক্তিকে হারিয়ে স্ত্রী আকলিমা আক্তার তিন সন্তান নিয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কিভাবে সামনের দিনগুলো অতিবাহিত করবেন তা নিয়ে তিনি চিন্তাগ্রস্ত। মাঝে মাঝে এইসব চিন্তা করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শিল্পাঞ্চল হিসাবে খ্যাত বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী শাসনামলে সন্ত্রাসের অভয়অরণ্যে পরিণত হয়। সন্ত্রাসীদের গডফাদার শামীম ওসমান এবং তাদের দোসরদের অপতৎপরতায় এ অঞ্চলটি বারবার নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। সন্ত্রাসের

গডমাদার ও মাদার অফ মাফিয়া খ্যাত খুনি হাসিনার প্রচ্ছন্ন আশ্রয় প্রশ্রয়ে উসমান পরিবার এখানে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে। আলোচিত ত্বকী হত্যা মামলা, সেভেন মার্ডারসহ অসংখ্য জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এখানে। এখানকার মানুষ যেন সন্ত্রাসীদের কাছে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা মুক্তির প্রহর গুণছিল। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে এখানকার জনগণ মুক্তির প্রত্যাশায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। ১৮ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করে। হাসিনার দুঃশাসন হতে মুক্তি পেতে সর্বস্তরের জনতা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। কারফিউসহ বিভিন্ন দমন পীড়ন চালিয়ে সরকার আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে। মুক্তিকামী মানুষও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যেকোনো আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে শহীদ মোস্তফা কামাল আসরের নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন এমন সময় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের সশস্ত্র কর্মীরা গুলি ছুড়তে থাকে। এমন সময় একজন বৃদ্ধ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে শহীদ মোস্তফা কামাল তাকে উদ্ধারে এগিয়ে যান। আওয়ামী হায়েনা লীগের সদস্যরা এই সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে একটি গুলি কপাল দিয়ে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরবর্তীতে তার স্ত্রী ও এলাকার লোকজন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২২ শে জুলাই ২০২৪ তারিখে বিকেল পাঁচটায় মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।

শহীদ রাজু সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্য

ওইদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নিহত রাজুর স্ত্রী আকলিমা আক্তার বলেন, 'আমার স্বামী কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। যখন গ্যারেজ থেকে বাসায় ফিরতেন সবসময় তার হাতে কালি লেগে থাকতো। সংঘর্ষের দিন দুপুরে উনি বাসায় খেতে আসেন। খাওয়া শেষে বাইরে গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে বাড়ির ছাদে যান কী হয়েছে তা দেখতে। ছাদ থেকে দেখতে পান সড়কে অনেক মানুষ। তখন তিনিও ছাদ থেকে নেমে বাইরে চলে যান। এসময় হঠাৎ তার পাশে একজন গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি তাকে ধরতে গেলে তার মাথায় একটি গুলি লাগে।'

'গুলিবিদ্ধ হওয়ার হওয়ার পরই তিনি হামাগুড়ি দিয়ে বাসার নিচ আসেন। তখন তার পুরো শরীর ছিল রক্তাক্ত। স্বামীর এ অবস্থা দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে রাত ১১টায় ডাক্তার অপারেশন করে সাধারণ ওয়ার্ডে দেয়। কিছুক্ষণ ওয়ার্ডে থাকার পর অবস্থা খারাপ হলে তাকে লাইফ সাপোর্ট দিতে আইসিউতে নিয়ে যান ডাক্তাররা। সেখানে নেওয়ার একদিন পর রাত দেড়টায় দিকে তিনি মারা যান। পরে বাড়িতে নিয়ে এসে দাফন করা হয়। বিলাপ করতে করতে আকলিমা আক্তার বলেন, "স্বামীর টাকা দিয়ে আমাদের পরিবার ও গ্রামে থাকা তার মা চলতেন। এভাবে চলতে কষ্ট হচ্ছিল বিধায় ২৪ জুলাই সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ এর আগেই তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলো। আমার সুখের সংসার শেষ হয়ে গেলো। জানি না সন্তানদের নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবো? সবার কাছে আমার একটাই চাওয়া–'আমাকে একটা চাকরির সুযোগ করে দিন। আমি আমার তিন সন্তানকে নিয়ে কোনোরকম বেঁচে থাকতে চাই।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

নাম	: শহীদ সৈয়দ মো: মোস্তফা কামাল রাজু
পিতার নাম	: সৈয়দ আব্দুল করিম
মাতার নাম	: মায়া বেগম
জন্ম তারিখ	: ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিমবিঘা, ইউনিয়ন: পশ্চিম বিঘা, থানা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: প্রাইনাদি, ১ নং ওয়ার্ড প্রইনাদি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
ছেলে-মেয়ে	: এক মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে আয়েশা (১১), ছেলে রায়হান (৮) ও আবু বকর (৫)
আহত হওয়ার স্থান	: প্রাইনাদি, সিদ্ধিরগঞ্জ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪ সময়: বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময়	: বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট
যাদের আক্রমনে শহীদ	: আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২. শহীদের তিনটি মাসুম বাচ্চার পড়াশোনাসহ সকল ব্যয়ভার বহন করা দরকার

৩। শহীদের স্ত্রীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

নিউজ লিংক

১। https://khoborpatrabd.com/archives/151194

শহীদ সৈয়দ মো: মোস্তফা কামাল রাজু মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার মৃত্যুতে স্ত্রী আকলিমা আক্তার তিন সন্তান নিয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছেন।

'মা তুমি চিন্তা করো না, আমি মরে গেলে তোমাকে বীরের মা বলে ডাকবে মানুষ'

শহীদ মোঃ মনির হোসেন

ক্রমিক : ১৪৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০১৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ মনির হোসেন কুমিল্লা জেলায় ১৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতাঃ মৃত মমতাজুর রহমান এবং মাতাঃ ছাদিয়া বেগম। শহীদ মোঃ মনির হোসেন নিরাপত্তা প্রহরীর চাকুরী করতেন। তার বড় দুই ছেলেমেয়ে বিবাহিত। ছোট ছেলে সাব্বির (২০) বেকার। ২০ জুলাই ২০২৪ পাইনাদি সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ছোড়া গুলিতে আহত হন এবং ২২ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

মাদার অফ মাফিয়ার কুসন্তান খুনি হাসিনার মানসপুত্র গডফাদার শামীম ওসমান ও তার পরিবারের লোকদের কাছে পুরো নারায়ণগঞ্জ জিম্মি হয়ে পড়েছিল। ঘৃণিত এই পরিবারটির ভয়ে নারায়ণগঞ্জের কোনো মানুষ টু শব্দটি করতে পারত না। হত্যা সন্ত্রাস গুম খুনসহ এমন কোনো অপরাধ ছিল না যার সাথে শামীম ওসমান পরিবারের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। সন্ত্রাস কবলিত এই জনপদের মানুষ মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তবে আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাহিনীও ছিল বেপরোয়া। তারা যেকোনো মূল্যে এ অঞ্চলে আধিপত্য অটুট রাখতে তাৎপর ছিল। ২০ জুলাই এ অঞ্চলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিকামী জনতা সমবেত হতে থাকলে আওয়ামী লীগের পেটুয়া বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের ওপর আক্রমণ শুরু করে। মুসল্লী হতে শুরু করে সাধারণ মানুষও তাদের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছিলেন না। শহীদ মনির হোসেন আসরের নামাজ পড়ে মসজিদ হতে বের হচ্ছিলেন এমন সময় ঘাতকের ছোড়া গুলি মাথায় আঘাত হানলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাকে ধানমন্ডি পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ২২ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মোঃ মনির হোসেনের ভিটে বাড়ি এবং কৃষিজমি কিছুই নেই। তিনি নিরাপত্তা প্রহরির চাকুরী করতেন। তার বড় ছেলে পরিবার নিয়ে অন্যত্র বসবাস করেন। শহীদ মনির হোসেনের মৃত্যুর পর পরিবারটির উপার্জনের আর কেউ অবশিষ্ট নাই। বিধবা স্ত্রী নুরজাহানের মাথা গোজার মতো কোনো ঠায় নেই। পরিবারটি পরিচালনার জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

Medical Certificate of Cause of Death

Popular Medical College Hospital 10017237 ICU-18

Md. Monir Hosain

Md. Momutaz uz Rahman

Amin Bari, Taltola, 06

Dadghort 3623 Monohorgonj Comilla

24 06 1970 — 21 07 2024

10 52 AM — 22 07 2024 — 03 23 PM

01935118118

a. Septic shock with ARDS & cardiogenic shock

b. B/L Pneumonia

c. 1st POD following exploratory laparotomy followed by resection and ileostomy

d. Gut perforation due to gun shot

AKI

21 07 2024

Gut perforation due to gun shot

Gun Shot — 20 07 2024

Gun shot

Dr Partha Borua — ICU Medical Officer — A-105901

22/07/24

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: মনির হোসেন
পিতার নাম	: মৃত মো: মমতাজুর রহমান
মাতার নাম	: মোসা: ছাদিয়া বেগম
জন্ম তারিখ	: ৪ জুন ১৯৭৩
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- আমিন বাড়ি তালতলা, ইউনিয়ন: তালতলা, থানা: মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা	: পিএম মোড়, প্রাইনাদি নতুন মহল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
ছেলে-মেয়ে	: দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে মো: সবুজ মিয়া (৩০) বিবাহিত অপর ছেলে সাব্বির (২০) বেকার এবং মিলন আক্তার (২৭) বিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: প্রাইনাদি, সিদ্ধিরগঞ্জ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪ সময়: বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময়	: ২২ জুলাই বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট, ধানমন্ডি পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আক্রমনে শহীদ	: আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেওয়া

২. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

৩. শহীদের ছোট সন্তানের আয় রোজগারের ব্যবস্থা করা

শহীদ হযরত বিল্লাল

ক্রমিক : ১৪৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০১৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ হযরত বিল্লাল নারায়ণগঞ্জ জেলার জামপুর ইউনিয়নের কলতাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০০৪ সালের ৮ মে। তিনি বাবার সাথে নারায়ণগঞ্জ শহরে ভেলপুরি ও ঝাল মুড়ি বিক্রি করতেন। ভেলপুরি ও ঝাল মুড়ি বিক্রি করলেও ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্যই বিদেশে যাবারও পরিকল্পনা করেছিলেন। বিদেশ যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট তৈরিসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। নভেম্বর মাসে ছিল তার সম্ভাব্য ফ্লাইট। কিন্তু তার আগেই ৫ আগষ্ট ২০২৪ সালে বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ ও বিজিবির সম্মিলিত আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

পতিত স্বৈরাচার খুনি হাসিনাকে প্রতিরোধ করতে যেন বাংলাদেশের জনসাধারণ ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন। নিরস্ত্র মানুষেরা খালি হাতে, কেউবা শুধুমাত্র লাঠিকে সম্বল করে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ৫ আগস্ট ছিল স্বৈরাচার খুনি হাসিনার শাসনামলের শেষ দিন। এদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের আর সব মুক্তিকামী জনতার সাথে শহীদ বিল্লাল মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার সাথে তিনি যাত্রাবাড়ী মেয়র হানিফ টোল প্লাজায় অবস্থান গ্রহণ করেন। বিজয়ের একেবারে পূর্ব মুহূর্তে দুপুর ১টার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকায় যুবলীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, পুলিশ ও বিজিবি মুক্তিকামী ছাত্র জনতার উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। একটি গুলি শহীদ বিল্লালের কপালে আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলিবিদ্ধ শহীদ বিল্লালকে স্থানীয় জনগণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐদিন রাত বারোটার সময় শহীদ বিল্লাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ হযরত বিল্লাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন একেবারে নিঃস্ব পরিবারে। বাবা মোঃ হোসেনের ভিটে বাড়ি এবং জমিজমা কিছুই নেই। ছেলেদের সাথে নিয়ে মোহাম্মদ হোসেন ফুটপাতে ভেলপুরি ও ঝালমুড়ি বিক্রি করতেন। নারায়ণগঞ্জ শহরের ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া নিয়ে কোনোরকম দিনানীপাত করতেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনের নাম আল মামুন (২৪)। সে ফুটপাতে ব্যবসা করে। অপর ভাই চান মানিক (১৬) বেকার। বাসস্থান ও কর্মসংস্থানে পরিবারটিকে সহায়তা করলে তারা উপকৃত হবেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ হযরত বিল্লাল
পিতার নাম	: মোঃ হোসেন (৫৩)
মাতার নাম	: তছলিমা বেগম
জন্ম তারিখ	: ৮ মে ২০০৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- কলতাপাড়া, ইউনিয়ন: জামপুর, থানা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: মক্কা নগর, সিআই খোলা, প্রাইনাদি পূর্ব পাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
আহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময়	: দুপুর ১:০০মিনিট
যাদের আক্রমনে শহীদ	: আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেওয়া
২. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের পিতা এবং ছোট দুই ভাইয়ের উপার্জনের উৎস তৈরি করে দেওয়া

শহীদ মোঃ রুস্তম

ক্রমিক : ১৫০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০১৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রুস্তম, জুলাই আন্দোলনের এক অমর বীর, যাঁর জীবন থমকে গিয়েছিল এক নির্মম ঘটনার সাক্ষী হয়ে। ২০০৯ সালে মায়ের কোল জুড়ে যেন চাঁদ নেমে আসে রুস্তমের জন্মের মাধ্যমে। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে সবুজ ঘাসের গালিচা আর মেঠোপথের বুক চিরে যে শিশুটি একদিন খেলা করত। সেই রুস্তমের জীবনের গল্প আজ ইতিহাসের পাতায় লেখা। মাটির গন্ধে মিশে থাকা তাঁর শৈশব ছিল নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে এক প্রাণবন্ত গান। সরলতা, চঞ্চলতা আর সদা হাস্যমুখের রুস্তম যেন গ্রামবাংলার সেই চিরায়ত ছেলেটি। যার হাসিতে ভরে উঠত সবার হৃদয়।

রুস্তমের বাবা মাইনুদ্দিন ছিলেন টেইলারিং দোকানের এক শ্রমিক। অর্থের টানাপোড়েনের মাঝেও ছেলেকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। মির্জাপুরের ছোট্ট ঘর থেকে রাজধানীর মিরপুরের ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করা রুস্তম জীবিকার তাগিদে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। শহরের কোলাহলে মিশে গেলেও তাঁর হৃদয়ে ছিল গ্রামের সবুজ প্রান্তর আর মেঠোপথের স্মৃতি।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা:
শহীদ রুস্তমের পরিবার যেন অভাব-অনটনের এক নির্মম প্রতিচ্ছবি। নরসিংদীর মির্জাপুর গ্রামের মাটির ঘরে বাস করা এই পরিবারটি প্রতিদিন সংগ্রামের নতুন অধ্যায় লেখে। বাবা মাইনুদ্দিন জীবিকার তাগিদে ঢাকায় দর্জির কাজ করেন। দিনের পর দিন সেলাই মেশিনের চাকার সঙ্গে লড়াই করে পরিবারের মুখে আহার তুলে দেন। মা গার্মেন্টসে চাকরি করে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাম ঝরিয়ে যে আয় করেন, তা দিয়েও সংসারের অভাব মেটে না।

তিনটি সন্তানের এই সংসারে প্রতিটি দিনই যেন এক যুদ্ধ। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর বাস্তবতা তাঁদের প্রতিটি শ্বাসে জড়িয়ে আছে। একদিকে বাবা-মার নিরন্তর পরিশ্রম, অন্যদিকে সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনের চেষ্টায় ক্লান্ত এই পরিবার। তাঁদের দিন শুরু হয় সংগ্রামের কথা ভেবে, রাত ফুরোয় নতুন সংকটের শঙ্কায়।

শহীদের বোনের অনুভূতি

'ছবির ছেলেটা আমার ভাই, আমার আদরের ছোট ভাই। আমরা তাকে কী পরিমাণ ভালোবাসি এটা হয়তো কখনো আর তাকে বলা হবে না, সুযোগই নেই? যেদিন প্রথম ও এসেছিল, সেদিন আমাদের থেকে খুশি আর কেউ ছিল না। ১১ই নভেম্বর এ আমার ছোট ভাইটার ১৬ বছর হওয়ার কথা ছিল। কত হাসিখুশি ছিলাম আমরা। এখন বুকে শুধু হাহাকার, কী যেন নাই, নাই, তো নাই!!!!!!!!

যেভাবে শাহাদাত বরণ করেন-

২০২৪ সালের ১৯ জুন, শুক্রবার। ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর রোড বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল সারাদিন। অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে তরুণদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সেই দিন নতুন এক ইতিহাস লিখেছিল। আর সেই ইতিহাসের অংশ হয়ে চিরতরে মিশে গিয়েছিল শহীদ রুস্তম।

রুস্তম ছিলো প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত প্রতীক। গ্রামের সবুজ প্রান্তর থেকে শহরের কোলাহলে এসে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছিল। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার হৃদয়ে ছিল এক অগ্নিশিখা। পরিবারের অভাব-অনটন আর প্রতিদিনের সংগ্রামের মাঝেও রুস্তমের চোখে ছিলো পরিবর্তনের স্বপ্ন। কিন্তু আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না। রুস্তমের মা-বাবা তাকে বারবার বাধা দিয়েছিলেন। মা গার্মেন্টসে কাজ শেষে ক্লান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "বাবা, তুই এসবের মধ্যে যাস না। তোর তো পড়াশোনা আছে। তোর জন্য আমাদের কত স্বপ্ন!" বাবা মাইনুদ্দিন কড়া গলায় বলেছিলেন, "পরিবারের অবস্থাটা তো দেখছিস! আন্দোলন করে কী হবে?" কিন্তু রুস্তম থেমে থাকেনি। তার হৃদয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাকবিতণ্ডা আর অশ্রুতে ভেজা পরিবারের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে সেদিন সে চলে গিয়েছিল আন্দোলনের মিছিলে। মিরপুর ১০ এর রাস্তায় হাজারো তরুণের সঙ্গে রুস্তমও সেদিন শ্লোগানে মুখরিত করেছিল চারপাশ। "বৈষম্যের অবসান চাই, ন্যায়ের সমাজ চাই!"—এই শ্লোগান ছিল তার কণ্ঠে। কিন্তু সেই দিনটি এক নির্মম পরিণতির সাক্ষী হয়ে থাকবে। পুলিশের গুলিতে যখন আন্দোলনকারীদের রক্তে রঙিন হয়ে উঠল পথ, তখন রুস্তমও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বুক চিরে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত। রুস্তমের হাসি থেমে গেল চিরতরে, আর তার স্বপ্নগুলো মিশে গেল শহরের উত্তপ্ত বাতাসে।

তার শাহাদাতের খবর গ্রামে পৌঁছালে রুস্তমের মা-বাবার বুক ভেঙে গেল। মায়ের কান্নায় ভারী হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস। বাবা শুধু চুপ করে বসে ছিলেন, যেন সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরিবারের সেই ছোট্ট আশার প্রদীপটি নিভে গেল এক নির্মমভাবে। শহীদ রুস্তম আজ নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর থেমে যায়নি। তার আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। রুস্তম শুধু একটি নাম নয়, সে এক আদর্শ, এক সংগ্রাম, এক অমর স্মৃতি

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রুস্তম
পেশা	: ছাত্র
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: মিরপুরের ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়। শ্রেণী: নবম
জন্ম	: ২০০৯
পিতা	: মাইনুদ্দিন, পেশা: টেইলর দোকানের কর্মচারী
মাতা	: সোফিয়া বেগম
জন্মস্থান	: মির্জাপুর, রায়পুর , নরসিংদী
পরিবারের সদস্য	: বর্তমানে ৪ জন। এক ভাই, এক বোন
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: মিরপুর ১০, ঢাকা
কবর	: গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে

আজকের পত্রিকা

রুস্তমের পরিবারে কান্না থামছে না

প্রস্তাবনা-

১. মাসিক আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা

২. বাকী দুই সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা

৩. হত্যাকারীদের বিচার দ্রুত নিশ্চত করা।

শহীদ শাইখ আস-হা-বুল ইয়ামিন

ক্রমিক : ১৫১

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০১৯

শহীদ পরিচিতি

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে সাভারের প্রথম ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী শহীদ শাইখ আস-হা-বুল ইয়ামিন (১২ ডিসেম্বর ২০০১ - ১৮ জুলাই ২০২৪)। শহীদ ঢাকার উত্তরে অবস্থিত সাভার পৌরসভার গেন্ডা গ্রামের ব্যাংক টাউন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়ী পিতা মো: মহিউদ্দিন (৫৭) ও গৃহিনী মাতা মোসা: নাছরীন সুলতানার (৫১) একমাত্র পুত্র সন্তান। ইয়ামিন মিরপুরের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৮ জুলাই ২০২৪ দুপুর ৩ টায় পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে শহীদ হন এবং সাঁজোয়া যানেই সড়ক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একপর্যায়ে টেনে ফেলে দেওয়া হয় সড়কে। এই ঘটনা দেশে ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ব্যক্তিগত জীবন

ছাত্র হিসেবে ইয়ামিন অনেক মেধাবী ছিলেন। ফলে সহজেই তিনি বুয়েটে এবং মেডিকেলে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু পছন্দের বিষয় হিসেবে ইয়ামিন এমআইএসটির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হন। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি এই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। দুই ভাইবোনের মধ্যে ইয়ামিন ছোট। বড় বোন শায়েখ আসহাবুল জান্নাত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বাবা মো. মহিউদ্দিন সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা বর্তমানে ব্যবসায়ী। ইয়ামিন ২০১৮ সালে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল থেকে এসএসসি, ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অসাধারণ ফলাফল করে তাক লাগিয়ে দেন।

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ইয়ামিনের ভূমিকা

গণ-অভ্যুত্থানের শুরু থেকেই শহীদ ইয়ামিন অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তার ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা যায় ইয়ামিন শুধু কোটা সংস্কার নয়; সমগ্র রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজন তুলে ধরেন। মৃত্যুর ১২ ঘণ্টা আগে একটি পোস্টে তিনি লেখেন: "শুধু কোটা নয়; গোটা দেশটাই সংস্কার প্রয়োজন।" গণ-আন্দোলন যখন তুঙ্গে এবং কর্তৃপক্ষের কৌশল যখন আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করছে তখন ইয়ামিন অন্য আরেকটি পোস্টে লেখেন: "আমি মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-তে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থী। চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য যদি আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে হেনস্তা করে, হুমকি দেয় বা বহিষ্কার করে, সেক্ষেত্রে আমরা সম্মিলিতভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল প্রকারের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জন করার ঘোষণা দিব। ইতোমধ্যে আমাদের হলে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদের ১৭ জুলাই দিনগত রাতে অন্যায়ভাবে হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল কর্তৃপক্ষ, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশাল বড় নিরাপত্তার ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একইসঙ্গে আমরা এখন থেকে এমআইএসটিতে সংঘটিত সব ধরনের অনুষ্ঠান, ক্লাব কার্যক্রম, খেলাধুলা ইত্যাদি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।"

ইয়ামিন যেভাবে শহীন হন

২০২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানে সাভারে ছাত্র-জনতা ফুঁসে ওঠে। ইয়ামিন শহীদি প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। গত ১৮ জুলাই সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাকিজা পয়েন্টে আন্দোলনরত নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম, অপস অ্যান্ড ট্রাফিক) আবদুল্লাহিল কাফী, সাভার সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহিদুল ইসলাম ও সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ জামানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে খুব কাছ থেকে গুলি করা হচ্ছিল সেদিন। বিক্ষোভের প্রতীক হয়ে পুলিশের সাঁজোয়া যানের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইয়ামিন। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তার বুক। তারপর আন্দোলনকারীদের 'শিক্ষা' দিতে গুলিবিদ্ধ মুমূর্ষু ইয়ামিনকে সাঁজায়ো যানেই সড়ক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একপর্যায়ে টেনে ফেলে দেওয়া হয় সড়কে। এ ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও ফলাও করে প্রচারিত হয় ইয়ামিন হত্যাকাণ্ডের এই দৃশ্য। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা জানান, ইয়ামিনকে পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যার পর যে নৃশংসতা দেখিয়েছে, তা বর্বরতাকেও হার মানায়।

প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা যায়, ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অভিমুখে অগ্রসর হলে পাকিজা, রেডিও কলোনিসহ বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয়। এ সময় সশস্ত্র ছাত্রলীগও পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয়। বেলা ১১টা পর্যন্ত সাভারের সার্বিক পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে ১১টার পর থেকে। ১১টার দিকে সর্বপ্রথম এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাকিজা মোড় এলাকায় অবস্থান নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এরপর বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সদস্যরা পাকিজা এলাকায় অবস্থান নেন। পুলিশ তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারশেল নিক্ষেপ শুরু করলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় একই সময়ে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে মাথায় হেলমেট পরে সশস্ত্র অবস্থান নেন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনের কয়েকশ নেতাকর্মী। তাদের সবার হাতে লোহার রড, বাঁশের লাঠি, রামদা; এমনকি বেশ কয়েকজনের হাতে পিস্তল ও শটগান ছিল। দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার বিপরীতে চলতে থাকে পুলিশের রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিপেটা। এই সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন গুলিবিদ্ধসহ আহত হয় দেড় শতাধিক। বেলা পৌনে ৩টার দিকে একে একে গুলিবিদ্ধদের নেওয়া হয় সাভারে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে আহত শিক্ষার্থী, পথচারী ও উৎসুক জনতার ভিড়ে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে দেখা যায় কর্তব্যরত চিকিৎসকদের।

খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন ইয়ামিনের পরিবার ও স্বজনরা। এর পরপরই একটি অটোরিকশায় করে গুলিবিদ্ধ গুরুতর আহত ইয়ামিনকে এনাম মেডিকেল হাসপাতালে আনার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তাঁর পকেটে থাকা এমআইএসটির পরিচয়পত্র পেয়ে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হয়। এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মিজারুল রেহান পাভেল ও ডা. হাসান মাহবুব ইয়ামিনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'অসংখ্য রাবার বুলেটে ঝাঁঝড়া হয়ে অধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে'।

এ-সময় তাদের আর্তনাদে ভারি হয়ে ওঠে সেখানকার বাতাস। ইয়ামিনের মতো মেধাবী শিক্ষার্থীকে এভাবে কোটা সংস্কারের দাবিতে প্রাণ দিতে হবে এটা মেনে নিতে পারছে না অনেকেই। প্লাটফর্ম এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব সাভার ক্যান্টমেন্ট

পাবলিক স্কুল ও কলেজের জেনারেল সেক্রেটারি ব্যাংকার ফাহিম দাদ খান রূপক ফেসবুকে শোক জানিয়ে লিখেছেন, "শাইখ আসাবুল ইয়ামিন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সিএসসির শিক্ষার্থী ছিল। আমি জানি না কীভাবে

এই মৃত্যুর ভার সইবে তার পরিবার ও স্বজনরা। এভাবে তার মৃত্যু সত্যিই অকল্পনীয়।"

শহীদের বাবা ও এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রতিক্রিয়া

নিজের সন্তানের ছবি দেখিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কোটা সংস্কার আন্দোলনে সাভারের প্রথম শহীদ শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের বাবা সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন বলেন: 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আমার সন্তান শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের বুক। দুনিয়া-আখেরাত উভয় বিচারে আমার সন্তান শহীদ। তাকে গোসল করানো হয়নি, কাফন দেওয়া হয়নি। বরং যে কাপড়ে সে শহীদ হয়েছে, সে কাপড়েই জানাজা পড়ে দাফন করেছি আমার কলিজার টুকরাকে।'

শহীদ হওয়ার পর ইয়ামিনের ঘনিষ্ট এক বন্ধু ফেসবুক পোস্টে লেখেন: "ইয়ামিন বুয়েটে চান্স পাইছিলো, মেডিকেলেও পাইছিলো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, আমি না পড়লে টেনে নিয়ে যাইতো। সে সুন্নাত পালনের জন্য রোজাও রাখতো ছাত্র অবস্থাতেই। ইয়ামিন সেদিন বৃহস্পতিবার রোজা ছিলো। রোজা অবস্থাতেই সে জোহরের নামায মসজিদে পড়ে ছাত্রদের বাঁচাতে যেয়ে নিজে গুলি খেয়ে শহীদ হয়। ওর আব্বুর পুরা ফ্যামিলি নিয়ে মালয়েশিয়াতে শিফট করার কথা ছিল কিন্তু তারা যায়নি, ইয়ামিনের দেশপ্রেমের জন্য। ওকে ফিউচারের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতো খুব সিম্পল লাইফ চায় আজীবন। শুনে অনেক রাগ উঠতো আমার। অনেক পটেনশিয়ালিটি ছিলো ওর মধ্যে। আমাকে সবসময় বলতো, মানুষকে আমার ক্রিয়েটিভিটি দেখানো উচিত। আমি ওকে শেখ ইয়ামিন বলতাম; কারণ আমার জীবনের সব সমস্যার উত্তর ওর কাছে ছিল। আর দেখবো না ইয়ামিনকে মৃদু নিষ্পাপ মিষ্টি হাসি মুখটা নিয়ে সবার শেষে হলের ডায়নিং-এর খাবার খেতে বসতে। আর দেখবো না হাস্যোজ্জ্বল মায়াবী মুখটা সবার সব সমস্যার সহজ বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান করে দিচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে। তার কাছে গেলে কেমন শান্তি শান্তি লাগতো। নিজে সবচেয়ে বিনয়ী হয়ে যেমন সবার সমস্যার সমাধান দিতো, তেমনভাবেই ছাত্রদেরও!

দাফনে বাধা প্রদান

শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের বাবা মহিউদ্দিন জানান, ইয়ামিনকে গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় প্রথমে দাফন করার চেষ্টা করি। সব প্রস্তুতি নেওয়ার পর সেখানকার থানা থেকে জানানো হয়, ময়নাতদন্ত ছাড়া কোনো লাশ সেখানে দাফন করতে দেওয়া হবে না। তারপর সাভারের তালবাগের কবরস্থানে দাফন করার চেষ্টা করলে সেখানেও একই অজুহাতে বাধা দেওয়া হয়। অবশেষে ব্যাংক টাউন কবরস্থানের সভাপতির আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমার সন্তানকে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করার সুযোগ পাই।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ শাইখ আসহাবুল ইয়ামিন
পিতা	: মো: মহীউদ্দিন
মাতা	: মোসা: নাছরীন সুলতানা
পেশা	: শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৮ জুলাই ২০২৪, ২৩ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাকিজা পয়েন্টে
দাফনের স্থান	: ব্যাংক টাউন কবরস্থান, সাভার পৌরসভা
স্থায়ী ঠিকানা	: গেন্ডা গ্রাম, ব্যাংক টাউন, সাভার পৌরসভা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: মধ্যবিত্ত পরিবার
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: দুই ভাই-বোন

শহীদ মোঃ হৃদয়

ক্রমিক : ১৫২

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০২০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ হৃদয় ভোলা জেলায় ১৯৯৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সফেদ আলী এবং মাতা মনোয়ারা বেগম। স্ত্রী শিরিনা আক্তার। শহীদ হৃদয়ের বয়স যখন ৩ বছর তখন তার বাবা অন্যত্র বিয়ে করে পরিবারের সবাইকে রেখে চলে যান। পাঁচ বছর বয়সে তার মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে যায়। নানা-নানী অন্যের বাড়িতে কাজ করে হৃদয়কে লালন পালন করেন। বর্তমান শহীদ হৃদয়ের ভিটা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। শহীদ হৃদয় কাঠমিস্ত্রির কাজ করে ৪ সদস্যের পরিবারটির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ২০ জুলাই শহীদ হৃদয় বিজিবি ও পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে শহীদ হন। একমাত্র উপার্জনক্ষম শহীদ হৃদয়কে হারিয়ে তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাদের দেখভালো করার আর কেউ পৃথিবীতে নেই।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমপ্লিট শাটডাউন চলাকালীন সময়ে ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে বিকাল পাঁচটায় ভূমি পাম্পের গেটে শহীদ হৃদয়সহ অনেক মানুষ একত্রিত হয়। এমতাবস্থায় ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ ও বিজিবি এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে। হঠাৎ একটি গুলি তার কপালে এসে আঘাত করলে সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

দেশের মানুষকে স্বৈরাচারমুক্ত করতে শহীদ মো: হৃদয় শাহাদত বরণ করেন। মৃত্যুকালে রেখে যান অতি আদরের ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়ে । একজন আব্দুল্লাহ (৪) এবং অপরজন নুসরাত (১)। শহীদ মোঃ হৃদয়ের জমিজমা, ভিটে বাড়ি কিংবা আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পুরো পরিবার দিশেহারা। শহীদ হৃদয়ের পিতা-মাতাও যার যার মত বিয়ে করে আলাদা আলাদা সংসার করেন। স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বেঁচে থাকার জন্য পরিবারটির জন্য মাসিক সহায়তা, বসবাসের জন্য একটি বাড়ি এবং সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: হৃদয়
জন্ম তারিখ	: ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
পিতার নাম	: সফেদ আলী
মাতার নাম	: মনোয়ারা খাতুন
স্ত্রীর নাম	: শিরিনা আক্তার
ছেলে-মেয়ে	: এক ছেলে ও এক মেয়ে ছেলে: আব্দুল্লাহ (৪) এবং মেয়ে নুসরাত (১)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দুর্গাপুর, ইউনিয়ন: জয়শ্রী, থানা: ধর্মপাশা, জেলা: সুনামগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: হাউসিং আবাসিক এলাকা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: ভূমি পাম্পের গেট, সিদ্ধিরগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল পাঁচটা
শহীদ হওয়ার সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫টা, ভূমি পাম্পের গেট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ ও বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেওয়া
২. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের ছোট ছোট দুই সন্তানের পড়ালেখাসহ যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা

শহীদ মোঃ তুহিন

ক্রমিক : ১৫৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ ঢাকা জেলায় ১৯৮৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ শহিদুল ইসলাম এবং মাতাঃ ময়না। স্ত্রীর নামঃ আলেয়া আক্তার মিম। শহীদ তুহিন ঢাকা শহরে রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ছোট্ট একটা বাসাতে ভাড়া থাকতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বিশে জুলাই বিকাল তিনটায় পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির বিপরীতে সরকার সারা দেশে কারফিউ জারি করে। কারফিউ চলাকালীন সময়ে বাইরে বেরোনো যায় না এটা জানা সত্ত্বেও দিন আনি দিন খাওয়া মানুষেরা ঘরে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। কেননা আয় করতে না পারলে সেদিনের খাওয়া বন্ধ। তাই শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শ্রমজীবী মানুষ পেটের তাগিদে রাস্তায় বের হন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ২০ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে বিকাল ৩টায় রিক্সা চালক শহীদ তুহিন যাত্রী নিয়ে চিটাগাং রোডে যান। সেখান থেকে ফেরত আসার সময় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ ও বিজিবি এলোপাথাড়ি গুলি করে। হঠাৎ একটা গুলি তার কপালে এসে আঘাত করে। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেন।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

রিক্সা চালক শহীদ মোঃ তুহিনের জমিজমা, ভিটে বাড়ি কিংবা আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ভূমিহীন তুহিন রিকশা চালিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের নির্বাহ করতেন। ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। শহীদ তুহিনকে হারিয়ে পুরো পরিবার দিশেহারা। শহীদ তুহিনের পিতা-মাতাও বৃদ্ধ ও অসুস্থ। স্ত্রী ও মেয়ের বেঁচে থাকার জন্য পরিবারটির জন্য মাসিক সহায়তা, বসবাসের জন্য একটি বাড়ি এবং মেয়ের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ তুহিন
Name: Md. Tuhin
পিতা: মোঃ শহীদুল ইসলাম
মাতা: ময়না
Date of Birth: 29 Dec 1988
ID NO: 2693624613058

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
মৃত্যু সনদপত্র

People's Republic of Bangladesh
Birth Certificate
Register No: 14
Date of Registration: 22-10-2019
Date of Issue: 22-10-2019
Name: ALAYA AKTER MIM
Date of Birth: 15-07-1996
Sex: Female
Place of Birth: DHAKA
Father's Name: ABDUL GOFUR
Father's Nationality: BANGLADESHI
Mother's Nationality: BANGLADESHI

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: তুহিন
পিতার নাম	: মো: শহিদুল ইসলাম
মাতার নাম	: ময়না
স্ত্রীর নাম	: আলেয়া আক্তার মিম
ছেলে-মেয়ে	: এক মেয়ে নুসরাত (১০)
জন্ম তারিখ	: ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ১৬৪/এ খিলগাঁও, ইউনিয়ন: তিলপা পাড়া, থানা: খিলগাঁও, জেলা: ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: উত্তর রসুলবাদ, পাইনাদি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩টা
শহীদ হওয়ার সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩টা, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ ও বিজিবি

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেওয়া
২. শহীদের পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের ছোট মেয়ে সন্তানের পড়ালেখাসহ যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা
৪. শহীদের বৃদ্ধ পিতামাতার চিকিৎসার ব্যয় বহন করা

"শিশু রাইসা তখন শুধু 'বাবা' ডাকতে শিখেছিলো"

শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ১৫৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২২

জন্ম ও শৈশব

শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম চঞ্চল ২০০৩ সালের ১১ নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার অন্তর্গত উলাইল ইউনিয়নের রূপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতার নাম মো: রইস উদ্দীন ও মাতার নাম মোছা: চায়না বেগম। তাঁর পিতা একজন কৃষক আর মাতা গৃহিণী। রফিকুল ছাড়াও রইস উদ্দীন ও চায়না বেগম দম্পতির আরেকটি কন্যা সন্তান আছে। তার নাম নুর নাহার। রূপের মাধুর্যের জন্যই হয়তো গ্রামটির নাম রূপসা। গ্রামটির অপার সৌন্দর্য একইসঙ্গে নয়নাভিরাম ও বৈচিত্রময়। রূপসার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে পদ্মা নদীর স্রোতধারা। পদ্মার অববাহিকা তাই গ্রামটিকে গড়ে তুলেছে অন্য আর দশটা গ্রামের চেয়ে একটু আলাদা। এই গ্রামেই বেড়ে ওঠা শহীদ রফিকুল ইসলামের। ছোট থেকেই বেশ ভদ্র আর শান্ত স্বভাবের রফিকুল ইসলাম। শান্ত হলেও অন্যায় দেখে কখনো চুপ থাকতেন না তিনি। এজন্য প্রতিবেশী থেকে সহপাঠী, সবাই খুব ভালোবাসতো তাকে। রফিকুল ইসলাম গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ভর্তি হন স্থানীয় ওয়াহেদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগ থেকে ২০১৮ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি।

সেদিনের আন্দোলন ও তাঁর শাহাদাত

কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে আসছিলো। তখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের লাগাতার কঠোর আন্দোলনের ফলে, স্বৈরাচারী হাসিনা গদি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে পরিপত্র জারি করে। পরবর্তীতে চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোটা বহাল রাখতে ২০২১ সালে অহিদুল ইসলাম সহ আরও কয়েকজন আদালতে রিট আবেদন করলে, চলতি ২০২৪ সালের ৫ জুন বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। রায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে পুনরায় একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে থাকে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তীব্র হলে, নরপিশাচ হাসিনা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর লেলিয়ে দেয় দেশের সামরিক বাহিনী আর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের। সারাদেশে একযোগে হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি আর সেনাবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে নিহত হয় শতশত সাধারণ ছাত্র-জনতা। স্থানীয় পত্রিকা গুলোর ৩১ জুলাই ২০২৪ এর তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সকল সন্ত্রাসী সংগঠন, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশের এবং সেনাবাহিনীর সম্মিলিত হামলায় সারা দেশে ২৬৬ জনের অধিক নিহত এবং ৬ হাজারের অধিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ফুঁসে ওঠে দেশের আপামর জনসাধারণ। আন্দোলন দমাতে মরিয়া হয়ে উঠে স্বৈরাচারী হাসিনা, সামরিক বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয় আরও কঠোরতা অবলম্বনের। তাই পরবর্তী দিনগুলোতে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে হতাহতের সংখ্যা। একপর্যায়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে, ছাত্রজনতা ঘোষনা করে 'মার্চ টু ঢাকা'।

৫ আগস্ট ছাত্রদের ডাকা সেই কর্মসূচি সফল করা ও শত-শত সাধারণ মানুষ হত্যার বিচারের দাবীতে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়াঘাট এলাকায় সকাল থেকেই সমবেত হতে থাকে সাধারণ মানুষ। সময় তখন দুপুর আড়াইটা, তখনও শান্তিপুর্ণভাবে ছাত্র-জনতা আন্দোলন করছিলো। প্রথম থেকে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমাতে রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে পুলিশ। ছাত্র-জনতাও পুলিশের সে হামলা প্রতিরোধ করতে থাকে। তাদের সাথে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে রফিকুল ইসলাম চঞ্চল। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী আর সাধারণ জনতাকে মনোবল না হারানোর জন্য জানান তিনি। পাশাপাশি পুলিশের রাবার বুলেট আর টিয়ারশেলে আহতদের সাধ্য অনুযায়ী সহায়তা করতে থাকেন তিনি। একপর্যায়ে পাটুরিয়া নৌ-ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা আন্দোলনকারীদের সামনে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র নামিয়ে নেয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশ আন্দোলনরতদের দিকে তাক করে বেশ কিছু ফাঁকা গুলি করে। এতে সেখানে কোন ছাত্র-জনতা হতাহত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য এগিয়ে যান রফিকুল ইসলাম, সাকিব সহ বেশ কয়েকজন। তাঁরা পুলিশের দিকে এগিয়ে গেলে এবার এলোপাতাড়ি গুলি চালায় পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হন রফিকুল ইসলাম চঞ্চল, কলেজ পড়ুয়া সাকিব সহ বেশ কয়েকজন। ঘাতক বুলেটটি এসে লাগে রফিকুল ইসলামের পেটে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহাদাতের খাতায় নতুন নাম লিখান তিনি। পরবর্তীতে উথলী হাসপাতাল থেকে আন্দোলনরত হাজার-হাজার শিক্ষার্থী আর সাধারণ জনতা সম্মুখসারি থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া শহীদ রফিকুলের লাশ নিয়ে শিবালয় থানা ঘেরাও করে। পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ জনতা থানায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। শহীদ রফিকুল ইসলামের মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না, তাঁর সাথে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র-জনতা। ইতোমধ্যে স্বৈরাচারী হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ আসে। একই সাথে স্বৈরাচার মুক্ত দেশ আর অপর দিকে কাঁধে শহীদ রফিকুলের লাশ! আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা সেদিন খুব নিকট থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে,

"যুগে যুগে শহীদেরা দিয়ে তাজা প্রাণ
লিখে যান স্বাধীনতা, মুক্তির গান।
হয় না কখনো নেওয়া মুক্তির স্বাদ
শাহাদাত চান আবার আসলে আঘাত।"

শহীদ রফিকুল ইসলাম স্মৃতিতে ভাস্বর

শহীদ রফিকুল ইসলাম চঞ্চল সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর বৃদ্ধ বাবা বলেন, "আমার ছেলে ছোট থেকেই ন্যায়পরায়ণ আর প্রতিবাদী। সে কখনোই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই এই আন্দোলনের শুরু থেকে সে রাজপথে ছিলো। নিজের ১৫ মাস বয়সী একটি কন্যা সন্তান আছে, তারপরেও দেশের মুক্তির আন্দোলন থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়নি।" অন্যদিকে শহীদের মায়ের সাথে আমরা কথা বলতে গেলে সন্তান হারানোর শোকে তেমন কোন কথা বলতে পারছিলেন না তিনি। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার নিজের নিরপরাধ সন্তান সহ স্বৈরাচার বিরোধী এই আন্দোলনে নিহত সকল নিরীহ মানুষ হত্যার বিচার চাইছিলেন।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ রফিকুল ইসলাম চঞ্চলের পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত। তাই পরিবারের হাল ধরতে এসএসসি পরীক্ষার পর কর্মজীবনে প্রবেশ তাঁর। গত কয়েক বছর নারায়ণগঞ্জের একটি জাহাজ নির্মাণকারী কারখানায় চাকুরি করেছেন তিনি। তবে তাঁর স্বপ্ন ছিলো প্রবাসে গিয়ে দরিদ্র পরিবারটির দিন বদলের চেষ্টা করার। তাই মাসখানেক আগে ইতালি যাওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন তিনি। কথা ছিলো অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভিসা প্রস্তুত হয়ে যাবে, তাই নারায়ণগঞ্জের চাকরি ছেড়ে গ্রামে এসেছিলেন তিনি। এরই মধ্যে সারাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান শুরু হলে তাতে অংশগ্রহণ করেন তিনি আর ঠিক বিজয়ের দিনেই শহীদ হন তিনি। শহীদের বৃদ্ধ বাবাই এখন এই অসহায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। শহীদের ছোট বোন দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। আবার শহীদ রফিকুল ইসলাম চঞ্চলের সদ্যবিধবা একজন স্ত্রী ও ১৫ মাস বয়সী একটি কন্যা সন্তান আছে। সব মিলিয়ে এই পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে সকলেই বেশ চিন্তিত।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নাম	: মো: রফিকুল ইসলাম চঞ্চল
জন্ম তারিখ	: ১১ নভেম্বর ২০০৩
পেশা	: ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি
পিতার নাম	: মো: রইস উদ্দীন
পিতার পেশা ও বয়স	: কৃষক, ৫৫ বছর
মাতার নাম	: মোছা: চায়না বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৪০ বছর
স্ত্রীর নাম	: শাবনুর আক্তার
স্ত্রীর পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ২০ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: ১০০০০ টাকা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন।
সন্তানের নাম, বয়স ও সম্পর্ক	: মোছা : রাইসা আক্তার, ১৫ মাস বয়সী, শহীদের কন্যা
ঘাতক	: পাটুরিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা
আহত হওয়ার স্থান	: পাটুরিয়া নৌ-ঘাট এলাকা, শিবালয়, মুন্সিগঞ্জ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, আনুমানিক দুপুর ২টা বেজে ৪০ মিনিট
নিহত হওয়ার স্থান	: পাটুরিয়া নৌ-ঘাট এলাকা, শিবালয়, মুন্সিগঞ্জ।
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, দুপুর ৩ টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: রুপসা বাইতুল জান্নাত কবরস্থান, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: রুপসা, ইউনিয়ন: উলাইল, উপজেলা: শিবালয়, জেলা: মানিকগঞ্জ

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক বা একাধিক প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: শহীদের ১৫ মাস বয়সী এতিম শিশু ও স্ত্রীর জন্য মাসিক ভিত্তিতে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা

প্রস্তাবনা-২: শহীদের দরিদ্র কৃষক পিতাকে এককালীন কিছু অর্থ সহযোগিতা করা

প্রস্তাবনা-৩: শহীদের কলেজ পড়ুয়া বোনের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: ছায়াদ মাহমুদ খান (অন্তর)

ক্রমিক : ১৫৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৩

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ ছায়াদ মাহমুদ খান ২০১২ সালের ৬ আগস্ট মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ধল্লা ইউনিয়নের ধল্লা খান পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতা মো: বাহাদুর খান ও মাতা মোছা: হালিমা আক্তারের দ্বিতীয় সন্তান ছিলো সে। ধলেশ্বরী নদীর কোল ঘেঁষা গ্রাম ধল্লাপাড়া। গাছ-গাছালির সমারোহ আর পাখ-পাখালির কিচিরমিচিরের মাঝেই প্রতিটি সকাল শুরু হতো ছোট্ট ছায়াদ মাহমুদের। সূর্য্যি মামার সাথে ঘুমের ঘোর ভাঙলে হয়তো, সে গ্রামেরই মেঠোপথে হারিয়ে যেত তাঁর দুরন্ত শৈশব। ছায়াদ মাহমুদের যখন জন্ম, তখন প্রবাসে ছিলেন তাঁর পিতা। তখন মমতাময়ী মায়ের আঁচল তলেই কেটেছে তাঁর মধুর দিন গুলো। একটা সময় পেরিয়ে, ছোট্ট ছায়াদকে দেখার প্রতিক্ষা শেষ হয়, তাঁর বাবার। ছোট্ট ছায়াদকে পেয়ে যেন, তিনিও শিশু হয়ে যান। নানা খুনসুটিতে মাতিয়ে রাখেন, তাঁর ছোট্ট সন্তান ছায়াদকে। তবে, অল্প কিছুদিন পরেই আবার জীবিকার তাগিদে প্রবাসে চলে যেতে হয় তাকে।

ছায়াদ দ্বায়ী ইলাল্লাহ হতে চায়, ছড়িয়ে দিতে চায় ইসলামের মাধুর্য

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছায়াদের মনন জুড়ে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে রাখলেও, একপর্যায়ে শহরে চলে আসতে হয় তাঁর পুরো পরিবারটিকে। মূলত তাঁর বড় বোন তাসলিমা খানম এসএসসি পরীক্ষার পর উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির সুযোগ পায় সাভার এলাকার একটি কলেজে। তাই ছোট দুই সন্তান ছায়াদ আর নুরসাতকে নিয়ে সাভারের মডেল কলেজ সংলগ্ন শাহীবাগ এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নেয় তাঁর পরিবার। ছোট্ট থেকেই একমাত্র ছেলে সন্তানকে ইসলামের একজন দ্বায়ী হিসেবে দেখতে চেয়েছে তাঁর পরিবার। ছায়াদও দ্বিমত করেনি কারণ গ্রামে থাকতে খুব অল্প বয়স থেকেই মসজিদে আনাগোনা তাঁর। খেলাধুলা যতই থাকুক, আজান কানে পৌঁছানো মাত্র মসজিদে যেতে বিন্দু মাত্র সময় নষ্ট করতো না ছায়াদ। খেলার সাথীদের নিয়েই নামাজে দাঁড়িয়ে যেত সে। এসব কারণেই ছায়াদের হাতেখড়ি হয়, মাদ্রাসাতেই। খুব অল্প সময়ের

মধ্যেই মারকাযুল উলুম আশরাফিয়াতে কুরআনের ২ পারা হিফজ্ শেষ করে ছায়াদ। তবে ছায়াদ চাইছিলো হিফজের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় গুলোতেও সমান পারদর্শী হতে। কারণ সে বিশ্ববরেণ্য নন্দিত আলেম মাওলানা মিজানুর রহমান আযহারীর মতো মাধুর্যতায় ইসলাম ছড়িয়ে দিতে চাইতো পৃথিবী জুড়ে। তাই পরবর্তীতে জাবাল-ই নুর মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয় তাকে। এখানেই স্বপ্নের চাষ হতে থাকে তাঁর। প্রভাতের আলোর কিরণ ছড়ানোর আগেই, ঘুম থেকে ওঠে ছায়াদ মাহমুদ। সুবহে সাদিকে সালাতুল ফজর আদায় করার পরপরই কুরআনের হিফজ্ শুরু হতো তাঁর। এরপর বাসায় অল্প কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে আসলেও আবার দ্বিতীয় দফায় মাদ্রাসায় যেতে হতো ছায়াদকে। এভাবেই চলছিলো তাঁর দ্বায়ী ইলাল্লাহ হয়ে ওঠার স্বপ্নের বিনির্মাণ।

ফুটবল যেন ছায়াদের প্রাণভোমরা

ছায়াদ ছোট থেকেই ক্রীড়াপ্রেমী কিশোর। তবে ফুটবল যেন সে ভালোবাসাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলো। পড়াশোনার মাঝে অল্প কিছু সময় ফুরসত পেলেই ফুটবল নিয়ে মাঠে চলে যেত সে। যদি কখনো মাঠে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় না থাকতো, তবে বাড়ির কোন এক কোণে ফুটবল নিয়ে চর্চা চলতো তাঁর। প্রতিদিন বিকেলেও নিয়ম করে মাঠে যেত সে। ভালো খেলোয়াড় হওয়ার দরুন তাঁর বন্ধুরা যথেষ্ট সমাদরে রাখতো তাঁকে। আর প্রতি শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটিতে, গ্রামের বাড়ি যাওয়া থেকে আটকানো যেত না তাকে। সাভার থেকে কখনো কখনো নিজেই চলে যেত, মানিকগঞ্জের নিজ গ্রামে। কারণ গ্রামের সে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ মাঠ কি আর এই ঢাকা শহরে পাওয়া সম্ভব?

স্বজনদের অনুভূতি

ছায়াদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর বাবা বলেন, "এই মাসখানেক আগে ফুটবল খেলার জন্য বুটজোড়া কিনার আবদার করলো সে। তখন আমি পরিবার সহ গ্রামের বাড়িতে। গ্রামের বাজারে ফুটবল বুট পাই কই! আশেপাশের কয়েকটি মার্কেটে তন্নতন্ন করে খোঁজার পর পাওয়া গেল সেই কাঙ্ক্ষিত বুট, পছন্দও হলো তাঁর। তবে বুটের দাম ১২০০ টাকা আর তখন বাড়িতে আসার ভাড়া ছাড়া আর কানাকড়িও নেই। তাই বুট কিনলেও এঙ্কলেট কেনার টাকা নেই আমার কাছে। তবে বুট পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছায়াদ বললো, এঙ্কলেট সে তাঁর জমানো টাকায় কিনে নেবে।" কথা গুলো বলতেই, কান্নায় ভেঙে পড়লেন শহীদ ছায়াদের পিতা।

সেদিন মিছিল থেকে আর ফিরলো না ছায়াদ

২০ জুলাই তৃতীয় দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেটবিহীন ছিল। সেনাবাহিনীকে দেশের বিভিন্ন অংশে কারফিউর টহল দিতে দেখা যায়। আন্দোলন তখনও চলমান। সারাদেশে ইতোমধ্যে শহীদের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে। আগের দিনও সহিংসতায় কমপক্ষে ৬৬ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন কয়েকশ মানুষ। বিশেষ করে সেদিন ঢাকার বাড্ডা, রামপুরা, উত্তরা, যাত্রাবাড়ী ও মোহাম্মদপুরে সংঘর্ষ তীব্র হয়। এরই প্রতিবাদে পরদিন ২১ জুলাই, আন্দোলনকারীরা সাভার থানাধীন সাভার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সাভার নিউ মার্কেটের দক্ষিণ পূর্ব দিকের কোনায় চাঁপাইনগামী রাস্তায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা আওয়ামী অঙ্গ সংগঠনের অজ্ঞাতনামা আরও পিশাচের দলের সাথে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রসস্ত্রসহ নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের বেধড়ক পিটায় এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করে। সেই বর্বরোচিত হামলার নেতৃত্ব দেয় সাভারের চিহ্নিত সন্ত্রাস আর একাধিক হত্যা মামলার আসামি রানা ওরফে ব্যন্ড রানা, সাভার উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আতিকুর রহমান আতিক সহ বেশ কয়েকজন। সেই নৃশংস হামলায় সকাল থেকেই সন্ত্রাসীদের সহায়তা করে খুনি হাসিনার শাসনামলের অধিকাংশ অপকর্মের দোসর বাংলাদেশ পুলিশ।

একসময় আন্দোলনস্থল থেকে গোলাগুলির আওয়াজ তীব্র হতে থাকে, পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আন্দোলনকারীদের স্লোগান। তাদের ভাড়া নেওয়া বাড়িটির ছাদ থেকে সবটুকুই প্রত্যক্ষ করছিল সে ও তাঁর বড় বোন। একসময় চুপিচুপি ছাদ থেকে নেমে আসতে গেলে, ছায়াদের ১০ বছর বয়সী খালাতো ভাই হাসিব দেখে ফেলে। সে কই যাচ্ছে জানতে চাইলে ছায়াদ মাহমুদ বলে, "আন্দোলনে যাচ্ছি, বাসায় বলিস না যেন।"

"দেশ ভাসছে শত শহীদের তপ্ত রক্তস্রোতে
কিশোর ছায়াদ মিছিলে গেল, সঙ্গী তাঁদের হতে।"

হাসিবকে জানিয়েই সাভার এলাকায় চলে যায়, ছায়াদ মাহমুদ।

সেখানে দ্বিতীয় দফায় গোলাগুলি শুরু হলে, বিকাল ৫টার কিছুক্ষণ পর ছায়াদ মাহমুদ সহ বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম বয়োবৃদ্ধ শরবত বিক্রেতা শেখ শামীম (৬৫), প্রতিবন্ধী কুরবান শেখ (৫২), সাভারের একটি দোকান কর্মচারী ফারুক(৪০) সহ অসংখ্য মানুষ। ঘাতক সে বুলেটটি ছায়াদের বাম পায়ের উরুতে গভীর ক্ষত করে, অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটু দূরে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছায়াদ মাহমুদ। তখনও এলোপাথাড়ি গোলাগুলি চলছে। এর মধ্যেই রিকশা চালক রনির (২০) বুক বরাবর গুলি লাগলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। তৎক্ষণাৎ তাকে আশপাশের লোকজন উদ্ধার করতে গেলে তিনি জানান, "আমি হয়তো বাঁচমু না কিন্তু সামনে ছোট এক ছেলের পায়ে গুলি লাগছে। ওরে আপনারা বাঁচান।" ছায়াদকে উদ্ধার করতে যায় আন্দোলনরত অন্যান্য ছাত্র-জনতা। ছায়াদের হয়তো তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল, তবে তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে আরেক দফা গুলি শুরু হয়। গোলাগুলি কিছুটা কমে গেলেই, ছায়াদকে রাস্তা থেকে ভ্যানে তুলে স্থানীয় একটি হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায় তারা। সময় তখন বিকাল ৫: ৪০ মিনিট, আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে ছায়াদকে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথিমধ্যে শাহাদাত বরণ করে সে। সেদিন বেঁচে ফিরতে পারেনি ছায়াদ মাহমুদ, বেঁচে ফেরেননি মুমূর্ষ ছায়াদকে বাঁচানো জন্য অনুরোধ করা রিকশা চালক রনিও। জীবনের শেষ মুহূর্তেও বীরত্ব আর মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শহীদ রনি ও নির্ভীক কিশোর ছায়াদ মাহমুদ অন্তর।

মনুষ্যত্বহীনেরাই কলঙ্কিত করেছিলো আমার বাংলাদেশ

ততক্ষণে এনাম মেডিকেলে পড়ে আছে শহীদ ছায়াদ মাহমুদের নিথর দেহ। অন্যদিকে তাঁকে খুঁজে দিশেহারা পরিবার। তন্নতন্ন করে তাকে খুঁজলো সাভারের অলিগলিতে। অবশেষে, স্থানীয় একজনের মুঠোফোনে আহত ছায়াদের শরীরের অর্ধাংশ আর একজন সাংবাদিকের ধারণ করা ভিডিও চিত্র দেখে তাকে শনাক্ত করেন পিতা বাহাদুর খান। সঙ্গে সঙ্গে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজে চলে গেলেন, ছায়াদের মা-বাবা আর খালাতো ভাই নাহিদ। গিয়ে আর সন্তানকে জীবিত দেখতে পারলেন না, মা-বাবা। তাঁদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠলো এনাম মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ। ঘাতকের হিংস্রতা তখনো শেষ হয়নি, অল্প কিছুক্ষণ পর মেডিকেলে এসে কিছু পুলিশ সদস্য ছায়াদের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে লাগলো আর দ্রুত লাশ না নিয়ে গেলে ঝামেলা তৈরী হবে বলে হুমকিও দেওয়া হলো তাদের। তখন দেশজুড়ে কারফিউ চলছে, জনমানবহীন এলাকায় পরিণত হয়েছে সাভারের আশপাশ। তবে এরমধ্যেও মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। অনেক চেষ্টা করার পরেও কোন অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে পারল না বাহাদুর খান। নিরুপায় পিতা শেষমেশ একটি অটো রিকশা জোগাড় করে, তাতেই ছায়াদের নিথর দেহ নিয়ে গ্রামের দিকে চললো তারা। রাত সাড়ে ১১টারও কিছু সময় পরে নিজ গ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম হলো তারা।

নরপিশাচদের বর্বরতার তখনও বাকি অনেক! একটু পরেই বাহাদুর খানের বাড়িতে এলো ধল্লা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগ মনোনীত চেয়ারম্যান জাহিদ ভূঁইয়া, দেলোয়ার খান সহ বেশ কিছু চিহ্নত আওয়ামী সন্ত্রাসী। ওরা বাড়িতে এসে দ্রুতই রাতের অন্ধকারে ছায়াদের মরদেহ দাফনের জন্য নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলো। ছায়াদের পরিবারের ধর্মীয় অনুশাসন পরখ করে জামায়াত-শিবিরের তকমা দিয়ে হুমকিও দিতে লাগলো। তবে সন্তান হারিয়ে তখন আর জীবনের মায়া নেই বাহাদুর খানের, সন্ত্রাসীদের মুখের ওপর বললেন, "গোসল-জানাজা ছাড়া, সন্তানকে দাফন করবেন না তিনি।" ছায়াদের পিতার এমন দৃঢ় মনোভাব, কিছু নিকটাত্মীয় আর প্রতিবেশীদের অনড় অবস্থানের কারণে দ্রুতই সেখান থেকে গা-ঢাকা দিলো ওরা।

জানাজা ও দাফন

পরদিন সকালে জানাজা হলো শহীদ ছায়াদ মাহমুদ অন্তরের। হাজারো মানুষ অংশগ্রহণ করলো তাঁর নামাজে জানাজায়। জানাজার পূর্বে বক্তব্য দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো, ধল্লাখানপাড়া মসজিদের ইমাম আর মুসল্লিরা। এভাবেই সবার মনে মায়ার আবেশ আর অসংখ্য স্মৃতি রেখে, দুনিয়ার সফর শেষ হলো

শহীদ ছায়াদ মাহমুদ অন্তরের। জানাজা শেষে ধল্লা বাজার কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ছায়াদের বাবা বাহাদুর খান জীবন যুদ্ধের এক সংগ্রামী যোদ্ধা। জীবনের বিরাট একটা অংশ কাটিয়েছেন প্রবাসে। সর্বশেষ ২০২২ সালে সৌদি আরব থেকে দেশে আসার পর, দেশেই পোল্ট্রি মুরগীর ব্যবসা শুরু করেন তিনি। তবে প্রথম বারেই বিরাট একটি ধাক্কা খান তিনি, সেবার সব মিলিয়ে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন তিনি। সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনো। তাই নিরুপায় হয়ে, আবারও জীবিকার তাগিদে প্রবাসে যাওয়ার জন্য কাগজ-পত্র প্রস্তুত করছেন তিনি। গ্রামে নিজেদের বসতভিটা আর ছোট্ট একটা বাড়ি থাকলেও সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের। পাশাপাশি শহীদের দুই বোনের পড়ালেখার খরচ, আর ঢাকায় বাড়ি ভাড়া দিতে যথেষ্ট হিমসিম খেতে হয় তাকে। এই পরিবারে শহীদের পিতা ছাড়া আর কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নেই।

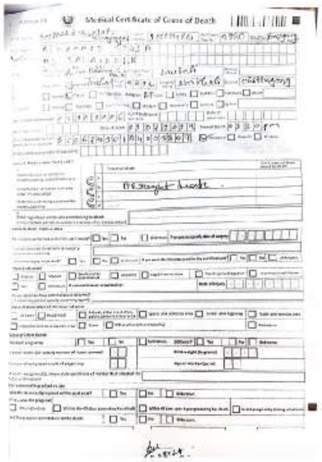
Medical Certificate of Cause of Death

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মোঃ ছায়াদ মাহমুদ খান (অন্তর)
জন্ম তারিখ	: ৬ আগস্ট, ২০১২
পেশা ও প্রতিষ্ঠান	: শিক্ষার্থী; জাবাল-ই নূর দাখিল মাদ্রাসা, সাভার, ঢাকা
পিতার নাম	: বাহাদুর খান
পিতার পেশা ও বয়স	: প্রবাসী, তবে বর্তমানে দেশেই বেকার অবস্থায় আছেন, ৪৮ বছর
মাতার নাম	: হালিমা আক্তার
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩৫ বছর
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

সহোদর ভাই-বোনের নাম, বয়স, পেশা-প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক

১. তাসলিমা খানম (২০), শিক্ষার্থী, গণস্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদের বড় বোন
২. আফরোজা খানম নুসরাত (০৯), শিক্ষর্থী, জাবাল-ই নূর দাখিল মাদ্রাসা, সাভার, ঢাকা

আহত হওয়ার স্থান	: সাভার নিউমার্কেট এলাকায়
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, বিকাল আনুমানিক ৫টা বাজার কিছু সময় পর
নিহত হওয়ার স্থান	: আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাভার এনাম মেডিকেল কলেজে যাওয়ার মাঝপথে
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ২১ জুলাই, বিকাল ৫টা বেজে ৪০ মিনিটের সময়
শহীদের কবরের অবস্থান	: ধল্লা বাজার কেন্দ্রীয় কবরস্থান, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ধল্লাখানপাড়া, ইউনিয়ন: ধল্লা, উপজেলা: সিংগাইর, জেলা: মানিকগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: জি১২/১, ব্যাংক কলোনী, উপজেলা: সাভার, জেলা: ঢাকা

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক বা একাধিক প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: শহীদ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি পিতা বাহাদুর খানের জন্য আর্থিক সহযোগিতার দরকার, যাতে তিনি দেশেই কোন ব্যবসা করতে পারেন

প্রস্তাবনা-২: শহীদের শিক্ষার্থী দুই বোনের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়মিত কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ সজল মিয়া

ক্রমিক : ১৫৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৪

শহীদ সজলের পরিচয়

ছাত্রদের কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবির আন্দোলনে চিটাগাং রোডে পুলিশ ও বিজিবির এলোপাথাড়ি গুলিতে নিহত হয় সজল মিয়া। তার জন্ম ৬ই মে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ। পিতার নাম মো: হাসান আলী, যিনি পেশায় দিন মজুর। মা রুনা আক্তার একজন গৃহিণী। একমাত্র ছোট ভাই ইব্রাহিম মাদরাসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। শহীদ সজলের গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত শ্রীনাবাসদী ইউনিয়নের শালমদী গ্রামে। পরিবারের সাথে তিনি সেখানেই থাকতেন। পেশায় ছিলেন দিনমজুর।

যেভাবে শহীদ হন সজল মিয়া

১৬ জুলাই, রংপুরে পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে শহীদ হন আবু সাঈদ। তারপর থেকে পুরো দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ জনতাও রাস্তায় নেমে আসে। একদিকে চলছিল ছাত্রদের কমপ্লিট শাটডাউন, অন্যদিকে সরকারের কারফিউ। এমতাবস্থায় ২০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জের চিটাগাং রোডে প্রতিদিনের মতো জড়ো হয় ছাত্ররা। তাদের আন্দোলন প্রতিহত করতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও বিজিবি। একদিকে আন্দোলনরত ছাত্ররা, অন্যদিকে পুলিশ-বিজিবি। এমতাবস্থায় সজল মিয়া কাজের সন্ধানে যান

চিটাগাং রোডে। ঠিক ১০টা নাগাদ হঠাৎ ছাত্র-জনতার উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে পুলিশ ও বিজিবি। একটা গুলি এসে ঢুকে যায় সজলের কপালে। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সজল মিয়া। পাড়ি জামান অনন্ত জীবনের পথে। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার নির্দেশে তার সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী সজলকে শহীদ করে। দেশমাতৃকার জন্য সজলের এই আত্মত্যাগ আমরা কখনো ভুলবো না। আমরা সজলকে নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের একজন গর্বিত সৈনিক হিসেবে আজীবন মনে রাখব। স্থান দিয়ে রাখবো আমাদের মনের মণিকোঠায়।

শহীদ সজল সম্পর্কে আরো কিছু কথা

সজলের পিতা দিন মজুর হওয়ায় সংসারের অভাবের অন্ত ছিল না। তার মধ্যেই তিনি আদরের সন্তানকে পড়াশোনা করাচ্ছিলেন। নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, দিনমজুর বাবার পক্ষে সংসারের ঘানি টানা আর সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় সজলকে স্কুলের সুশোভিত

মানবজমিন

কারও তাঁবেদারি করে না

ঊর্ধ্বতন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

কোটা নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল

মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ ও অন্যান্য ২ শতাংশ

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

রোববারও বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ নিহত ৮

বাইডেন সরে দাঁড়ালেন

ঢাকা ছাড়ছেন কূটনীতিকরা

মার্কিন দূতাবাস কর্মীদের আগাম ছুটির অনুমোদন

কারফিউ চলবে দুই-একদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি

পদত্যাগ করে দেশবাসীকে স্বস্তি দিন

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিটি পদক্ষেপের আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণের তাগিদ

জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের বিবৃতি

প্রতিটি হত্যার তদন্ত ও ন্যায় বিচার দাবি

আলোক

জীবনে ক্ষান্ত দিয়ে বেছে নিতে হয় কষ্ট-ক্লেশের দিনমজুরি জীবন। বাবার সীমাহীন কষ্ট তার অন্তরে ঝড় তোলে। একদিকে তার পড়াশোনার খরচ, অন্যদিকে ছোট্ট ভাইটার লালনপালন, আরেকদিকে সংসার চালানো! ভিটেমাটিহীন গরিব পিতার পক্ষে এই ঘানি টানা তো অসম্ভবই!

সবদিক বিবেচনা করে অসহায় সজল সিদ্ধান্ত নেন পড়াশোনা বাদ দিয়ে বাবার সাথে দিনমজুরি কাজ করার। তিনি ভাবেন, তার পড়াশোনা না হলেও ছোট ভাইকে মাদ্রাসায় পড়িয়ে আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা বানিয়ে নিজের পড়াশোনা না করতে পারার আক্ষেপ ঘোচাবেন। সজল বেছে নিলেন বাবার মতো দিনমজুরি কাজ। নিজের সাধ্যমতো ইনকাম করে পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতে থাকেন। চেষ্টা করতে থাকেন পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা আনতে।

পরিবারের বড় সন্তান হওয়ায় সজল মিয়া ছিলেন পিতা-মাতার ভরসা স্থল, ছোট ভাই ইব্রাহিমের অভিভাবক। সন্ত্রাসীগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নিকৃষ্ট স্বৈরশাসক গণখুনি শেখ হাসিনা তার একনায়কত্ব টিকিয়ে রাখতে নিরীহ দিনমজুর সজল মিয়াকেও ছাড়লো না। তার পোষা পুলিশ বাহিনী তরতাজা যুবক সজলকে নিমিষেই বন্দুকের নলে বিদ্ধ করে। বাবা-মার ভরসা স্থল সজলকে

হারিয়ে তারা হয়ে পড়ে নিঃস্ব-অসহায়। ছোট ভাইটা হয়ে পড়ে বিমূঢ়। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হয়ে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সবার অন্তরে নেমে আসে অসীম শূন্যতা আর সীমাহীন হাহাকার।

সংক্ষেপে শহীদ সজল

নাম	: সজল মিয়া
জন্ম তারিখ	: ৬-৫-২০০৫
পিতা	: মোঃ হাসান আলী
মাতা	: রুনা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শালনদী, ইউনিয়ন: শ্রীনাবাসদী থানা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ পেশা: দিনমজুর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন (মা, বাবা, ভাই)
পরিবারের আয়ের উৎস	: পিতার দিনমজুরি
শহীদ হবার স্থান	: চিটাগাং রোড
ঘাতক	: পুলিশ ও বিজিবি
আঘাতের ধরন	: কপালে গুলি
আহত ও শাহাদাতের তারিখ	: ২০ জুলাই, ২০২৪; বেলা ১০টা
কবরস্থান	: নিজ এলাকা

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করা প্রয়োজন

শহীদ আবদুর হান্নান

ক্রমিক : ১৫৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৫

শহীদ-পরিচিতি

আবদুর হান্নান যাত্রাবাড়িতে ফার্নিচারের ব্যবসা করতেন। তার পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মৃত আবদুস সোহরাব এবং মাতা মৃত নুরজাহান বেগম। আবদুল হান্নান স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে যাত্রাবাড়িতে ভাড়া বাসায় থাকতেন। আবদুর হান্নান শুরু থেকে ছাত্রদের সমর্থন দিয়ে গেছেন। তিনি তার পরিবারসহ প্রতিদিনের সংবাদ উৎসুক হয়ে শুনতেন। ৫ আগস্ট জনতার সাথে অংশ নেন। ঐদিন বিকাল ৪.২০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ি এলাকায় ঘাতক পুলিশের দ্বারা বুকে গুলিবিদ্ধ হন। গোলাগুলির মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-জনতা রিকশায় করে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। পরদিন তিনি ৫ আগস্ট বিকাল ৪.৩০ মিনিটে মৃত্যু বরণ করেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

আবদুর হান্নান জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯৭০ সালে। জন্মের পরে জ্ঞান হতেই তিনি অনুভব করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম

দূর্ভিক্ষ। যে দূর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন স্বৈরশাসক শেখ মুজিবের অদক্ষতা, দূর্বল শাসন ব্যবস্থা এবং মুজিবসহ তার মন্ত্রী-এমপিদের লুটপাটের ফলে। দূর্ভিক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রি করে দেয় অভাবীরা। রাস্তায় ডাস্টবিনের পচা খাবার কুড়িয়ে খায়। ক্ষুধায় খাবার না পেয়ে বমি খেয়েছে বলে তখনকার পত্রিকায় নিউজ

হয়েছিল। এমনকি ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে খলিলুল্লাহর মতো নরখাদকের জন্ম হয়। যে হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে লাশ খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। কবি রফিক আজাদ এরকম বীভৎস মুহূর্তে মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ভাত দে হারামজাদা! নইলে মানচিত্র চিবিয়ে খাব'! ১৯৭৫ সালে মুজিব ও তার দলের বিনাশ হলে দেশের মানুষ কিছুটা স্বস্তি লাভ করে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশ উন্নতির দিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। ১৯৯৬ সালে আবারো মুজিবের সেক্যুলার দল আওয়ামী লীগ ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্ষমতায় আসে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মিথ্যুক সাইকো খুনি হাসিনা ও তার ঘাতক বাহিনীর অত্যাচার সাধারণ মানুষের মত জনাব আবদুর হান্নান সাহেবও অবলোকন করেছিলেন। নির্যাতিত

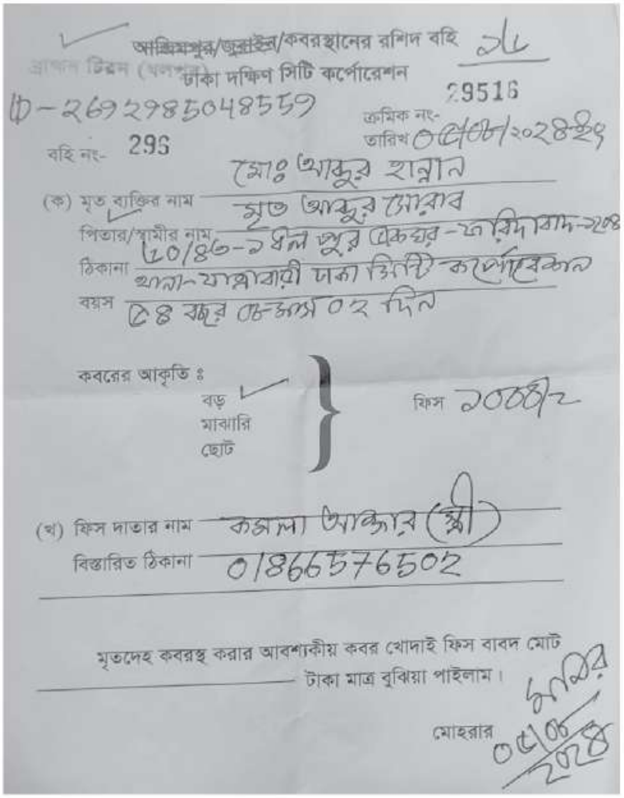

আজিমপুর/জুরাইন/কবরস্থানের রশিদ বহি ৩৮

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

D-২৬৯২৯৮৫০৪৮৫৫৯

29516

ক্রমিক নং-

তারিখ ০৫/০৮/২০২৪ইং

বহি নং- 296

(ক) মৃত ব্যক্তির নাম মোঃ আব্দুর হান্নান

পিতার/স্বামীর নাম মৃত আব্দুর সোবাব

ঠিকানা ৮০/৪৩-২ ধলপুর একঘর-ফরিদাবাদ-১২০৪ থানা-যাত্রাবাড়ী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

বয়স ৫৪ বছর ০৮ মাস ০২ দিন

কবরের আকৃতি ঃ বড় / মাঝারি / ছোট } ফিস ২০০০/-

(খ) ফিস দাতার নাম কমলা আক্তার (স্ত্রী)

বিস্তারিত ঠিকানা 01866576502

মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট ________ টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।

মোহরার ০৫/০৮/২০২৪

হয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কোটা বিরোধী আন্দোলন স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। ১৮ জুলাইতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অসংখ্য ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। প্রতিবাদে ১৯ জুলাই জুমার পরে ছাত্র-জনতা আবারো রাজপথে নেমে আসে। হাসিনার নির্দেশে সারাদেশে ঘাতক বাহিনী চারদিক থেকে হামলা করে। ফলে আহত ও শহীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আবদুর হান্নান শুরু থেকে ছাত্রদের সমর্থন দিয়ে গেছেন। তিনি তার পরিবারসহ প্রতিদিনের সংবাদ উৎসুক হয়ে শুনতেন। ৫ আগস্ট জনতার সাথে অংশ নেন। হাসিনার পদত্যাগের খবরে আনন্দে রাস্তায় নামেন। ভেবেছিলেন এবার বুঝি মুক্তি মিললো। দেশ থেকে ফেরাউন সরকার বিতাড়িত হলো।

হাসিনা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে লাশ ফেলতে কখনো দেরি করতোনা। তার বিরোধীদের খুন করতে তার মন সামান্যও কাপেনা। তার নির্দেশ ছিল আন্দোলন দমন করতে প্রয়োজনে রাজপথে সবাইকে হত্যা করতে হবে। তার এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে তারই নিয়োজিত পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং বিতর্কিত সংগঠন ছাত্রলীগ ছাত্র-জনতার উপরে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ঐদিন বিকাল ৪.২০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ি এলাকায় ঘাতক পুলিশের দ্বারা বুকে গুলিবিদ্ধ হন। গোলাগুলির মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-জনতা রিকশায় করে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। পরদিন তিনি ৫ আগস্ট বিকাল ৪.৩০ মিনিটে মৃত্যু বরণ করেন। কাজির দরগাহ ধলাপুর কবরস্থানে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

আবদুর হান্নানের পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মৃত আবদুস সোহরাব এবং মাতা মৃত নুরজাহান বেগম। আবদুল হান্নান স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে যাত্রাবাড়িতে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার স্ত্রী কমলা আক্তার গৃহিণী। ছেলে তানভীর (২৬) সোনারগাঁও টেক্সটাইল কলেজের স্নাতক ৩য় বর্ষের ছাত্র এবং মেয়ে সোহানা (২১) এস এস সি পাস। উল্লেখ্য যে তার সন্তান তানভীর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শামীল হয়েছিলেন। বর্তমানে তার পরিবারে কোন আয় নেই।

আত্মীয়ের বক্তব্য

সন্তান বলেন, বাবা আমাদের সাহস দিতেন। ন্যায়ের পক্ষে থাকতেন। আমরা তার হত্যার বিচার চাই।

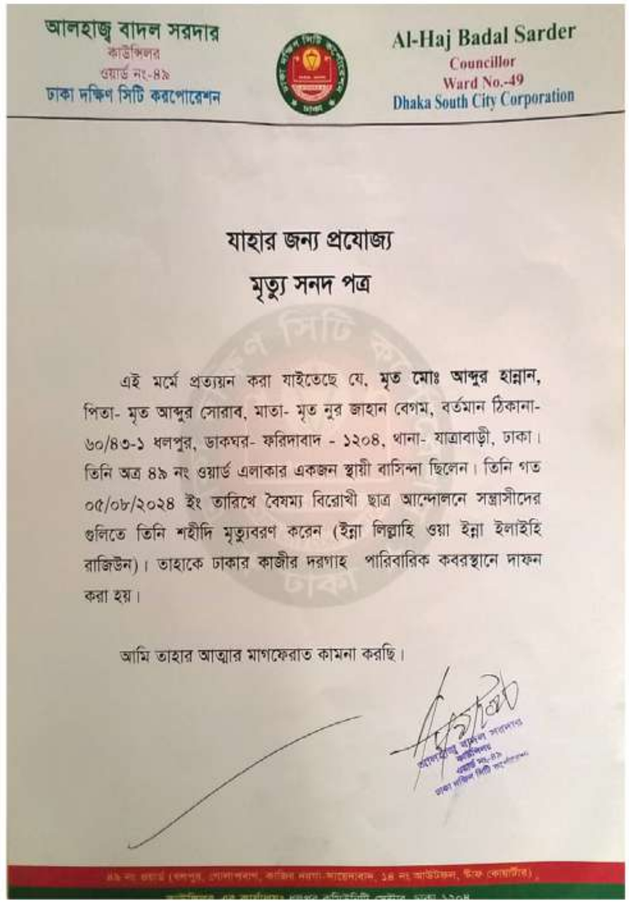

আলহাজ্ব বাদল সরদার
কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং-৪৯
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

Al-Haj Badal Sarder
Councillor
Ward No.-49
Dhaka South City Corporation

যাহার জন্য প্রযোজ্য

মৃত্যু সনদ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, **মৃত মোঃ আব্দুর হান্নান,** পিতা- মৃত আব্দুর সোরাব, মাতা- মৃত নুর জাহান বেগম, বর্তমান ঠিকানা- ৬০/৪৩-১ ধলপুর, ডাকঘর- ফরিদাবাদ - ১২০৪, থানা- যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। তিনি অত্র ৪৯ নং ওয়ার্ড এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গত ০৫/০৮/২০২৪ ইং তারিখে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি শহীদি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাহাকে ঢাকার কাজীর দরগাহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আমি তাহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

এক নজরে

নাম	: মো: আবদুর হান্নান
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ	: ৩ জানুয়ারি ১৯৭০
পিতা	: আবদুর সোরাব
মাতা	: নুর জাহান বেগম
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ি
আক্রমণকারী	: যুবলীগের সন্ত্রাসী
দাফন করা হয়	: কাজির দরগাহ ধলাপুর কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: ৬০/৪৩-১ ধলপুর, ফরিদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ঐ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	:

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা
২. সন্তানদের লেখা-পড়া ও চাকুরীতে সহযোগিতা প্রদান করা

শহীদ মোঃ আদিল

ক্রমিক : ১৫৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৬

জন্ম ও পরিচয়

আওয়ামী লীগের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বৈরশাসক ক্ষমতালোভী গণখুনি হাসিনা সরকারের কাছে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি জানিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল এদেশের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু রক্ত পিপাসু হাসিনা সে যৌক্তিক দাবি মেনে না নিয়ে দলীয় পুলিশ বাহিনী দ্বারা গুলি করে নিরীহ ছাত্রদের হত্যা করে। তেমনই এক শহীদ ছাত্র মো. আদিল। তিনি ঢাকার মীরহাজিরবাগে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় দশম শ্রেণিতে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ২০০৮ সালের জুন মাসের ১০ তারিখে ব্যবসায়ী পিতা মোঃ আবুল কালাম ও গৃহিণী মা আয়েশা আক্তারের কোল জুড়ে আগমন ঘটে তৃতীয় সন্তান মোঃ আদিলের। তার বসবাস নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার অন্তর্গত কুতুবপুর ইউনিয়নের ভোঘাড়ি গ্রামে পরিবারের সাথে। তার বড় দুই ভাই আব্দুল্লাহ আল নোমান (২৬) মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন এবং বায়োজিদ আহমদ (২১) পড়ছেন পলিটেকনিকে। তারাও অত্যন্ত মেধাবী। পরিবারের ছোট ছেলে হওয়ায় বাবা-মায়ের পরম আদরের ছিলেন মোহাম্মদ আদিল। ছিলেন দুই ভাইয়ের চোখের মণি।

শহীদ হলেন যেভাবে

মো. আদিল প্রথমে বাড়িতে থেকে মাদ্রাসায় যাতায়াত করতেন। জুলাইয়ের শুরুতেই মাদ্রাসার হোস্টেলে ভর্তি হন। কেননা সামনে ছিল তার দাখিল পরীক্ষা। কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন তিনি হোস্টেল ছেড়ে বাড়িতে যান।

ঘটনার দিন ১৯ জুলাই ২০২৪। সারাদেশে চলছে কারফিউ, অন্যদিকে ছাত্রদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি। এমতাবস্থায়

ঐদিন বিকাল ৩:৩০টায় আদিল নারায়ণগঞ্জের ভূইগর এলাকার এসবি গার্মেন্টসের সামনে অন্যান্য ছাত্র-জনতার সাথে সমবেত হন। হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে বাজপাখির মতো উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টার থেকে একটি বুলেট এসে আদিলের বুকের ডানপাশে লেগে বুকটা এফোঁড়ওফোঁড় করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। স্বৈরাচারের নির্মম-নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে ঘটনাস্থলেই শাহাদাতবরণ করেন আদিল। নিভে যায় বাবা-মায়ের সবচেয়ে আদরের ধন বুকের মানিকের জীবন প্রদীপ!

আদিল সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

শহীদ আদিল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায় তিনি দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করতেন। ২০২৪ সালের গণিত অলিম্পিয়াডে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে সনদ ও ক্রেস্ট লাভ করেন। পড়াশোনায় যেমন মেধাবী ছিলেন, তেমনি ব্যবহারেও ছিলেন নম্র-ভদ্র ও সচ্চরিত্রবান। তার শিক্ষক, গুরুজন আর সহপাঠীরা তার ব্যবহারে ছিলেন মুগ্ধ। তারা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। তার অকাল মৃত্যুতে তারা অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে নেমে আসে শোকের কালো ছায়া।

আদিলের সামনে ছিল দাখিল পরীক্ষা। তাই জুলাইয়ের শুরুতে মাদ্রাসার হোস্টেলে ওঠেন, যাতে একমনে-একধ্যানে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারেন। ২ জুলাই ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন, "চলে যাচ্ছি নেটওয়ার্কের বাইরে, দেখা হবে ৭ মাস পর।" কিন্তু মেধাবী সেই আদিল নেটওয়ার্কের বাইরে চলে গেলেন সারা জীবনের জন্য। খুনি হাসিনা মেধাবী সম্ভাবনাময় এই কিশোরকে বাঁচতে দিলো না। পরিবারের ছোট ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মা নির্বাক-নিস্তব্ধ। বড় ভাই দুজন আদরের ছোট ভাইকে হারিয়ে বিমূঢ়। তাদের হৃদয়ে অসীম শূন্যতা আর করুণ হাহাকার। তার মৃত্যুর খবরে সবাই হয়ে পড়ে শোকাহত। জনমদুখিনী মায়ের কলিজা ছিঁড়ে বের হয় রোনাজারি। বাবার বুকটা করে ওঠে হাহাকার। তার নিথর দেহটা বাড়িতে নিলে তৈরি হয় হৃদয় বিদারক দৃশ্যের। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চারিদিক থেকে ছাপিয়ে উঠে আহাজারি। বারবার মূর্ছা যান মা। চোখের পানিতে বুক ভেসে যায় বাবার। বড় ভাই দুটোর কলিজা ছেঁড়া কান্নায় প্রকৃতি ও যেন কেঁদে ওঠে সকরুণ সুরে। নিথর সজলের মায়াবী মুখটার দিকে তাকিয়ে ব্যথাতুর গান গেয়ে যায় বনের পাখিরা! কেঁদে ওঠে গাছের পাতারা! পাড়াপড়শী, আত্মীয়-স্বজন বারবার এসে চোখ মুছে যায়! কী এক বেদনাবিদুর সন্ধিক্ষণ!

সকল ভালোবাসা আর মায়া কাটিয়ে অবশেষে আদিল প্রবেশ করেন নিজ গ্রামের অনন্ত জীবনের মাটির ঘরে! মহল্লার গোরস্তানে!

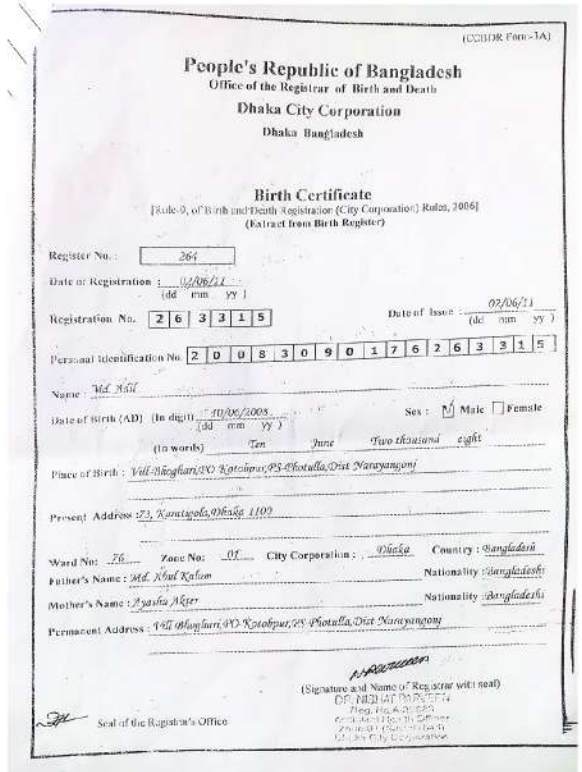

(CCBDR Form-1A)

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Dhaka City Corporation
Dhaka Bangladesh

Birth Certificate
[Rule-9, of Birth and Death Registration (City Corporation) Rules, 2006]
(Extract from Birth Register)

Register No.: 264
Date of Registration: 02/06/11 (dd mm yy)
Registration No. 263315
Date of Issue: 07/06/11 (dd mm yy)
Personal Identification No. 20083090176263315
Name: Md. Adil
Date of Birth (AD) (In digit) 10/06/2008 (dd mm yy)
Sex: ☑ Male ☐ Female
(In words) Ten June Two thousand eight
Place of Birth: Vill-Bhoghari, PO Kotobpur, PS-Fotulla, Dist Narayangonj
Present Address: 73, Karatgola, Dhaka 1100
Ward No: 76 Zone No: 01 City Corporation: Dhaka Country: Bangladesh
Father's Name: Md. Abul Kalam Nationality: Bangladeshi
Mother's Name: Ayasha Akter Nationality: Bangladeshi
Permanent Address: Vill Bhoghari, PO Kotobpur, PS Fotulla, Dist Narayangonj

(Signature and Name of Registrar with seal)
DR. NISHAT PARVEEN

Seal of the Registrar's Office

শহীদ আদিলের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মো: আদিল
জন্ম তারিখ	: ১০.০৬.২০০৮
পিতা	: মো: আবুল কালাম
মাতা	: আয়েশা আক্তার
ঠিকানা	: গ্রাম- ভোঘাড়ি, ইউনিয়ন, কুতুবপুর, থানা- ফতুল্লা, জেলা নারায়ণগঞ্জ
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা (মীর হাজিরবাগ)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন (বাবা, মা ও দুই ভাই)
পরিবারের আয়ের উৎস	: পিতার ব্যবসা (মাসিক ২০০০০)
শহীদ হওয়ার স্থান	: এসবি গার্মেন্টস, দেলপাড়া, ভূইগর, নারায়ণগঞ্জ
হত্যাকারী পিশাচ	: পুলিশ ও র‍্যাব
আঘাতের ধরন	: গুলিতে বুক এফোঁড়ওফোঁড়
আহত ও শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৩:৩০ মিনিট
কবরস্থান	: নিজ এলাকার গোরস্থান।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং প্রয়োজনে সহযগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া

নিউজ লিংক

১। https://www.youtube.com/watch?v=IxTLStnbMus
২। https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-604611

শহীদ আব্দুর রহমান

ক্রমিক : ১৫৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৭

শহীদ আব্দুর রহমানের পরিচয়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন, যা পরবর্তীতে রূপ নেয় স্বৈরাচার পতনের ছাত্রজনতার গণ-আন্দোলনে, এই আন্দোলন দমনোর জন্য খুনি হাসিনা গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যায় বাদ যায়নি শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউই। তেমনই একজন শহীদ ৬৬ বছরের বৃদ্ধ দিনমজুর আব্দুর রহমান। তাঁর জন্ম চাঁদপুরে, ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি। পিতার নাম মৃত হাসান দেওয়ান। মায়ের নাম মৃত সাহেরা বেগম। জন্মস্থান চাঁদপুর হলেও তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার কুতুবপুরের ভোঘাড়ী গ্রামে। করতেন দিনমজুরের কাজ। শহীদের দুই ছেলে এবং এক মেয়ে থাকলেও তারা বিবাহিত জীবনে গড়েছে আলাদা সংসার। মেয়ে রয়েছেন শ্বশুরবাড়িতে। ফলে বৃদ্ধ আব্দুর রহমান স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকতেন। ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে কোনোরকম জীবনযাপন করতেন। স্বামী-স্ত্রীর সংসার চালাতেন দিনমজুরের কাজ করে। বৃদ্ধ স্ত্রী একমাত্র উপার্জনক্ষম স্বামীকে হারিয়ে এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন।

যেভাবে শহীদ হলেন আব্দুর রহমান

ঘটনার দিন ২১ শে জুলাই ২০২৪। ছাত্র আন্দোলন দমাতে ইতোমধ্যে সারাদেশে চলছে কড়া কারফিউ। অন্যদিকে কারফিউ ভঙ্গ করে ছাত্র জনতা নেমেছে রাস্তায়। ঘটনার দিন দুপুর ১২টার দিকে আব্দুর রহমান নারায়ণগঞ্জের ভুইগর এলাকার সিকদার পাম্পের সামনে হাজারো ছাত্র জনতার সাথে সমবেত হন। হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে বিকট শব্দে উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টার থেকে একটা গুলি এসে আব্দুর রহমানের বুকের বামপাশ দিয়ে প্রবেশ করে শরীর এফোঁড়ওফোঁড় করে পিঠের দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে শাহাদাতবরণ করেন তিনি। তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে তাকে দাফন করা হয়।

আব্দুর রহমানের সংগ্রামী জীবন

জন্মের পর থেকেই সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন আব্দুর রহমান। জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোনো কাজ নেই, যা তিনি করেননি। বহু কষ্টে স্ত্রীকে নিয়ে তিন সন্তানকে বড় করেছেন, মানুষ করেছেন। বড় দুই ছেলে মো: ফয়সাল (৩২) ও মো: রনি (২৬) বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর আলাদা সংসার গড়েছে। একমাত্র মেয়ে বৃষ্টি বেগমকেও (২২) বিয়ে দিয়েছেন। এ পর্যন্ত আসতে তাকে করতে হয়েছে বহু সংগ্রাম। ছেলেরা ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে চাইলেও শরীরে শক্তি থাকতে তিনি বোঝা হয়ে থাকতে চাননি। তাইতো স্ত্রীকে নিয়ে এই বয়সেও থাকতেন আলাদা বাসায়। করতেন দিনমজুরের সংগ্রামী কাজ। এমন এক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকেও ছেড়ে দেয়নি খুনি হাসিনা। বুলেটের আঘাতে তার বুক করে দিয়েছে এফোঁড়ওফোঁড়। বটবৃক্ষের মতো ছায়া দেওয়া বাবাকে হারিয়ে শোকাহত সন্তানেরা। চিরজীবনের সঙ্গীকে হারিয়ে মর্মাহত স্ত্রী। পিতৃহত্যার দায়ে ক্ষমতালোভী খুনি হাসিনার বিচার চান তারা।

একনজরে শহীদ আব্দুর রহমান

নাম	: আব্দুর রহমান
জন্ম তারিখ	: ০১.০১.১৯৫৮
পিতা	: মৃত হাসান দেওয়ান
মাতা	: মৃত সাহেরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভোঘাড়ী, ইউনিয়ন: কুতুবপুর, থানা: ফতুল্লা, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
জন্ম জেলা	: চাঁদপুর
পেশা	: দিনমজুর
শহীদ হওয়ার স্থান	: সিকদার পাম্প, দেলপাড়া, ভুইগর, নারায়ণগঞ্জ
হত্যাকারী	: পুলিশ ও র‍্যাব
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলিবিদ্ধ
শাহাদাতের তারিখ ও সময়	: ২১ জুলাই ২০২৪ দুপুর ১২টা
কবরস্থান	: নিজ জেলা চাঁদপুরে

শহীদ পরিবারের প্রতি সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রীর জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া

২. স্ত্রীর জন্য নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

শহীদ মো: মাবরুর হুসাইন

ক্রমিক : ১৬০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৮

পরিচয়

শহীদ মাবরুর হুসাইন ছিলেন ২৪ বছর বয়সি তরুণ আলেম। দেশ ও মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই তরুণ সুস্থ সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিচরণ করতেন। ছিলেন ইসলামী সংগীত শিল্পী। ইউটিউবে এখনো আছে তাঁর হৃদয়গ্রাহী সংগীত। শহীদের পিতা একজন ব্যবসায়ী। মা গৃহিণী। নারায়ণগঞ্জে একটি বাড়িও আছে। অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। একমাত্র সন্তানকে ঘিরে ছিল স্বপ্নের প্রাসাদ। ছেলেকে বানিয়েছিলেন আলেমে দ্বীন। পৃথিবীর অনেক স্বপ্নই অধরা থেকে গেল তাদের। তবে তারা এখন শহীদের গর্বিত পিতা-মাতা।

ঘটনার বিবরণ

বিগত ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে কারফিউ জারি করেছিল ফ্যাসিস্ট সরকার। ছাত্র-জনতা এ কারফিউ উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসেছিল। প্রতিদিনই চলছিল আন্দোলন। দীর্ঘ হচ্ছিল শহীদের মিছিল। ২১ জুলাই ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায় শহীদ মাবরুর হুসাইন ভূইগর এলাকার সিকদার পাম্পের সামনে অন্যান্য ছাত্র জনতার সাথে সমবেত হলেন। মাথার ওপর ছিল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া একটি গুলি শহীদ মাবরুর হুসাইনের ডান পাজর ভেদ করে বেরিয়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শহীদের মা শাহনাজ বেগম বলেন, "আমার ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সন্তান হারানোর ব্যথা কী, সেটা মা-বাবা ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমার বাবা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এখন পুলিশ দেখলেই ভয় লাগে।"

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: মাবরুর হুসাইন
জন্ম তারিখ	: ১৬-০৪-১৯৯৯
জন্মস্থান	: নারায়ণগঞ্জ
পেশা	: ছাত্র
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম বাগে জান্নাত মাদ্রাসা, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ
আহত হবার স্থান	: সিকদার পাম্প পাড়া ভূইগর, নারায়নগঞ্জ
শহীদ হবার স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪ দুপুর ১২:০০ টা, সিকদার পাম্প ভূইগর, নারায়নগঞ্জ
আঘাতের ধরণ	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ/ র‌্যাব
আহত হবার সময় ও তারিখ	: ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২:০০ টা
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২:০০ টা
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব শিয়াচর, ইউনিয়ন: কুতুবপুর, থানা: নারায়নগঞ্জ সদর, জেলা: নারায়নগঞ্জ

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

পিতা: মো: আব্দুল হাই
পিতার পেশা: ব্যবসা
মাতা: শাহনাজ বেগম
মাতার পেশা: গৃহিণী

প্রস্তাবনা

১. সন্তান হারা শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা প্রয়োজন

শহীদ মেহেদী হাসান

ক্রমিক : ১৬১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০২৯

পরিচয়

শহীদ মেহেদী হাসান দরিদ্র বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। আদি নিবাস মুন্সীগঞ্জের রায়পাড়া গ্রামে হলেও বেড়ে ওঠেন নারায়ণগঞ্জের ঝাউচর গ্রামে। পিতা-মাতা ছেলেকে নিয়ে নানাবিধ স্বপ্ন দেখতেন। চেয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার বানাতে। শহীদের পিতা স্থানীয় একটি কারখানায় তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারি। শহীদ মেহেদী হাসানের নানা বাড়ি থেকে সামান্য কিছু জায়গা-জমি পেয়ে সেখানে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন। আর্থিক অনটন ছিল নিত্য সঙ্গী। তবুও এক বুক আশা নিয়ে ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন একটি বেসরকারি পলিটেকনিকে। শহীদ মেহেদী হাসান কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। পড়ালেখার খরচ চালানোর জন্য টিউশানি করতেন। নিজ খরচের পর পরিবারকেও যৎসামান্য দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন গত ২০ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ হন। সেই সাথে নিভে যায় বাবা-মায়ের স্বপ্ন-আশার আলো।

ঘটনার বিবরণ

গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেন। অন্যদিকে স্বৈরাচার সরকারও আন্দোলকে প্রতিহত করার জন্য কারফিউ জারি করে। ২০ জুলাই দুপুর ১২ টায় শহীদ মেহেদী হাসান শনির আখড়া ডাচবাংলা

ব্যাংকের সামনে অন্যান্য ছাত্র-জনতার সাথে সমবেত হন। সে সময় টহলরত র‍্যাবের হেলিকপ্টার থেকে দুটো গুলি এসে তাঁর বুকের বাম পাশে এবং মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই মেহেদী হাসান শাহাদাত বরণ করেন। রণক্ষেত্রে পরিণত হয় শনির আখড়া এলাকা।

শহীদ মেহেদী হাসানের বাবা বলেন, “গত ২০ জুলাই শনিবার সকালে প্রতিদিনের মতো আমি কাজে চলে যাই। সন্ধ্যায় ফিরে মেহেদীকে বাসায় না দেখে তার মোবাইলে ফোন দিই। অনেক বার ফোনে রিং হওয়ার পর এক ছেলে রিসিভ করে জানায় মেহেদী আর নেই। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি রাস্তায় পড়ে আছে আমার বাবার নিথর দেহ। মাথায় গুলি লাগায় মগজ বের হয়ে গেছে। পলিথিনে ভরে ছেলের নিথর দেহটাকে অনেক কষ্টে বাড়ি নিয়ে আসি। পরে এলাকাবাসীর সহায়তায় শনিবার দিবাগত রাত ২ টায় নামাজে জানাজা দেই আমার বাপজানরে।” বুকফাটা কান্না চেপে তিনি আরো বলেন, “আমার ছেলেকে যারা এমন নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের শাস্তি হবেই।”

শহীদ মেহেদীর মা শিল্পী বেগম ছেলের কলেজের আইডি কার্ড হাতে নিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “অনেক স্বপ্ন ছিল আমাদের। কেন মারলো ওরা আমার ছেলেকে? কী দোষ করেছিল মেহেদী? আমরা এখন কী নিয়ে বাঁচব?”

ঘটনার পর থেকে ছেলের কথা মনে হলেই বুকফাঁটা চাপা কান্নায় ভেঙে পড়েন শহীদ মেহেদীর বাবা মো: ছানাউল্লাহ। স্বৈরাচার শুধু একজন সম্ভবনাময় তরুণকেই কেড়ে নেয়নি; কেড়ে নিয়েছে শহীদের পিতা-মাতার স্বপ্ন, আনন্দ, বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন।

১৪ কোটা সংস্কার আন্দোলন : রাজধানীসহ সারা দেশে নিহত যারা (আংশিক)

যুগান্তর

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Register, Birth and Death Registration
Baluakandi Union Parishad
Gazaria, Munshiganj
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Death Registration Number
20035912410020025

Date of Birth	: 01/07/2003	Sex : Male	
Date of Death	: 20/07/2024		
In Word	: Twentieth of July Two Thousand Twenty Four		
		Name	: Md Mehedi
		Mother	: Mst Shilpi Begam
		Nationality	: Bangladeshi
		Father	: Md Sanaullah
		Nationality	: Bangladeshi
		Place of Death	: Narayanganj, Bangladesh
		Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Register
(Preparation, Verification)
Md. Feroz Ahmed
Administrative Officer
Baluakandi Union Parishad
Gazaria, Munshiganj

Seal & Signature
Register
Md. Shahiduzzaman
Chairman

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মেহেদী হাসান
জন্ম	: ০১.০৭.২০০৩
পিতা	: মো: ছানাউল্লাহ
পিতার পেশা ও বয়স	: দিনমজুর, ৫০ বছর
মাসিক আয়	: ১০,০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: দিনমজুর
মাতা	: মোসা: শিল্পী বেগম
মায়ের পেশা	: গৃহিণী
বোন	: নির্ঝনা আক্তার বয়স : ২৪ (বিবাহিতা)
জন্মস্থান	: মুন্সীগঞ্জ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	গজারিয়া ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড ট্যাকনোলজি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বড় রায়পাড়া, থানা: গজারিয়া, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ঝাউচর, ওয়ার্ড নং: ৯, ইউনিয়ন: পিরোজপুর, উপজেলা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
শহীদ হওয়ার স্থান	: শনির আখড়া
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই দুপুর ১২টা
আঘাতের ধরন	: র‌্যাবের হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া বুলেটের আঘাতে বুকের বাম পাশ এবং মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যায়

প্রস্তাবনা

১.পরিবারটির স্থায়ী আয়ের উৎস তৈরি করে দেওয়া দরকার

নিউজ লিংক

https://www.dainikalokitonews.com/2024/08/14/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B/print/

https://www.munshigonjerkagoj.com/%E0%A6%97%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0/

https://amarbikrampur.com/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE/#google_vignette

শহীদ ইমরান হাসান

ক্রমিক : ১৬২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৩০

পরিচয়

শহীদ ইমরান হাসান গজারিয়া ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজিতে অধ্যায়ন করতেন। স্বপ্ন দেখতেন দক্ষ প্রকৌশলী হবার। শহীদের পিতা জনাব ছালে আহাম্মেদ একজন মুদি দোকনদার। মা গৃহিণী। অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি। ৪ জনের পরিবারটির চাওয়াপাওয়া খুব বেশি ছিল না। অল্পতেই ছিলেন সন্তুষ্ট। তাদের জীবনের ছন্দপতন ঘটে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে। পরিবারে নেমে আসে বিষাদের ছাঁয়া। বড় ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন শহীদ বাবা-মা।

ঘটনার বিবরণ

ছাত্র-জনতার বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে শহীদ হন ইমরান হাসান। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১০ টায় শহীদ ইমরান হাসান অন্যান্য ছাত্র জনতার সাথে যাত্রাবাড়ী মোড়ে সমবেত হয়েছিলেন। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগের পূর্বেও ছাত্র-জনতার রক্তের ওপর দিয়ে হলেও ক্ষমতায় থাকার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তারই অংশ হিসেবে যাত্রাবাড়ীতে দুপুর ২ টায় পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। এমন সময় ছাত্র-জনতার মিছিলে থাকা শহীদ ইমরানের বুকের ডান পাশে ও তলপেটে দুটো বুলেট আঘাত হানে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শহীদ ইমরান। স্থানীয় লোকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১ সেপ্টেম্বর শহীদের মা কোহিনুর আক্তার বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ২৯৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছিলেন। এ মামলার অভিযোগে বলা হয়ছিল, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে। এতে ছাত্র ইমরান হাসান গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

দৈনিক দেশ রুপান্তর পত্রিকার মতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শুধু যাত্রাবাড়িতেই ৫০ জনের মৃত্যু হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: ইমরান হাসান
Name: IMRAN HASAN
পিতা: মোঃ ছালে আহাম্মেদ
মাতা: কোহিনুর আক্তার
Date of Birth: 17 Dec 2005
ID NO: 5125010164

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: শহীদ ইমরান হাসান
জন্ম তারিখ	: ১৭.১২.২০০৫
পেশা	: ছাত্র
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: গজারিয়া ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি
আহত হবার স্থান	: যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
শহীদ হবার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরণ	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি
আহত হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ২.০০ টা, ৫ই আগস্ট, ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ২:৩০ টা, ৫ আগস্ট ২০২৪
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	গ্রাম : গঙ্গানগর, চর রমজান সোনাউল্লাহ, ইউনিয়ন : নিউটাউন, থানা : সোনারগাঁও, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: ছালে আহাম্মেদ
পিতার পেশা ও বয়স	: মুদি দোকানদার, ৫০ বছর
মাতা	: কোহিনুর আক্তার
মাতার পেশা	: গৃহিণী
মাসিক আয়	: ১০,০০০/-
আয়ের উৎস	: মুদি দোকান
ভাই	: আবু সাইদ
বয়স ও পেশা	: ১৮, ছাত্র (দশম শ্রেণি)

প্রস্তাবনা

১. অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন

শহীদ মোঃ স্বজন

ক্রমিক : ১৬৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৩১

পরিচয়

শহীদ মোঃ স্বজন ১ মে ১৯৯৯ সালে নারায়ণগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বেড়ে ওঠেন নারায়ণগঞ্জেই। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে পদার্পণ করেন তারুণ্যে। অসুস্থ পিতার বড় ছেলের জীবনটা এতটা সহজ ছিল না। পিতার আবাদযোগ্য কোনো কৃষি জমি নেই। ওদিকে অসুস্থ পিতা কোনো কাজও করতে পারেন না। তাইতো যে বয়সে পড়ালেখা করার কথা ছিল- সে বয়সে কাঁধে নিয়েছিলেন সংসারের পুরো দায়িত্ব। তাকে ঘিরে পরিবারের বাকি ৩ সদস্যের প্রত্যাশাও ছিল আকাশছোঁয়া। এটাই ছিল শহীদ স্বজনের অনুপ্রেরণা। তিনি কাজ করতেন দিনমজুরের। ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। দরিদ্র এই পরিবারের ছোট্ট আনন্দ, হাসি-আলোর গল্পগুলো থামিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। শহীদ স্বজন ৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ছাত্র-জনতার প্রাণের দাবিতে নিঃস্বার্থভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

ঘটনার বিবরণ

০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করে। তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকার ছাত্র-জনতাকে প্রতিহত করতে কারফিউ জারি করে। স্বৈরাচারের কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে ছাত্র-জনতা। ৫ই আগস্ট সকাল ১০টায় নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া চত্বরে অন্যান্য ছাত্র-জনতার সাথে শহীদ স্বজনও সমবেত হন। ছাত্র-জনতার এ আন্দোলন ন্যাৎসাত করতে স্বৈরাচারের পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। সকাল ১১টায় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। এমন সময় হঠাৎ একটা গুলি শহীদ স্বজনের বুকের বাম পাশে প্রবেশ করে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে ভর্তি করেন। শহীদ স্বজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ০৬ আগস্ট বিকেল ৫টায় দুনিয়ার মায়া ত্যাগ পরপারে চলে যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ স্বজন
Name: MD SAJAN
পিতা: মোঃ জাকির হোসেন
মাতা: আফিয়া বেগম
Date of Birth: 01 May 1999
ID NO: 5565679650

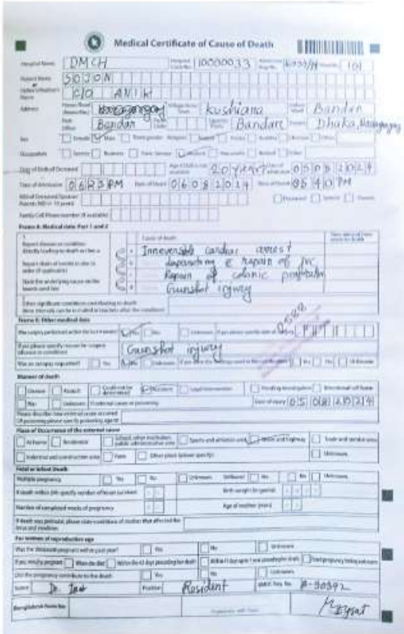
Medical Certificate of Cause of Death

DMCH 10000033
SOJON
C/O ANIK
Kushiara Bandar
Bandar Bandar Dhaka
06 23 PM 06 08 2024 05 40 PM
Irreversible cardiac arrest
Gunshot injury
Gunshot injury
Resident

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: স্বজন
জন্ম তারিখ	: ০১.০৫.১৯৯৯
পেশা	: দিনমজুর
আহত হবার স্থান	: চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ
শহীদ হবার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরণ	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা
আহত হবার সময় ও তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১১টা
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: ৬ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৫:০০টা
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	
গ্রাম	: ৩১৩, কুশিয়ারা, ইউনিয়ন: নবীগঞ্জ বন্দর, থানা: বন্দর, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
পরিবারসংক্রান্ত তথ্য	
পিতা	: মো: জাকির হোসেন
পিতার অবস্থা	: বৃদ্ধ ও অসুস্থ
মাতা	: আফিয়া বেগম
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: পিতা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	
ভাই	: মো: আবুল বাশার
বয়স ও পেশা	: ২২, বেকার

প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

শহীদ মো: মাহফুজ

ক্রমিক : ১৬৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০৩২

পরিচয়

শহীদ মো: মাহফুজ (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২- আগস্ট ২০২৪) জুলাই বিপ্লবের শহীদ। তাঁর পিতার নাম জনাব মো: মজনু প্রাং এবং মাতার নাম মোছা: কাজল। ৫ আগস্ট বিজয় মিছিল চলাকালে আওয়ামী নরপিশাচদের নির্মমতার শিকার হন তিনি। ৫ই আগস্ট ২০২৪ সোমবার স্বৈরাচারী হাসিনা পালানোর আগমুহূর্তে দুপুর ১২ টার একটু আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেন। মিছিল আনসার একাডেমীর সামনে গেলে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পুলিশ ও আনসারের যৌথ বাহিনী ছাত্র জনতার দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে তখন শহীদ মাহফুজ বীর দর্পে সামনে আগাতে থাকে আনুমানিক ৪টার দিকে ঘাতক আনসার সদস্যের গুলিতে মাহফুজ গুলিবিদ্ধ হন। ছাত্র-জনতা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মডার্ন হাসপাতালে নেয়। অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিক ভাবে শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ব্যক্তিগত জীবন

শহীদ মাহফুজ ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সালে বগুড়া জেলার জোড়াগাছা হাটের কুটুর বাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে এসএসসি পরীক্ষার পর তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের হাল ধরতে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। জীবিকার তাগিদে গাজীপুর শহরে আসেন এবং দীর্ঘদিন কাজ করেন। সর্বশেষ মৃত্যুর আগে তিনি ইন্টারস্টফ এ্যাপারেলস লিমিটেড এ সুইং ইনপুটম্যান হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। শহীদ মাহফুজ মৃত্যু কালে স্ত্রী, ১ কন্যা এবং বৃদ্ধা মা রেখে যান। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। অর্থনেতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শেষ সম্বল বলতে পাঁচ শতাংশ জমি আছে এবং একটি ঘর আছে।

পারিবারিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মাহফুজ মৃত্যু কালে স্ত্রী, ১ কন্যা এবং বৃদ্ধা মা রেখে যান। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। অর্থনেতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শেষ সম্বল বলতে পাঁচ শতাংশ জমি আছে এবং একটি ঘর আছে। তাঁর পিতা কৃষি কাজ করেন। নিজস্ব জমিজমা না থাকায় অন্যের জমিতে কাজ করেন। ছেলে চাকরি করে যে টাকা পাঠাত তা দিয়েই সংসার চলত। ছেলের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে চরম সংকট তৈরি হয়েছে।

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অবৈধ সরকার শেখ হাসিনা জনগণের ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করে। গুম-খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অন্যায়, জুলুম, অবিচার, অত্যাচার, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, অর্থ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। তাদের অন্যায় অত্যাচারের মাত্রা পূর্বাপর সকল স্বৈরশাসককে ছাড়িয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ জনগণের মনে দানা বেঁধে উঠে। দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ আন্দোলনে রুপ লাভ করে। দলীয় পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে জনগনের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পুলিশের পৈশাচিকতা ৭১'র পাক হানাদার বাহিনীকেও ছাপিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলন রুপ নেয় স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে সরকার মারমুখি নীতি অবলম্বন করে।

"মুক্তিযুদ্ধের নাতি-পুতিরা মেধাবী না? যত সব রাজাকারের বাচ্চারা মেধাবী"

১৫ জুলাই রাতে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। তিনি বলেন,-"মুক্তিযুদ্ধের নাতি-পুতিরা মেধাবী না? যত সব রাজাকারের বাচ্চারাই মেধাবী" মুহূর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে, "তুমি কে আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার।" মুহূর্তেই ৭১'র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা মধ্য রাতে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা সহ

সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গোণ্ডা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। ১৬ জুলাই ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গোণ্ডা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা টোকাইদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনদেরও রক্ষা মিলেনা। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটাতে থাকে। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ আন্দোলনকে শক্তি আরও বৃদ্ধি করে। অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার মত। এরপর থেকে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯ জুলাই বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঘাতক পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা, ফাঁকা গুলি, গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সেদিন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ সাজোয়া যান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। শুধু তাই নয় স্বৈরাচারের হেলিকপ্টার ও উচু ভবনের উপর থেকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনার সংবাদ যেন বহির্বিশ্বে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য সরকার ১৯ জুলাই রাত ১০ টায় সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। দলীয় কর্মীদের দ্বারা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর করে আন্দোলকারীদের উপর দায় চাপানোর নোংরা রাজনীতি শুরু করে।

ডিবি অফিসে নিয়ে অত্যাচার

ডিবি অফিস ছিল টর্চার সেল। আর এই টর্চার সেলের গড ফাদার ছিল ডিবি হারুন। আওয়ামী সরকারের মদদ পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে ডিবি হারুন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল একএক করে তুলে এনে হাজির করা হয় ডিবি হারুনের টর্চার সেলে। সেখানে তাদেরকে অকথ্য নির্যাতন করা হত। নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, তা সহ্য করতে না পেরে সেন্সলেস হয়ে যায় অনেকে। সেন্স ফিরে আসলে তাদেরকে আবার নির্যাতন করা হত। অস্ত্র ঠেকিয়ে জীবন কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পানিতে মরিচের গুড়া মিশিয়ে তারপর পান করতে দেওয়া হত। অন্ড কোষে পা দিয়ে লাথি মারত। উপর দিক করে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে পেটানো হত। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাত এবং পা ভেঙ্গে দেওয়া হত। শুধু তাই নয় ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হত। এসবের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাপ প্রয়োগ করত।

মাহফুজের শহীদ হওয়ার ঘটনা

৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার স্বৈরাচারী হাসিনা পালানোর আগমুহূর্তে ১২ টার একটু আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেন। মিছিল সফিপুর আনসার একাডেমীর সামনে গেলে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পুলিশ ও আনসারের যৌথ বাহিনী ছাত্র জনতাকে টার্গেট করে গুলি ছুড়তে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে, তখন শহীদ মাহফুজ বীর দর্পে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে একের পর এক সাধারণ মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকে আহত মানুষ গুলো। একটু পানি দেওয়ার মত কোন মানুষ সেদিন সেখানে ছিল না। চারদিকে মরা লাশ। বীর দর্পে দাড়িয়ে আছে শহীদ মাহফুজ। এত মৃত মানুষ দেখে সেদিন নিজের জীবনকে অতি তুচ্ছ মনে হয় তাঁর কাছে। জীবনের মায়া সেদিন মাহফুজকে পালিয়ে যেতে দেয়নি। আনুমানিক ৪টার দিকে এক ঘাতক আনসার সদস্যের গুলিতে মাহফুজ গুলিবিদ্ধ হন। মাহফুজের নিথর দেহ সেদিন রাস্তার উপরেই পরে ছিল দীর্ঘক্ষণ। ছাত্র-জনতা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মডার্ন হাসপাতালে নেয়। অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিক ভাবে শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। একজন নিরপরাধ মানুষের জীবন এভাবেই কেড়ে নেয় শকুনের দল।

দাফন

শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজে লাশ সংগ্রহ করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই জানাজা এবং দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ মাহফুজের প্রতিবেশী মোঃ সুমন মিয়া বলেন, আমরা একসাথে চাকরি করতাম। আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। তিনি খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। সহীহভাবে কোরান শিক্ষা নিয়েছেন এবং কোরান খতম করেছেন কয়েকবার।

একনজরে শহীদ মো: মাহফুজ

নাম	: শহীদ মো: মাহফুজ
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
জন্ম তারিখ	: ০৬-০২-১৯৯২
বয়স:	৩১ বছর
পিতা	: মো: মজনু প্রাং
মাতা	: মোসা: কাজল
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: লালমনিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে একটি বাড়িতে আগুনে দগ্ধ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কুটুরবাড়ি, ইউনিয়ন: জোড়গাছাহাট, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা নং-১৪৭, ছাভারগেট রফিক বাজার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

শহীদ সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে।

“বাবা ডাকটি আর কখনো ডাকতে পারবো না।”

শহীদ মোশারফ

ক্রমিক : ১৬৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০৩৩

পরিচয়

মো: মোশারফ (আগস্ট ১৯৮৭ - আগস্ট ২০২৪) জুলাই বিপ্লবের অন্যতম একজন শহীদ। তাঁর পিতার নাম জনাব আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার এবং মাতার নাম মোছা: রাজিয়া বেগম। আওয়ামী নরপিশাচদের নির্মমতার শিকার হন শহীদ মোশারফ।

ব্যক্তিগত ও কর্মজীবন

শহীদ মোশারফ ১৮ আগস্ট ১৯৮৭ সালে মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলার মৃধা কান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাতা দুজনেই গ্রামের বাড়িতে থাকেন। ব্যবসায়িক সূত্রে তিনি পরিবার নিয়ে গাজীপুরের বোর্ডবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। শহীদ মোশারফ একজন ব্যবসায়ী। গাজীপুরের বোর্ডবাজারে তাঁর মেশিনারীজ এর ব্যবসা ছিল।

পারিবারিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মোশারফ একজন ব্যবসায়ী। তিনি মূলত মেশিনারীজ এর ব্যবসা করতেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম এম আর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। দেশের নাজুক পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়ে ধ্বস নামে। বেচাকেনা ঠিকমত না হওয়ায় অনেক লোকসান গুনতে হয় তাকে। ব্যবসা ধরে রাখার জন্য অনেক টাকা ঋণ করতে হয় তাঁকে। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয় না। বর্তমানে তার ব্যবসা প্রায় বন্ধের উপক্রম। তার বর্তমান ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩ লাখ টাকা। তার মৃত্যুর পর পরিবারে এক শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে জিসান ইসলাম ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে। ছোট ছেলে মোঃ মুবিন ইসলাম এর বয়স ৬ বছর আর মেয়ে রাইসা ইসলাম এর বয়স ২ বছর। বাবার মৃত্যুতে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাদের দায়িত্ব নেওয়ার মত কেউ নেই।

জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উদ্দীন আহমেদের পাতানো নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনা। ভারতের মধ্যস্থতায় শেখ হাসিনা এই নিশ্চয়তা দেয় যে, মইন উদ্দীন আহমেদ ও তার দোসরদের দুই বছরের সকল অপরাধের দায়মুক্তি দেওয়া হবে। হলোও তাই। ২০০৭-২০০৮ এই দুই বছরের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা অনেক বিষোদগার করলেও কুশীলবদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ভারতের মধ্যস্থতায় বিনা ভোটে ক্ষমতায় এসে সাধারণ মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। পিলখানার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সেনাবাহিনীকে পোষা বিড়ালে পরিণত করা হয়েছে। হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের মাথার ওপর চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মতো। এ যেন রূপকথার ভয়ংকর ডাইনি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় জনতা।

জুলাইয়ের শুরু থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। প্রতিদিনই ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুলোতে অবস্থান করে। ১৫ জুলাই সাধারণ ছাত্ররা নায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শাহাবাগ ও ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনকে

প্রতিরোধ করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গুন্ডা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গোণ্ডা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা গোণ্ডাদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনদেরও রক্ষা মিলেনা। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটাতে থাকে। রাতে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। মুহূর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে, "তুমি কে আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার।" মুহূর্তেই ৭১'র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা মধ্য রাতে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। হুমকি, গুম-খুন, হত্যা, গ্রেফতার, জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলন দমনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শহীদ নুর হোসেন ছিলেন এই আন্দোলনের একজন সম্মুখ যোদ্ধা। বৈষম্যবিরোধী স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৫ আগস্ট সোমবার ছাত্র-জনতা লং মার্চ টু গণভবন ঘেরাও ঘোষণা করে। সারাদেশ থেকে মুক্তিকামী জনতা গণভবনের দিকে রওনা করে। স্বৈরাচারের ঘাতক-দালাল আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বিপথগামী পুলিশ সদস্যরা একত্রিতভাবে ছাত্র-জনতার উপর টিয়ারশেল, ছোররা, গ্রেনেড, বোমা, সাজোয়াজান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতে থাকে। অসংখ্য মানুষ হামলায় আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে আরও অনেকে। তবু ছাত্র-জনতা জুলুমের সাথে আপোষ করেননা। জালিমের বুলেটকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

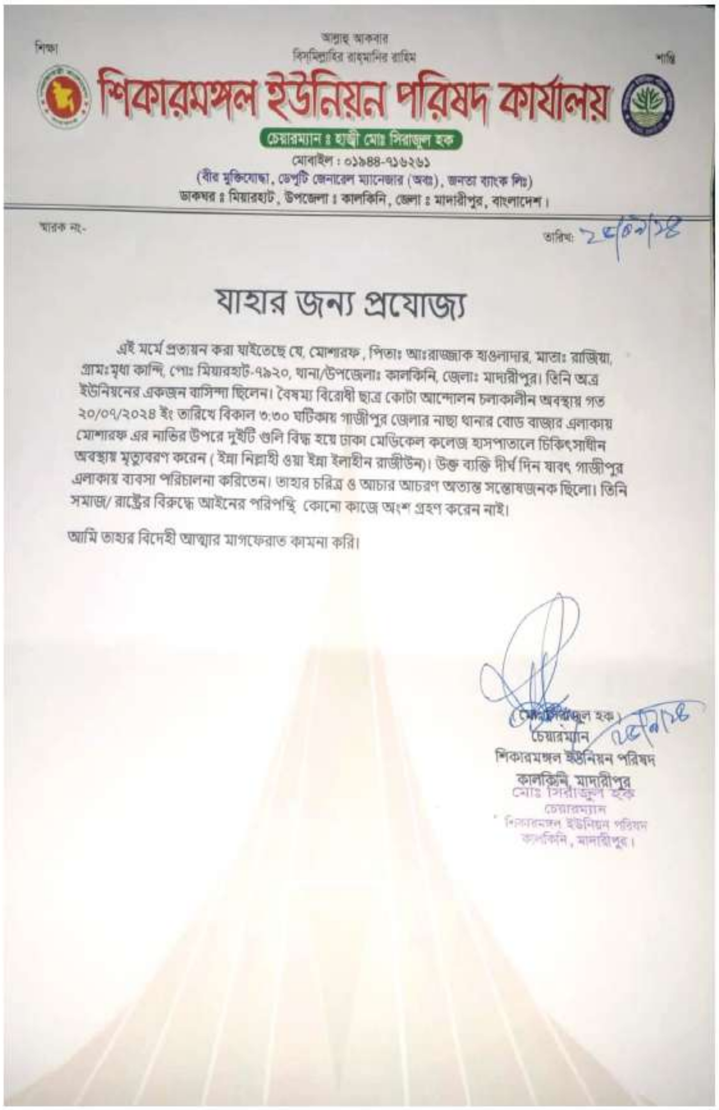

শিক্ষা

আল্লাহু আকবার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শান্তি

শিকারমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

চেয়ারম্যান : হাজী মোঃ সিরাজুল হক

মোবাইল : ০১৯৪৪-৭১৬২৬১

(বীর মুক্তিযোদ্ধা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অবঃ), জনতা ব্যাংক লিঃ)

ডাকঘর : মিয়ারহাট, উপজেলা : কালকিনি, জেলা : মাদারীপুর, বাংলাদেশ।

স্মারক নং-

তারিখ: ২৫/০৯/২৪

যাহার জন্য প্রযোজ্য

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোশারফ, পিতাঃ আঃরাজ্জাক হাওলাদার, মাতাঃ রাজিয়া, গ্রামঃমৃধা কান্দি, পোঃ মিয়ারহাট-৭৯২০, থানা/উপজেলাঃ কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর। তিনি অত্র ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা ছিলেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র কোটা আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় গত ২০/০৭/২০২৪ ইং তারিখে বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় গাজীপুর জেলার নাছা থানার বোড বাজার এলাকায় মোশারফ এর নাভির উপরে দুইটি গুলি বিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহীন রাজীউন)। উক্ত ব্যক্তি দীর্ঘ দিন যাবৎ গাজীপুর এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। তাহার চরিত্র ও আচার আচরণ অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো। তিনি সমাজ/ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনের পরিপন্থি কোনো কাজে অংশ গ্রহণ করেন নাই।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

(মোঃ সিরাজুল হক)
চেয়ারম্যান
শিকারমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ
কালকিনি, মাদারীপুর

মোঃ সিরাজুল হক
চেয়ারম্যান
শিকারমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ
কালকিনি, মাদারীপুর।

১৯ জুলাই বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঘাতক পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা, ফাঁকা গুলি, গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সেদিন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ সাজোয়া যান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। শুধু তাই নয় স্বৈরাচারের হেলিকপ্টার ও উচু ভবনের উপর থেকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনার সংবাদ যেন বহির্বিশ্বে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য সরকার ১৯ জুলাই রাত ১০ টায় সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। দলীয় কর্মীদের দ্বারা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর করে আন্দোলকারীদের উপর দায় চাপানোর নোংরা রাজনীতি শুরু করে।

পুলিশের গুলিতে অনেক মানুষ মারা যায়। এসব মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে পীড়া দেয়। যার ফলে মানুষ আর ঘরে থাকতে পারে না। শহীদের আর্তনাদ তাদেরকে রাজপথে নিয়ে আসে।

শহীদ মাহফুজের শহীদ হওয়ার ঘটনা

এমন একজন বীর শহীদ মোশারফ। ২০ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার তিনি দুপুরে ভাত খেয়ে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় বোর্ডবাজার বেস্ট বাই শোরুমে পৌছালে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পেটুয়া পুলিশ ও বিজিবির যৌথ বাহিনী মোশারফকে লক্ষ্য করে অনবরত গুলি ছোড়ে। পেট ও বুকে গুল বিদ্ধ হলে তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। তার আশে পাশের মানুষ তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে হসপিটালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের বেডে কাতরাতে কাতরাতে রাত বারোটার সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

দাফন

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে লাশ সংগ্রহ করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই জানাজা এবং দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়।

একনজরে শহীদ মোশারফ

নাম	: শহীদ মোশারফ
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ	: ১৮-০৮-১৯৮৭
বয়স	: ৩৭ বছর
পিতা	: আ: রাজ্জাক হাওলাদার
মাতা	: মোছা: রাজিয়া বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার
শাহাদাতের স্থান	: বোর্ড বাজার, বেস্ট বাই শোরুম এর সামনে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মৃধা কান্দি, থানা: কালকিনী, জেলা: মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: হোল্ডিং নং ২০১৪, পূর্ব কলমেশ্বর (বোর্ড বাজার), গাজীপুর

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদ সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ মোশারফের প্রতিবেশী মোসা: আছমা হক বলেন, আমরা ১২ বছর একসাথে পাশাপাশি বাড়িতে থাকছি। মোশারফ অনেক ভালো মানুষ ছিল। অনেক ধৈর্য্যশীল ও ভদ্র ছিল।

শহীদ মোঃ তুহিন

ক্রমিক : ১৬৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৩৪

পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ তুহিন ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার গাছা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ পিতা বাবুল শেখ একজন অটো রিক্সা চালক। মাতা মোছা: তাসলিমা গার্মেন্টসে চাকরি করেন। ২০২৪ সালের ২০ জুলাই, জালিমের বুলেটের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

পেশা ও পারিবারিক অবস্থা

তুহিন গাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তুহিন পড়ালেখার পাশাপাশি অটো চালাতেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তার দুই ভাই ও এক বোন আছে। তাদের নিজস্ব কোন জায়গা জমি নেই। ভাড়া বাসায় থাকার সামর্থ না থাকায় তারা সরকারি জমিতে টিনের তৈরি ঘরে বসবাস করেন। তাঁর ছোট ভাই হাসান ৭ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। বড় ভাই তুষার সৌদি প্রবাসী। বড় বোন সুমি আক্তার অবিবাহিত। পরিবার ঋণগ্রস্ত। পরিশোধের সামর্থ নেই।

শহিদের বিবরনী

দেশের সকল আন্দোলন সংগ্রামের অংশীদার রিক্সা চালক, ভ্যান, চালক সাধারণ পেশাদার মানুষ। রাজপথে থেকে সকল আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করেছে তারা। নায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনে তাদের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাদেরি একজন ছিলেন শহীদ তুহিন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে, ২০ জুলাই ২০২৪ সালের শনিবার শহীদ মোহাম্মদ তুহিন ঢাকা ময়মনসিংহ গাছা রোডের মাথায় বোর্ড বাজার নামক স্থানে যাত্রী পরিবহনের জন্য অটোরিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পুলিশ ও বিজিবি রাস্তার মোড়ে মোড়ে অবস্থিত মানুষের ভিড়ের দিকে লক্ষ করে গুলি ছুড়তে থাকে। এই সময় ঘাতক পুলিশ সন্ত্রাসী বিজিবির এলোপাথাড়ি একটি গুলি তুহিনের গলায় বিদ্ধ হয়। অটো থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তুহিন। মুহূর্তেই গলার নলি ছিদ্র হয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় জনতা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষনে জীবন বায়ু শেষ হয়ে যায় এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আনুমানিক বিকাল পাঁচটায় তার মৃত্যু হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অনুভূতি

সোহাগ মিয়া (২৭), (চাচাতো ভাই) বলেন, তুহিন পড়াশুনার পশাপাশি অটোরিক্সা চালাতো। সে অনেক ভালো ছেলে ছিলো। আমরা তার হত্যাকারীর সঠিক বিচার চাই। তুহিন এলাকায় নম্র ও ভদ্র হিসেবে পরিচিত ছিলো। তার মৃত্যুতে পুরা এলাকার লোকজন শোকাহত হয়। এলাকাবাসী তার হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন।

দাফন

শহীদ তুহিনের নিজ এলাকাতেই তাঁর দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়। আওয়ামী সরকারের ১৬ বছরের শাসনামলে তুহিনের মত এমন আরও হাজারও মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। গুম হতে হয়েছে কত শত নিরঅপরাধ মানুষকে। আওয়ামী দুঃশাসনের কয়েকটি খন্ড চিত্র তুলে ধরা হল

বিচার বহির্ভূত হত্যা ও ক্রসফায়ার

বিগত দিনগুলোতে ক্রসফায়ারের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে যদি বলা হয় গত ১৬ বছর ছিল বিচার বহির্ভূত হত্যার বছর তাহলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। কারণ গত ১৬ বছরে র‍্যাব-পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহত হন প্রায় ৪ হাজার জন। এটা একটি সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিশাল হুমকি।

বাংলাদেশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব নামক 'এলিট ফোর্স'-এর গঠন করা হয়। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রসফায়ার, অপহরণ বা গুমের অভিযোগ ওঠায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তারা। আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই ফোর্সের উপর। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ড। এটি একমাত্র হত্যাকাণ্ড যার বিচার করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। আর কোনো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বিচার তো দূরের কথা মামলাই নেওয়া হয়নি। মেজর সিনহা সেনাবাহিনীর পদস্থ সাবেক কর্মকর্তা হওয়ায় এর বিচার হয়েছে। ক্রসফায়ার কিং খ্যাত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ছিলেন

একজন মাস্টারমাইন্ড কিলার। সে ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারে ১৬১ জন মানুষকে হত্যা করেছে। মেজর সিনহা হত্যা মামলায় তার ফাঁসীর আদেশ হয়েছে। ২০২০ সালের ৩১ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায় কক্সবাজারের টেকনাফে মেরিন ড্রাইভ সড়কের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ নিহত হন।

আওয়ামী সরকার ক্রসফায়ার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করছে রাজনৈতিক বিরোধীদের উপরে। নিহতদের মধ্যে মধ্যে অধিকাংশই রাজনৈতিক কর্মী। রাজনৈতিক নেতারা সরকার কর্তৃক গুম ও খুনের শিকার হন। বিরোধী দলের লোক খুন করার নির্দেশ সরাসরি সরকার দিয়ে থাকে বলে সে ঘটনার বিচার তো দুরূহ মামলাই নেয়া হয় না।

গুম করে আয়না ঘরে বন্দী

বাংলাদেশে নাগরিকদের গুম করে ফেলার এক নিষ্ঠুর সংস্কৃতি চালু হয়েছে গত ১৬ বছরে। গুমের এই বিভীষিকা বাংলাদেশকে নিয়ে যায় আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে। গত ১৬ বছরে প্রায় হাজার খানেক জন মানুষ বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এদের অধিকাংশের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। স্বৈরাচার পতনের পর এদের অনেকের সন্ধান মেলে আয়না ঘর থেকে।

ইসলামী বক্তা আবু ত্বহা মোহাম্মদ আদনান তাঁর তিন সঙ্গীসহ নিখোঁজ হয়েছিলেন গত ১০ জুন ২০২১। আবু ত্বহার মতো রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ বা অপহরণের পর গত ১৬ বছরে পরিবারের কাছে ফিরে এসেছেন অনেকেই। অপহৃত ব্যক্তিদের একটি বড় অংশকে অপহরণের পর উদ্ভ্রান্ত' অবস্থায় কোনো সড়কে পাওয়া যায়। কিন্তু ফিরে আসার পর অনেকে কোনো কথা মনে করতে পারেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি কাউকে গ্রেফতার করে তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আদালতে উপস্থাপন করার কথা। অথচ গত দশ বছরে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের বেশিরভাগকেই তিন-চারদিন গুম করে রেখে তারপর আদালতে হাজির করা হয়েছে। এই সংখ্যা লক্ষাধিক। আর যেসব ব্যক্তি গুম হয়েছেন বা ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছেন তাদের কথাতো বাদই। অ্যানালাইসিস বিডির জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করে এদেশে রাজনৈতিক গুমের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) জড়িত। তাদের মর্জি মতো এদেশের বিরোধীদলীয় রাজনৈতিকদের গুম, ক্রসফায়ার ও গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১৬ সালে গুম হওয়া ৯৭টি ঘটনার মধ্যে জামায়াত নেতা গোলাম আযম ও মীর কাসেম আলী এবং বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে যথাক্রমে আমান আজমী, মীর আহমেদ বিন কাসেম ও হুম্মাম কাদের চৌধুরীর কথা বেশ আলোচিত। হাসিনার পতনের পর সাবেক সেনা সদস্য আবদুল্লাহিল আমান আযমী ৯ বছর পর আয়না ঘর থেকে মুক্তি পান।

গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরা হয়

গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। সরকারের কীর্তি কলাপ জনগনের সামনে তুলে ধরায় । ২০১৩ সালে, দৈনিক আমার দেশ, দিগন্ত টিভি, চ্যানেল ওয়ান, সিএসবি, ইসলামিক টিভির পর একসঙ্গে ৩৫টি অনলাইন পোর্টাল বন্ধ করে দেয়। সত্য প্রকাশে জেল খাটতে হয় অনেক সাংবাদিককে। সাংবাদিকদের মারধর, হুমকি, হত্যা এসব ছিল কমন ঘটনা। দীর্ঘ ১৫ বছরেও সাংবাদিক সাগর-রুনি দম্পত্তি হত্যার বিচার হয়নি।

ডিবি হেফাজতে নিয়ে অত্যাচার

ডিবি অফিস ছিল টর্চার সেল। আর এই টর্চার সেলের গড ফাদার ছিল ডিবি হারুন। আওয়ামী সরকারের মদদ পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে ডিবি হারুন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল একএক করে তুলে এনে হাজির করা হয় ডিবি হারুনের টর্চার সেলে। সেখানে তাদেরকে অকথ্য নির্যাতন করা হত। নির্যাতনের মাত্রা এতটাই

ভয়াবহ ছিল যে, তা সহ্য করতে না পেরে সেন্সলেস হয়ে যায় অনেকে। সেন্স ফিরে আসলে তাদেরকে আবার নির্যাতন করা হত। অস্ত্র ঠেকিয়ে জীবন কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পানিতে মরিচের গুড়া মিশিয়ে তারপর পান করতে দেওয়া হত। অন্ড কোষে পা দিয়ে লাথি মারত। উপর দিক করে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে পেটানো হত। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হাত এবং পা ভেঙ্গে দেওয়া হত। শুধু তাই নয় ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হত। এসবের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাপ প্রয়োগ করত।

শিবির ট্যাগ দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন

আওয়ামী সরকারের আমলে শিবির ট্যাগ দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন করা ছিল একটি কমন ঘটনা। ক্যাম্পাসগুলোতে সরকারের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ বেপরোয়া হয়ে উঠে। ছাত্র রাজনীতি শব্দটাকেই তারা ঘৃণার বস্তুতে পরিণত করে। হলগুলোতে ছাত্রলীগ মাদকের অভয়ারণ্য বানিয়ে ফেলে। সীট বাণিজ্য, হলে খেয়ে টাকা না দেওয়া, টাকা চাইতে আসলে মারধর করা ছিল তাদের কাছে দুধ ভাত। কাউকে নামাজ পড়তে দেখলে শিবির সন্দেহে টর্চার সেলে নিয়ে টর্চার করত। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ দেশকে নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ায় ছাত্রলীগের রোষানলে পড়ে। শিবির ট্যাগ দিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ছাত্রলীগের টর্চারে সেলে। সেখানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে অসহায় আবরারের উপর। রাতভর নির্যানের পর সকালে তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। ছাত্রলীগের রোষানলের শিকার হয়েছিলেন বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্র শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বুয়েটের মেধাবী পরিকল্পনাবিদ ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম। ছাত্রলীগ তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে শরীরের হাত পা ভেঙে দেয়। এরকম হাজারও অপরাধের সাথে জড়িত ছিল স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা ও তার দোসররা।

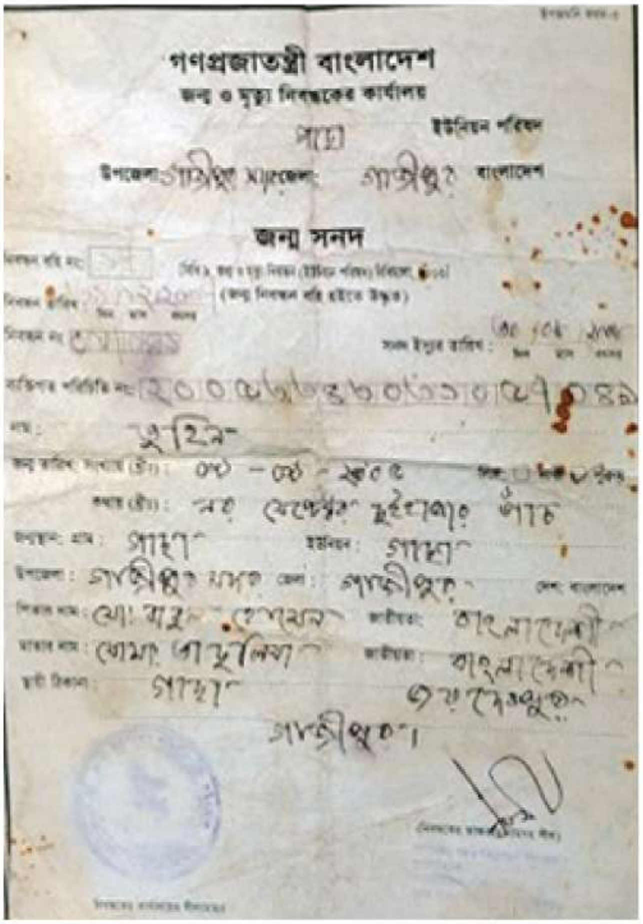
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম সনদ

একনজরে শহীদ তুহিন

নাম	: শহীদ মো: তুহিন
পেশা	: পড়াশোনার পাশাপাশি অটো রিকশা চালাতেন
জন্ম তারিখ	: ০৯-০৯-২০০৫
বয়স	: ১৮ বছর
পিতা	: জনাব মো: বাবুল হোসেন
মাতা	: মোছা: তাসলিমা
আহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা ময়মনসিংহ গাছা রোডের মাথায় বোর্ড বাজার নামক স্থানে
শাহাদাতের তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার
শাহাদাতের স্থান	: উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে।
স্থায়ী ঠিকানা	: গাছা ইউনিয়ন, গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদ সহোদরের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

“ঘরে খাবার জোটাতে কাজে গিয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন”

শহীদ মোহাম্মদ নুরু

ক্রমিক : ১৬৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০৩৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ নুরু ১ জানুয়ারি ১৯৮০ সালে শরীয়তপুর জেলার ডামুড্ডা উপজেলার কুলকারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলী উল্লাহ এবং তার মাতার নাম আছিয়া খাতুন। তরুণ বয়সেই মোহাম্মদ নুরুর পিতা মারা যান। বাবার মৃত্যুতে পরিবারে দুঃখ নেমে আসে। জীবিকা নির্বাহের জন্য অল্প বয়সে ঢাকা শহরে পাড়ি জমান শহীদ নুরু। কাপড়ের দোকানে কাজ করে নিজের এবং পরিবারের খরচ নির্বাহ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ভ্যান গাড়িতে নিজেই কাপড় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। স্ত্রী জহুরা গার্মেন্টসে চাকরি করেন। জীবনমানের উন্নতি করতে বছরখানেক আগে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল বিদেশ যাওয়ার জন্য। স্ত্রী জোহরা এবং ২২ বছরের ছেলে মোঃ ইমনকে নিয়ে ভালোই কাটছিল তার জীবন। হঠাৎ কোটা আন্দোলন শুরু হলে শহীদ হন মোহাম্মদ নুরু। দুবেলা দু মুঠো খাবার জোটাতেই যাদের পায়ের জুতা ক্ষয় হয়ে যায় তাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করাটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। দেশের পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে যে তাদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আন্দোলনের কারনে তার বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দিন শেষে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। দুবেলা খাবার ও জোটে না ঠিক মত। এদিকে আন্দোলনে পুলিশ নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকে। তবুও পেটের দায়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে রাস্তায় বের হতে হয় নুরুকে। রাস্তায় এসেই আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন শহীদ নুরু। গুলি বিদ্ধ হয়ে জীবন হারাতে হয় নুরুকে। এ যেন জীবন বাঁচাতে এসে জীবন বিসর্জন।

পারিবারিক অবস্থা

ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়ে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েন শহীদ নুরু মিয়া। বাবার কোন অর্থ সম্পদ না থাকায় জীবন চালানো কোনভাবেই পিছু ছাড়ছিল না। তাইতো বেকার ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে

কষ্টকর হয়ে যায়। জীবিকার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। পরিবার নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় উঠেন। তাঁর স্ত্রী গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। আর তিনি একটি কাপড়ের দোকানে কর্মী হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন পর নিজেই একটি ভ্যান গাড়ী নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন্। কিন্তু সংসারের অভাব অনটন আসে। পাওনাদাররা এসে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এই মুহূর্তে তাদের ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ নেই। নুরু মিয়ার ছেলে এখনো বেকার। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আপাতত তাঁর স্ত্রী বহন করছেন। তাঁর মাসিক বেতন মাত্র আট হাজার টাকা। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তার পরিবার খুব কষ্টসাধ্য জীবন যাপন করছে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

১৯ জুলাই ঢাকার সবগুলো পয়েন্টে ছাত্রদের সাথে পুলিশ বিজিবি ও র‍্যাবের সদস্যদের সংঘাত চলে। আন্দোলনরত নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে। ঘাতক পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা, ফাঁকা গুলি, গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সেদিন রাজধানীর উত্তরা এলাকা রণক্ষেত্রে ভ্যান রেখেই দৌড় দেন শহীদ নুরু। দৌড়ে পুলিশের সামনে পড়ে যান তিনি। আওয়ামী সরকারের পোষ মানানো পেটোয়া পুলিশ বাহিনী মো: নুরুকে সামনাসামনি গুলি করে। মাথায় গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এক চিৎকারে ঘটনাস্থলেই পড়ে যান তিনি। সন্ত্রাসী পুলিশ নিথর দেহের উপরে আরো তিনটি গুলি চালায়। পরবর্তীতে তার মৃতদেহ উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে তিনি আর বেঁচে নেই।

পরিণত হয়। পুলিশ সাজোয়া যান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। শুধু তাই নয় স্বৈরাচারের হেলিকপ্টার ও উঁচু ভবনের উপর থেকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও উত্তরার হাউজ বিল্ডিং এলাকায় নর্থ টাওয়ারের পেছনে যখন কাপড় বিক্রি করছিল শহীদ মোহাম্মদ নুরু। ঠিক সে সময়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ধাঁওয়ার শিকার হন শহীদ নুরু। আশেপাশের সকলের দৌড়াদৌড়িতে মোহাম্মদ নূরুও ভয় পেয়ে যান। কাপড়ের

দাফন-কাফন

শহীদ মোহাম্মদ নুরুর জানাজার নামাজ গাজীপুরের কুনিয়া এলাকায় ২০ তারিখ সকাল আটটায় অনুষ্ঠিত হয়।

একনজরে শহীদ মোঃ নুরু

নাম	: শহীদ মোহাম্মদ নুরু
পেশা	: কাপড় বিক্রেতা
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-১৯৮০
বয়স	: ৪৪ বছর
পিতা	: মৃত আলী উল্লাহ
মাতা	: মোসাঃ আছিয়া খাতুন
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: হাউজ বিল্ডিং নর্থ টাওয়ার সংলগ্ন, উত্তরা, ঢাকা।
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কুলকুরি, ইউনিয়ন: ৫ নং ওয়ার্ড, থানা: ডামুড্ডা সদর জেলা: শরিয়তপুর
বর্তমান ঠিকানা	: কুনিয়া, গাছা, গাজীপুর

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদ সন্তানের কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে
৩. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা

"কী অপরাধ ছিল আমার ছেলের?" প্রশ্ন অসহায় মায়ের

শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ

ক্রমিক : ১৬৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০৩৬

পরিচিতি

শহীদ রাহাত হোসেন শরীফ নবাব হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার গোপারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ পিতা মো: সেলিম সৌদি আরবে থাকেন। মা স্বপ্না গার্মেন্টসে চাকরি করেন। রাহাত হোসেন শহীদ পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিল। ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই উত্তরার আজমপুরে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র ৪ দিনের মাথায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন

শহীদ রাহাত হোসেন ছিলেন একজন সচেতন তরুণ। তিনি ছিলেন সুদুর প্রসারি চিন্তার অধিকারী। সবসময় সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দূষণ মুক্ত দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তিনি “বিডি ক্লিনে” স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দেন। ২০২৩ সালের শুরুর দিক থেকে কাজ শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি এলাকার বিভিন্ন সমাজসেবামুলক কাজে অবদান রাখেন। তাঁর নম্রতা, ভদ্রতা ও অমায়িক ব্যবহার দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। শহীদ রাহাত হোসেন ছিলেন একজন নিয়মিত পাঠক। নিয়মিত তাঁর পাঠাগারে যাতায়াত ছিল। তাঁর পছন্দের তালিকায় ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলো বেশি স্থান পেয়েছে।

পারিবারিক অবস্থা

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল শহীদ রাহাত। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন। শহীদ রাহাতের বাবা বিদেশ থাকায় ভরণ পোষণে তেমন সমস্যা হতো না। তাদের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই।

আন্দোলনে অংশগ্রহণ

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫

আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় জনতা।

জুলাই মাস জুরেই প্রতিবাদ মিছিল, আন্দোলন সংগ্রাম চলতে থাকে। ছাত্র সমাজের যৌক্তিক দাবীকে মেনে না নিয়ে বরং দমনের পথ বেছে নেওয়া হয়। আন্দোলন ক্রমান্বয়ে সহিংস রুপ ধারণ করতে থাকে। কোটা আন্দোলনকারীদের দমনে চরম ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। আন্দোলনকারীদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রলীগের গুণ্ডাদেরকে। ১৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় ছাত্রলীগ। একদিকে নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থী আর অন্য দিকে ছাত্রলীগের হাতে ছিল লাঠি, হকিস্টিক, লোহার রড, রামদা, চাপাতি সহ দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগসহ ঢাকার বিভিন্ন ইউনিটের ছাত্রলীগ কর্মীরা। ছাত্রলীগ একত্রিত হয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। রক্তাক্ত করে সাধারণদের। তাদের আক্রমণ থেকে

রক্ষা পায়নি নিরীহ বোনরাও। ছাত্রীদের মেরে রক্তাক্ত করা হয়। এমন নির্মম ঘটনা ইতিহাসে বিরল। আহত হয়ে নিরীহ শিক্ষার্থীরা রাস্তায় পড়ে থাকে। পুলিশ প্রশাসন ছাত্রলীগের পক্ষ নিয়ে সাধারণদের উপর আক্রমণ করে। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় সাধারণ ছাত্রদের। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে ছাত্রলীগ সেখানে গিয়েও বেড়ে শুয়ে

থাকা আহত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। ভয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতাল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় অনেকে।

১৫ তারিখের পর থেকেই মুলত আন্দোলন চূড়ান্ত রুপ লাভ করে। কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু হলেও তখন আর কোটা আন্দোলন থাকে না। সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। সরকার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠে। সারা দেশে গণহত্যা চালায়। গণ গ্রেফতার, গুম, প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা চালিয়ে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করা হয়। ১৬ তারিখ দিনভর গণ গ্রেফতার ও গণহত্যা চালানো হয়। এসবের মাধ্যমে আন্দোলন থেমে যায় না বরং আরও বেড়ে যায়। আগুন জ্বলে উঠে। সেদিন রাতে ছাত্র জনতা ঢাবির হল থেকে ছাত্রলীগের গুন্ডাদেরকে হল থেকে বের করে দেয়। এরপর সরকার আরও ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। ক্যাম্পাস গুলোতে নোটিশের মাধ্যমে রাতারাতি হল ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। ঢাবি, জবি, জাবি সহ সারা দেশের ক্যাম্পাস গুলোতে একই ঘটনা ঘটায়। এরপর থেকে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে।

রাহাতের শহীদ হওয়ার ঘটনা

জুলাই বিপ্লবে ছাত্রদের ভুমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ মাদরাসা প্রাইভেট পাবলিক সবধরনের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয়। একজন ছাত্র হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করা একান্ত কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে রাজপথে সরব ছিল শহীদ রাহাতও। ১৮ জুলাই ঢাকার সবগুলো পয়েন্টে ছাত্রদের সাথে পুলিশ বিজিবি ও র‍্যাবের সদস্যদের সংঘাত চলে। আন্দোলনরত নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে। ঘাতক পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতাকে টার্গেট করে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা, ফাঁকা গুলি, গ্রেনেড, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সেদিন রাজধানীর উত্তরা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ সাজোয়া যান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেয়। শুধু তাই নয় স্বৈরাচারের হেলিকপ্টার ও উচু ভবনের উপর থেকে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এসময় রাহাত

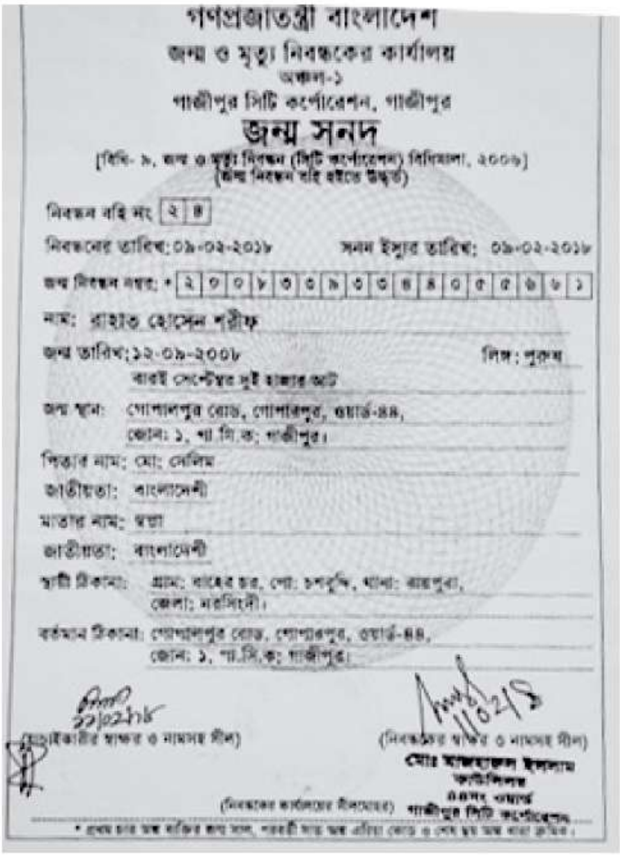

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
অঞ্চল-১
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ২ ৪

নিবন্ধনের তারিখ: ০৯-০২-২০১৮ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০৯-০২-২০১৮

নাম: রাহাত হোসেন শরীফ

জন্ম তারিখ: ১২-০৯-২০০৮ লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম স্থান: গোপালপুর রোড, গোপালপুর, ওয়ার্ড-৪৪, জোন: ১, গা.সি.ক; গাজীপুর।

পিতার নাম: মো: সেলিম

জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: স্বপ্না

জাতীয়তা: বাংলাদেশী

বর্তমান ঠিকানা: গোপালপুর রোড, গোপালপুর, ওয়ার্ড-৪৪, জোন: ১, গা.সি.ক; গাজীপুর।

মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ রাহাত রাস্তায় পড়ে থাকে। হাসপাতালে নেওয়ার মত কেউ ছিল না। সবাই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকে। দীর্ঘক্ষণ ধরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আহত রাহাতকে উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়েও বিরম্বনার শিকার হতে হয়। রোগীর চাপের কারনে ডাক্তার আসতে বিলম্ব হয়। অবেশেষে কর্তব্যরত ডাক্তার এসে তাকে মৃত ঘোষণা করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

দাফন-কাফন

তার স্বজনরা হাসপাতাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে গ্রামের বাড়ি নরসিংদী নিয়ে দাদার কবরের পাশে দাফন করেন।

প্রতিক্রিয়া

আদরের সন্তানকে হারিয়ে রাহাতের মা পাগলপ্রায়। ছেলের ছবি বুকে নিয়ে কান্না করতে করতে বারবার মূর্ছা যান। সৌদি প্রবাসী বাবা সেলিম মিয়া পুত্রশোকে পানাহার ছেড়ে দিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

বুকভরা আশা নিয়ে ১৪ জুলাই উত্তরার আজমপুরে নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন টঙ্গীর রাহাত হোসেন শরীফ (১৬)। রাহাতের স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে জার্মানি যাবেন। কিন্তু কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালীন একটি গুলি রাহাতের সবকিছু থমকে দেয়। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার সব স্বপ্ন। ছেলেকে হারিয়ে রাহাতের স্মৃতিই এখন মা স্বপ্না আক্তারের একমাত্র অবলম্বন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের মা বলেন, সংসারে অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে তা কখনো বুঝতে দিইনি। রাহাত জার্মানি যাবে সে আশায় বুক বেঁধে লেখাপড়া করে যাচ্ছিল। স্বপ্ন পূরণের জন্য আমরা শতকষ্ট করেও টাকা-পয়সা জোগাড় করছিলাম। আজ তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পুলিশের একটি গুলিতে, একটি ভবিষ্যৎ, একটি স্বপ্ন নিমিষেই চুরমার হয়ে গেল। ছেলেকে অবলম্বন করেই বেঁচে ছিলাম, এখন কাকে নিয়ে আমরা বাঁচব। ছেলে আমার ২০ বছরের সাধনার ধন। আমার ছেলে কারও সঙ্গে কখনো ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়াত না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত, আমার ছেলের কী অপরাধ ছিল? কার কাছে আমি ছেলে হত্যার বিচাই চাইব। এভাবে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এক নজরে শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ

নাম	: শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ১২-০৯-২০০৮
বয়স	: ১৫ বছর
পিতা	: মো: সেলিম
মাতা	: মোসা: স্বপ্না বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ১৮-০৭-২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: আজমপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বাহের চর, থানা: চশবুদ্ধি জেলা: নরসিংদী
বর্তমান ঠিকানা	: গোপালপুর ওয়ার্ড ৪৪, টঙ্গী, গাজীপুর

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

২. শহীদ পরিবারে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

'একমাত্র উপার্জনক্ষমকে হারিয়ে অসহায় পরিবার'

শহীদ জুয়েল রানা

ক্রমিক : ১৬৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৩৭

শহীদ পরিচিতি

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শালমারা ইউনিয়নের শাখাহাতী গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৯৯৭ সালের ৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন তেজস্বী বীর শহীদ জুয়েল রানা। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল থাকায় কোনরকম প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর পরিবারের দায়িত্ব এসে বর্তায় শহীদের উপর। পরিবারের হাল ধরতে বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে রাজধানী শহরে আসেন মহাবীর জুয়েল। বিভিন্ন কারখানা, ফ্যাক্টরি ঘুরে ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইন্টারস্টফ এ্যাপারলেস লিমিটেড গার্মেন্টসে সুইং, ইনপুট ম্যান হিসেবে যোগদান করেন। পিতা-মাতার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর উপার্জনেই চলতো দরিদ্র কৃষক পরিবারটি। মা, বাবা, স্ত্রী এবং অবুঝ দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে ছিল তাদের সংসার। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে তাঁর অংশ গ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়। পিতা জনাব মোনতাজ উদ্দিন (৫১) পেশায় কৃষক। জননী জামেলা খাতুন একনিষ্ঠ গৃহিণী। ২৪ এর শহীদ জুয়েল মোছাঃ দুলালীর সাথে ঘর বেঁধেছিলেন। একে একে তাঁদের সংসার জুড়ে জন্ম নিয়েছে দুটি কন্যা সন্তান। বড় মেয়ে জাব্বাতি আক্তার (৮) আলহেরা সালাফিয়া মাদ্রাসার ২য় শ্রেণী এবং কনিষ্ঠ কন্যা জিনাত খাতুন (৫) বারোপাইকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীতে অধ্যায়নরত রয়েছে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মহাবীর জুয়েল রানা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে গাজীপুরে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। শহীদের গ্রামের বাড়িতে চার শতাংশ বসতি জমি রয়েছে। বর্তমানে পরিবারে তিন লক্ষ সমপরিমাণ টাকা ঋণ রয়েছে। একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে বাড়ি ভাড়াসহ সন্তানদের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ যোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যে কারণে শহীদ পরিবার গাজীপুর ছেড়ে গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট (৫ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট ২০২৪)

৫ জুলাই: মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে হাইকোর্ট।

৬ জুলাই: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

৯ জুলাই: কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ

সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন তারা। বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দেয়। কোটা বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৪ জুলাই দিন নির্ধারণ করা হয়।

১ জুলাই: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে কোটা বাতিলের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় ঢাবিসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহবান জানানো হয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়।

২ জুলাই: ঢাবির ছাত্ররা মিছিল নিয়ে এক ঘন্টা শাহবাগ অবরোধ করে রাখে। জাবির ছাত্ররাও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ২০ মিনিটের জন্য অবরোধ করে।

৩ জুলাই: ঢাবির ছাত্ররা শাহবাগ মোড়ে দেড় ঘণ্টার মতো অবরোধ করে রাখে। ময়মনসিংহে রেললাইনে ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক অবরোধ করে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার মোড়ে সড়ক অবরোধ করে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

৪ জুলাই: প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ 'নট টুডে' বলে আদেশ দেন। পরের সপ্তাহে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে বলে ওই দিন অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় থেকে জানানো হয়। ছাত্ররা ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে ৫ ঘণ্টা।

৫ জুলাই: এই দিন শুক্রবারেও চট্টগ্রাম, খুলনা ও গোপালগঞ্জে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনকারী ছাত্ররা।

৬ জুলাই: দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের দিনের মতোই বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্দোলনকারীরা সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেন। নাম দেয়া হয় 'বাংলা ব্লকেড'।

৭ জুলাই : বাংলা ব্লকেডে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

৮ জুলাই: ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ অবরোধ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। সারাদেশের ছাত্রদের নিয়ে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলন' নামে ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করা হয়।

৯ জুলাই: হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে দুই শিক্ষার্থী আবেদন করে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪ ঘন্টা অবরোধ কর্মসূচি 'বাংলা

ব্লকেড' পালন করা হয়। পরদিন সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা 'বাংলা ব্লকেড'-এর ঘোষণা দেয়া হয়।

১০ জুলাই : কোটার বিষয়ে পক্ষগুলোকে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে নির্দেশ আপিল বিভাগের।

১১ জুলাই: পুলিশের বাধার মুখেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ পালন করেন আন্দোলনকারীরা।

১২ জুলাই: শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলে।

১৩ জুলাই: তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরাফাত বলেন, বিচারাধীন বিষয়ে সরকারের এখন কিছু করার নেই।

১৪ জুলাই: রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয়। শেখ হাসিনা চীন

সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারী ছাত্রদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে রাত নয়টার দিকে ঢাবির বিভিন্ন হলে শ্লোগান ওঠে, তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার!

১৫ জুলাই: ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলে, আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে। ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম মন্তব্য করে, যাঁরা 'আমি রাজাকার' স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের শেষ দেখিয়ে ছাড়বো।

১৬ জুলাই: পুলিশের গুলিতে রংপুরে আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে ওয়াসিম, শান্ত, ফারুক ও ঢাকায় সবুজ আলী ও শাহজাহান শাহদাতবরণ করেন। সাদ্দাম আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলে, আমরা দেখে নেব, কত ধানে কত চাল।

১৭ জুলাই: ঢাবিসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়িত করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে সাধারণ ছাত্ররা। পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কফিন মিছিল পন্ড হয়ে যায়।

১৮ জুলাই: ছাত্রদের ঘোষণা অনুসারে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলে হানাদার আওয়ামী পুলিশ বাহিনীর হামলা। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এদিন আন্দোলনের মূল হাল ধরে। মুগ্ধসহ মোট ৪০ জন শাহদাতবরণ করেন।

১৯ জুলাই: শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়।

২০ জুলাই: দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন। সাধারণ ছুটি ঘোষণা। পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে মোট ৭১ জন শাহদাতবরণ করেন। প্রধান সমন্বয়ক নাহিদকে তুলে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক তিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আট দফা দাবি পেশ। সমন্বয়কদের আরেকটি অংশ ৯ দফা দাবি পেশ করে।

২১ জুলাই: কোটা সংস্কার করে ৭% কোটা রেখে রায় প্রদান করে আদালত। এদিনও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

২২ জুলাই: কোটা সংস্কার করে প্রকাশিত রায়ের প্রজ্ঞাপনের প্রস্তুতি চলে। প্রতিদিন মানুষ হত্যার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। তবে আন্দোলন স্তিমিত হতে থাকে। এদিনেও ১০ জন শাহদাতবরণ করেন। এর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আগের আহত হওয়া।

২৩ জুলাই: কোটাপ্রথা সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারি। সরকার কয়েক হাজার মামলা দিয়ে গণগ্রেফতার শুরু করে।

২৪ জুলাই: কোটা আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া গেছে।

২৫ জুলাই: আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও অন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কোটা সংস্কারের যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, সেটিকে তাঁরা চূড়ান্ত সমাধান মনে করছেন না। যথাযথ সংলাপের পরিবেশ তৈরি করে নীতিনির্ধারণী জায়গায় সব পক্ষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন দিতে হবে।

২৬ জুলাই: এলাকা ভাগ করে চলছে 'ব্লক রেইড'। সারা দেশে অভিযান। সারা দেশে অন্তত ৫৫৫টি মামলা। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬ হাজার ২৬৪। সাদা পোষাকে ডিবি হারুনের সন্ত্রাসীরা হাসপাতাল থেকে ছাত্রনেতাদের তুলে নিয়ে যায়।

২৭ জুলাই: ১১ দিনে গ্রেপ্তার ৯ হাজার ১২১ জন। আতঙ্কে মানুষ ঘরছাড়া। ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করতে থাকে ডিবি হারুন

২৮ জুলাই: মোবাইল ইন্টারনেট ১০ দিন পর সচল করা হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে হেফাজতে নেয় ডিবি হারুন। ডিবি হারুন জোর করে গান পয়েন্টে ছাত্রনেতাদের দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি আদায় করে।

২৯ জুলাই: ছাত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য খুনী হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলের মিটিং-এ জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়।

৩০ জুলাই: হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল করে ছাত্র ও শিক্ষকরা। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান। ফেসবুকের প্রোফাইল লাল রঙের ফ্রেমে রাঙিয়েছেন সারাদেশের মানুষ। এদিকে গণহত্যাকারীরা কালো ফ্রেম দিয়েছে। তবে সেটা নিতান্তই নগণ্য। নাটক ও সিনেমা সংশ্লিষ্ট মানুষরাও খুনী হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেন।

৩১ জুলাই : ছাত্ররা 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস' কর্মসূচি পালন করে। ৯ দফার পক্ষে জনমত গঠন করতে থাকে ছাত্ররা।

১ আগস্ট: ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দিয়েছে ডিবি।

২ আগস্ট: ৯ দফা আদায়ের দাবিতে সারাদেশে গণমিছিল করে ছাত্র জনতা। রাজধানীসহ বিভিন স্থানে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে ৩ জন শাহদাতবরণ করেন।পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে ১৫ হাজার মানুষ।

৩ আগস্ট: ৯ দফা না মেনে গণগ্রেপ্তার ও গণহত্যা চালু রাখার প্রতিবাদে শহীদ মিনারে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করে ছাত্র জনতা। সেনাপ্রধান তার সেনা কমান্ডার নিয়ে মিটিং করেন। সেখানে তিনি এই বার্তা পান যে, সেনাবাহিনী আর গুলি করতে প্রস্তুত নয়। কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে নয় দফা বাদ দিয়ে ১ দফার (খুনী হাসিনার পদত্যাগ) ঘোষণা দেয় ছাত্রনেতারা।

৪ আগস্ট: রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের গুলি করে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র ইট পাটকেল দিয়ে সন্ত্রাসী ও হানাদার পুলিশ বিজিবিকে প্রতিরোধ করে। কয়েকটি স্থানে সেনাবাহিনীও গুলি করে। সারাদেশে ১৩০ জন খুন হন। পরদিন ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র জনতা।

৫ আগস্ট: সকাল থেকেই ব্যাপক মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী। সারা ঢাকা শহরে খন্ড খন্ড যুদ্ধ শুরু হয় ছাত্র জনতার সাথে। সকাল সাড়ে দশটার পর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হাসিনা পালিয়ে যায়। কর্মরত পুলিশরা এই খবর না জানায় তারা জনতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অনেক মানুষকে তারা খুন করতে থাকে। সেনাবাহিনীর প্রধান দুইটায় ভাষণ দিবেন বলে ঘোষণা দেন। ১২ টায় শাহবাগের পুলিশ ও সেনাবাহিনী রাস্তা ছেড়ে দেয়। ১ টায় মানুষ জেনে যায়, হাসিনা পালিয়ে গেছে। সারাদেশে গলিতে গলিতে মিস্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। দেশে বিভিন্ন মোড়ে থাকা স্বৈরাচার মুজিবের সকল মুর্তি ভেঙ্গে দেয় আন্দোলনকারী ছাত্রজনতা। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে। অনেকেই ছাত্রজনতার রোষানলে পড়ে খুন হয়। রাজধানীর মানুষদের একটা বড় অংশ গণভবনে গিয়ে হাসিনার ওপর রাগ ক্ষোভ গণভবনের ওপর ঝাড়ে।

৬ আগস্ট: বাংলাদেশে উদিত হয় নতুন সূর্য।

আন্দোলনে যোগদান ও শাহাদতের অমিয় পান:

শহীদ জুয়েল রানা ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য লং মার্চে যোগদান করেন। মিছিলটি শফিপুর আনসার একাডেমীর সামনে পৌঁছালে, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের ঘাতক আনসার বাহিনী শান্তিপ্রিয় ছাত্র জনতাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। শহীদ জুয়েলে রানা তখন মিছিলের সামনে ছিলেন। তখন সময় দুপুর ৩.৩০ মিনিট। হঠাৎ একটি বুলেট শহীদ জুয়েলের পায়ে এসে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সে সময় তাকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায় তাঁর বন্ধুরা। হাসপাতালগুলোতে আহতদের অনেক ভিড় থাকায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বিকাল ৪.৩০ টায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন। একসময় নিজে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছেন অনেক মানুষের জীবন। কিন্তু সেই রক্তের অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। সে রাতেই রানার লাশ শাখাহাট বালুয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা নিজ গ্রামে নেয়া হয়। জানাজা শেষে ৬ আগস্ট পরদিন সকালে বিশেষ সম্মাননা দিয়ে দাফন কর্ম সম্পূর্ণ করা হয়।

বাকরুদ্ধ বাবা-মা

নিহত জুয়েলের বিষয়ে জানতে চাইলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা। কৃষক বাবাও অনেকটাই বাকরুদ্ধ। তিনি প্রতিদিনই ছেলের কবরে যান এবং ছেলের কবরের পরিচর্যা করেন। তবে তিনি ছেলে হত্যার উপযুক্ত বিচার চান। এলাকাবাসী জুয়েল হত্যার উপযুক্ত বিচার ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান সরকারের কাছে।

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, BIRTH AND DEATH REGISTRATION
LOCAL GOVERNMENT DIVISION

Back to Previous Page (/)

BIRTH REGISTRATION RECORD VERIFICATION

REGISTRATION DATE	REGISTRATION OFFICE	ISSUANCE DATE
14 SEPTEMBER 2006	SHALMARA UNION PARISHD	24 JANUARY 2021
DATE OF BIRTH	BIRTH REGISTRATION NUMBER	SEX
09 JULY 1997	[illegible]	MALE

[illegible]	[illegible]	REGISTERED PERSON NAME	
[illegible]	[illegible]	PLACE OF BIRTH	GAIBANDHA
[illegible]	[illegible]	MOTHER'S NAME	
[illegible]	[illegible]	MOTHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI
[illegible]	[illegible]	FATHER'S NAME	
[illegible]	[illegible]	FATHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI

Back to Previous Page (/)

© 2024 - Developed and maintained by Office of the Registrar General, Birth and Death Registration

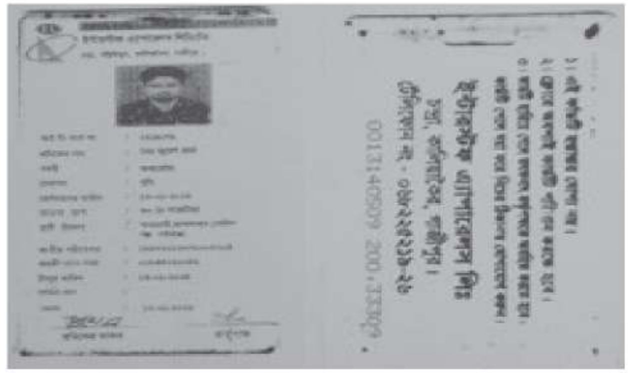

শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জুয়েল রানা
জন্ম তারিখ	: ০৯/০৭/১৯৯৭, বয়স: ২৭ বছর
জন্মস্থান	: গোবিন্দগঞ্জ ,গাইবান্ধা
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
পেশাগত পরিচয়	: ইন্টারস্টফ এ্যাপারলেস লিমিটেড গার্মেন্টসে সুইং, ইনপুট ম্যান পদে কর্মরত ছিলেন
পিতা	: মো: মোনতাজ উদ্দীন, পেশা: কৃষক, বয়স : ৫১
মাতা	: মোছা: জামেলা খাতুন, পেশা: গৃহিণী, বয়স : ৪৮
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা: গাইবান্ধা, উপজেলা: গোবিন্দগঞ্জ, ইউনিয়ন: শালমারা, গ্রাম: শাখাহাতী
সম্পদের পরিমাণ	: চার শতাংশ বসতি জমি রয়েছে
মাসিক আয়	: এই মুহূর্তে বন্ধ

সন্তানদের নাম

১. জান্নাতি আক্তার, বয়স: ৮, পেশা: ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান: আলহেরা সালাফিয়া মাদরাসা, শ্রেণি: ২য়, সম্পর্ক: মেয়ে
২. জিনাত খাতুন বয়স: ৫, পেশা: ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান: বারোপাইকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেণি: শিশু, সম্পর্ক: মেয়ে

প্রস্তাবনাসমূহ

১. শহীদ পরিবার ঋণগ্রস্থ। ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
৩. শহীদ কন্যাদ্বয়কে এতিম প্রতিপালনের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে
৪. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে।

নিউজ লিংক

https://www.dhakaprokash24.com/saradesh/rangpur/66772
https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/858973

“নাদিমুল ইসলাম এলাকায় ছাত্রদের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসা করে দিতেন”

নাদিমুল ইসলাম এলেম

ক্রমিক : ১৭০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৩৮

শহীদ পরিচিতি

নাদিমুল ইসলাম এলেম ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। তার বাবার নাম শাহ আলম এবং মায়ের নাম কিশমত আরা। তাদের নিজস্ব কোন জমি নেই। এলেম বুরহান উদ্দিন কলেজের ডিগ্রী ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। চাকুরীর পাশাপাশি পরিবারকে সহযোগিতার জন্য একটি পোষাকের শোরুমে জব করতেন। ছাত্র জীবন থেকেই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শেখা এলেম বুঝতে পেরেছিলেন দেশের সর্বনাশ কারা করছে। কারা মুক্তিযুদ্ধের সবক দিয়ে দেশের ক্ষতি করছে। তিনি লক্ষ্য করেন আওয়ামী লীগের চাটুকারিতা করলে দেশপ্রেমিক। আর ন্যায়ের পক্ষে থাকলে সে হয়ে যাচ্ছে রাজাকার-দেশদ্রোহী। সরকারি দলের আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। দিনে দিনে নাদিমুল ইসলাম এলেম হয়ে পড়েন অপশাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী তরুণ।

যেভাবে শহীদ হলেন

নাদিমুল হাসান এলেম ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ১৮ জুলাই প্রথম অংশ গ্রহণ করেন। ছাত্রদের প্রথম দাবী ছিল অন্যায় কোটা প্রথা বাতিল হোক। কোটার কারনে মেধাবীদের চাকুরী পাওয়া দিনে দিনে কঠিন হচ্ছিলো। কোটার মাধ্যমে মূলত আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান, বিতর্কিত ছাত্রলীগ এবং খুনি স্বৈরাচারী সরকারের

চাটুকার দালালেরা সরকারী চাকুরী পেত। শেখ হাসিনার ইচ্ছা ছিল তার নিজস্ব চাটুকার লোকদের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় ক্ষমতায় টিকে থাকা। যা সচেতন ছাত্র-জনতা কোনভাবেই মেনে নেয়নি। কোটা প্রথা ছিল হাসিনা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ২০০৮ থেকে এরকম অসংখ্য নীতিমালা শেখ হাসিনা নিজের মনমতো বাস্তবায়ন করেন। কেউ সামান্য বিরোধীতা করলে তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করতেন। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী নেতাদের নির্মূল করে নাস্তিক-মদ্যপায়ীদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেন। যারা লুটপাট ও অবিচারের মাধ্যমে দেশটাকে ধ্বংস করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সাধারণ জনতা সমস্ত ব্যপার বুঝতে পারলেও কথা বলার-প্রতিবাদ করার সাহস তাদের কোনভাবেই হয়না। প্রত্যেক নির্বাচনে অপেক্ষায় থাকে সরকার পরিবর্তনের। খুনি হাসিনা তার চাটুকারদের সহায়তায় ভোট দানের অধিকার রহিত করে। নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পেরে এলেমের মতো তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা অধিকারের দাবী তুললে তাদেরকে রাজাকার বলে গালি দেয় খুনি হাসিনা। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে গেলে ছাত্রলীগের গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে মার খায়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে যেয়েও রেহাই পায়না।

আমাদের সময়

শুক্রবার

২ আগস্ট ২০২৪ ॥ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩১

১২ শেষপাতা

স্বপ্ন ছিল ছেলে বিদেশে পড়বে

এম আশিক নূর, *কেরানীগঞ্জ* ● কেরানীগঞ্জের বাসা থেকে নানির বাসা রাজধানীর লক্ষ্মীবাজার যাওয়ার কথা বলে বের হন নাদিমুল হাসান এলেন (২৪)। নানির বাসায় যাওয়ার পথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে কোটা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীবাজার চলে যান। সেখানে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে চোখে মুখে গুলি লেগে মারাত্মক জখম হন হাসান। পরে তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গত ১৯ জুলাই এ ঘটনা ঘটে। নিহত হাসান রাজধানীর নাজিমুদ্দিন রোডের

■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

স্বপ্ন ছিল ছেলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

গত শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজ আদায় শেষে মাকে ফোনে জানান, সে নানির বাসায় পরে যাবে, বন্ধুদের সঙ্গে একটি জরুরি কাজে যাচ্ছে, একটু পরে বাসায় ফিরে খাওয়াদাওয়া করবে। পরে বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে তারা কোটা আন্দোলনে অংশ নিতে রাজধানীর লক্ষ্মীবাজার যান। সেখানে বেশ কয়েকটি কলেজের ছাত্রছাত্রী একত্র হয়ে আন্দোলন শুরু করলে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের চালানো গুলিতে চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন হাসান। পরে তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। ঘটনার ১২ দিন পর বুধবার সকালে নিহতের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় যে, সেখানে এখনো চলছে শোকের মাতম।

নিহতের বাবা শাহ আলম জানান, আন্দোলন তো একসময় ঠিকই শেষ হবে, কিন্তু আমার ছেলে তো আর কোনো দিন ফেরত আসবে না। আমি ছেলে হত্যার বিচার কার কাছে চাইব।

নাদিমুল হাসান এলেম সচেতন ছাত্রদের একজন ছিলেন। তিনি ১৮ জুলাই তার বন্ধুদের নিয়ে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলন থেকে বাসায় ফেরেন রাত ১২টায়। ১৯ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ শেষ করে আন্দোলনে যুক্ত হতে লক্ষ্মীবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ছাত্র-জনতা কোন ভাবেই

ভাবেনি যে, ঘাতক পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, বিতর্কিত সংগঠন ছাত্র লীগ ও যুব লীগের সন্ত্রাসীরা ভয়ানক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর বর্বর হামলা চালাবে। নামাজ শেষে সারাদেশে শুরু হয় নারকীয় বর্বরতা। ছররা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, হ্যান্ড গ্রেনেড, স্নাইপার থেকে গুলি ও টিয়ারশেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুনিরা। রক্তাক্ত হতে থাকে রাজপথ। আনুমানিক ৩.১৫ মিনিটে লক্ষ্মীবাজারে ওয়াসা ভবনের সামনে চোখে গুলিবিদ্ধ হন এলেম। তার দেহ দীর্ঘসময় রাস্তায় পড়ে থাকে। বুলেটের মুখে কেউ উদ্ধার করতে এগিয়ে আসতে পারেনা। বিকালের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ছাত্ররা তার লাশ রিকশায় তুলে দেয়। হাসপাতালে নেয়ার পরে জানা যায় এলেম শহীদ হয়ে গেছেন। পরদিন কেরানীগঞ্জে জানাজা শেষে লাশ দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

এলেমের বাবা জনাব শাহ আলম একটি কাপড়ের দোকানে চাকুরী করেন। তার মাসিক আয় ২০ হাজার টাকা। মা কিশমত আরা একজন গৃহিনী। তিনি ডায়াবেটিস রোগী। তার হার্টে ৩ টি ব্লক ধরা পড়েছে। উন্নত চিকিৎসা দরকার। যার সামর্থ এলেমের বাবার নেই। জনাব শাহ আলম কেরানীগঞ্জে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন। তার নিজস্ব থাকার জন্য বা ঘর করার জন্য কোন জমি নেই।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

এলাকার জুনিয়র ছাত্র সোহেল বলেন, এলেম ভাই এই এলাকায় ছাত্রদের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসা করে দিতেন।

এলেমের সহপাঠী শরিফ বলেন, এলেম মায়ের ভক্ত ছিল। বন্ধুদের বিপদে সব সময় সাহায্য করতো।

ভাড়া বাসায় অবস্থানকালীন প্রতিবেশি মিথিলা আক্তার জানান, এলাকাবাসীর সাথে আচরণে আন্তরিক ছিল।

১৪ | কোটা সংস্কার আন্দোলন : রাজধানীসহ সারা দেশে নিহত যারা

এলেমের ছোট ভাই রাফি বলেন, আমাকে আমার ভাইয়া অনেক আদর করতো। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত।

প্রতিবেশী লামিয়া বলেন, আমার বাচ্চাটিকে এলেম ভাই অনেক স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে তার ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু কেনার সময় আমার বাচ্চাটার জন্যেও কিনতেন।

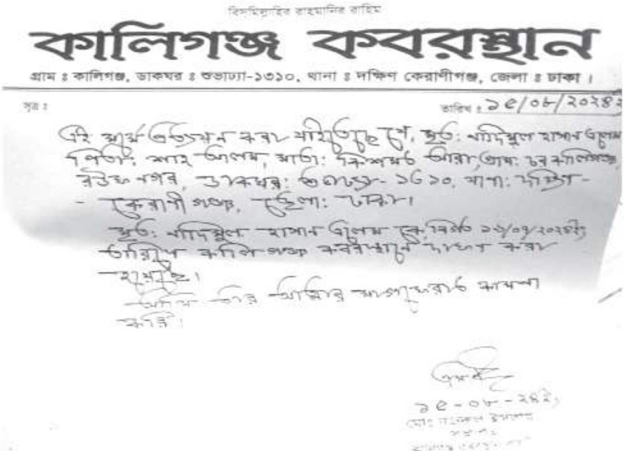

কালিগঞ্জ কবরস্থান

গ্রাম : কালিগঞ্জ, ডাকঘর : শুভাড্যা-১৩১০, থানা : দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, জেলা : ঢাকা।

সূত্র :

তারিখ : ১৫/০৮/২০২৪

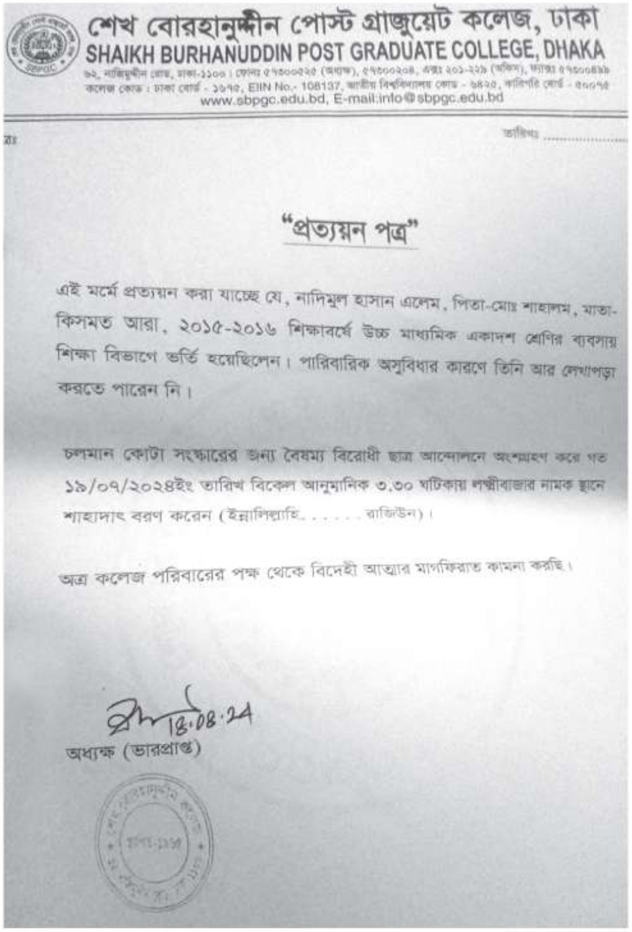

শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা
SHAIKH BURHANUDDIN POST GRADUATE COLLEGE, DHAKA
www.sbpgc.edu.bd, E-mail:info@sbpgc.edu.bd

তারিখঃ ....

"প্রত্যয়ন পত্র"

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাদিমুল হাসান এলেম, পিতা-মোঃ শাহালম, মাতা-কিসমত আরা, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। পারিবারিক অসুবিধার কারণে তিনি আর লেখাপড়া করতে পারেন নি।

চলমান কোটা সংস্কারের জন্য বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গত ১৯/০৭/২০২৪ইং তারিখ বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ ঘটিকায় লক্ষীবাজার নামক স্থানে শাহাদাৎ বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি....... রাজিউন)।

অত্র কলেজ পরিবারের পক্ষ থেকে বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

১৪.০৮.২৪
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

এক নজরে শহীদের সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

নাম	: নাদিমুল হাসান এলেম
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ১২ আগস্ট ১৯৯৯
পিতা	: শাহ আলম
মাতা	: কিশমত আরা
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকাল ০৩.১৫টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: কবি নজরুল কলেজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
আক্রমণকারী	: সূত্রাপুর বা কোতয়ালী থানার পুলিশ
দাফন করা হয়	: কেরানীগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: কেরানীগঞ্জ (নিজস্ব কোন জমি নেই, তার পরিবার ৭ম তলার উপরে ভাড়া বাসায় থাকে)
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নিজস্ব কোন জমি নেই

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বাবাকে সহযোগিতা করা

২. ছোট ভাইদের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার খরচ প্রদান করা

৩. মায়ের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা

শহীদ মো: আরিফুল মিয়া

ক্রমিক : ১৭১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৩৯

শহীদ পরিচিতি

মো: আরিফুল মিয়া, পেশায় একজন দিনমজুর, যিনি জীবন কাটাচ্ছেন কাঠমিস্ত্রীর কাজ করে। তাঁর প্রতিদিনের শ্রমে সংসার চলে, আর সেখানেই নিহিত তাঁর জীবনের সার্থকতা। পল্লী বিদ্যুৎ সংলগ্ন মায়ের দোয়া ফার্নিচারে প্রতিনিয়ত তাঁর হাতের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠে নতুন আসবাবপত্র, যেন তাঁর শ্রমই শিল্প হয়ে উঠে আসে। আরিফুল মিয়ার স্থায়ী ঠিকানা গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার পশ্চিম গোপীনাথপুর গ্রামে। এই গ্রামেই তিনি বেড়ে উঠেছেন, গ্রামের মাটির স্নিগ্ধতায় মিশে আছে তাঁর সরলতা। গ্রামে তাঁকে সকলে চেনে একজন নিরীহ ও সৎ মানুষ হিসেবে। সত্যবাদী, সোজাসাপ্টা এবং সর্বদাই পরিশ্রমী–এমন মানুষ আরিফুল, যিনি সহজ জীবনযাপন করেন, কিন্তু প্রতিটি কাজ করেন নিষ্ঠার সাথে।

কাঠমিস্ত্রীর কাজেই তাঁর দিন কাটে, আর সেই কাজই তাঁর জীবনের রুটিরুজি। সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে তিনি নিজের শ্রমের মূল্য দিয়ে সংসার টিকিয়ে রেখেছেন।

যেভাবে ফুলটি ঝরে গেলো

২০২৪ সালের জুলাই মাসের উত্তাল সময়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে জনতার বুকে এক বৈষম্যবিরোধী আগুন ছড়িয়ে দেয়। ছাত্রদের আহ্বানে শুরু হওয়া এই আন্দোলন একসময় পরিণত হয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জাতির মহাবিদ্রোহে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের আপামর জনতা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। তরুণের ক্ষোভ আর হতাশা গড়িয়ে পড়ে রাজপথে। তাদের গর্জনে কেঁপে ওঠে স্বৈরাচারের তক্তপোষ। ৫ আগস্ট–বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অন্ধকার দিন। শেখ হাসিনা, ক্ষমতালোভী শাসকের গদি টলমল করে, তবুও তাঁর ক্ষমতা হারানোর আগ মুহূর্তেও তিনি রেখে যান এক নির্মম উত্তরাধিকার। তাঁর নির্দেশে দেশের আনাচে-কানাচে লেলিয়ে দেওয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মৃত্যু পরোয়ানা–যে পরোয়ানার লক্ষ্য ছিলেন নিরীহ ছাত্র-জনতা। সফিপুর আনসার একাডেমি এলাকা। বিকাল ৩টা বাজে। সশস্ত্র আনসার বাহিনী, প্রায় ৪০০-৫০০ জন, রাবার বুলেট ছুঁড়তে শুরু করে ছাত্রদের দিকে, যেনো এক অজানা শত্রু তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই নিরস্ত্র জনতার কোনো শত্রু ছিল না–তারা ছিলো দেশের সন্তান, তারা ছিলো সাধারণ মানুষ, যাদের কণ্ঠে ছিলো ন্যায়ের দাবি। বিকাল ৪টা। রাবার বুলেটের স্রোত থেমে গিয়ে শুরু হয় সরাসরি প্রাণঘাতী গুলি বর্ষণ। মোঃ আরিফুল মিয়া, একজন কাঠমিস্ত্রী, ছিলেন সেই মুহূর্তে রাজপথে। তাঁর হৃদয়ে জমে থাকা সকল বঞ্চনার জ্বালা তাঁকে নিয়ে এসেছিল জনতার কাতারে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে রাজপথে নেমেছিলেন তিনি, তাঁর বুকেও স্বপ্ন ছিলো সমতার–একটি নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত সমাজের। কিন্তু সেই স্বপ্নের অকাল মৃত্যু হলো আনসার বাহিনীর গুলিতে। বিকাল ৪টার সময় তাঁর বুক বিদীর্ণ করে গর্জে ওঠা গুলি যেন থামিয়ে দেয় তাঁর জীবন।

রাত ২ টা ২০ মিনিটে, মোঃ আরিফুল মিয়া মারা যান। তাঁর নিথর দেহ নিয়ে যায় অন্ধকার রাতের গভীরে। এ কাহিনি একার নয়, এ কাহিনি যেনো হাজারো বঞ্চিত জনতার। তাঁদের স্বপ্নেরা সেদিন মিশে যায় রক্তরাঙা রাজপথে, আর তাঁদের আত্মত্যাগের গল্প হয়ে ওঠে এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় জাতির সংগ্রামের ইতিহাসে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ আরিফুল মিয়া সম্পর্কে এক প্রতিবেশী বলেন, আরিফুল মিয়া ভালো মানুষ ছিলেন। সে কাজে ফাঁকি দিতেন না। ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। বিগত চার পাঁচ বছরে তার সাথে আমার কখনো মনমালিন্য হয়নি।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ মোঃ আরিফুল মিয়া ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী, যিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁর পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর স্ত্রী গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন, সামান্য ১৩,৫০০ টাকার বেতনে পরিবারের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতেন। তবে তাতেও তাঁদের আর্থিক দুর্দশা কাটানো সম্ভব হয়নি। আরিফুলের পরিবারে ছিল একমাত্র ছেলে, যে মাদ্রাসায় নার্সারি বা প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছিল।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হওয়ায় তাঁরা বাড়তি কোনো সহায়তা পাননি, যা তাদের জীবনে আরও বেশি কষ্টের ছাপ ফেলেছিল। আরিফুল মিয়ার জীবন ছিল সংগ্রামী, যেখানে প্রতিটি দিন বেঁচে থাকার জন্য তাঁকে লড়াই করতে হতো। তাঁর আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম সবসময় পরিবারের মঙ্গলের জন্য নিবেদিত ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্যদশা তাঁদের পরিবারের জন্য এক স্থায়ী বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: আরিফুল মিয়া
পেশা	: দিনমজুর (কাঠমিস্ত্রী), মায়ের দোয়া ফার্ণিচার, চান্দরা, পল্লী বিদ্যুৎ সংলগ্ন
স্হায়ী ঠিকানা	: পশ্চিম গোপীনাথপুর, ইউনিয়ন: পলাশবাড়ী, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা
বর্তমান ঠিকানা	: চান্দরা,পল্লী বিদ্যুৎ, ৭ নং ওয়ার্ড, কালিয়াকৈর, গাজিপুর
পিতার নাম	: খাজা মিয়া, বয়স: ৫৪, পেশা: কৃষক
মাতার নাম	: মোছা: রাশিদা বেগম, বয়স: ৪৩, পেশা : গৃহিণী
আয়ের উৎস	: দিনমজুর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৭ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৪ জন
	১. মো: জিসান, বয়স- ০৯, পেশা: শিক্ষার্থী, মোল্লা, জালালিয়া মাদরাসা
	২. আশিকুল ইসলাম, বয়স: ৩০, পেশা: রড় মিস্ত্রী (বড় ভাই)
	৩. মোছা: খাদিজা বয়স: ৩০, গার্মেন্টস কর্মী
	৪. মোছা: নুরী আক্তার
ঘটনার স্থান	: আনসার একাডেমি
আক্রমণকারী	: আনসার
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৫/০৮/২০২৪ ইং সময়: রাত-২:০০
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্হান	: ০৫/০৮/২৪ ইং, সন্ধ্যা ২:০০ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: গ্রামে পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. ছেলের লেখাপড়া ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া

২. কিছু ঋণ আছে (আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা) তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা

কারখানা থেকে বাড়িতে ফেরার পথে জনতার আন্দোলনে মিশে গেলেন তিনি, আর ফেরা হলো না বাড়িতে

শহীদ মোঃ সুজন খাঁন

ক্রমিক : ১৭২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪০

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

শহীদ মোঃ সুজন খাঁন ১৯৯৪ সালের ৫ জানুয়ারি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর থানার অন্তর্ভুক্ত এখলাসপুর ইউনিয়নের হাশিমপুর গ্রামের খাঁন বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মঞ্জিল খাঁন ও মাতার নাম নুর জাহান বেগম। পরিবারের প্রথম সন্তান সুজন খাঁন, তাই তাকে নিয়ে আনন্দের কমতি ছিল না পরিবারে। আর তাঁর জন্মের অনেকটা পরেই আরও একটি পুত্র ও কন্যা সন্তান হয় সুজন খাঁনের পিতা-মাতার। সব মিলিয়ে তাঁদের ছিল এই পাঁচ সদস্যের সুখী পরিবার। ছোট থেকেই পিতা-মাতা আর আত্মীয় স্বজনের খুব আদরের ছিলেন তিনি। মায়ের কাছে হাতেখড়ির পর, হাশিমপুরের একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় তাকে। এই মাদ্রাসাতেই পরবর্তীতে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন তিনি। তবে ছোট থেকেই তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যবসা কেন্দ্রীক। তাই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর ফুফাতো ভাইয়ের সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন তিনি। ঢাকার ইসলামপুরের একটি কাপড়ের দোকানে কাজের মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন।

পরিবার এলো ঢাকায়, সুজন আবার পেল পরিবার

সুজন খাঁন ঢাকায় এসে ফুফাত ভাইয়ের সাথে ইসলামপুরে কাজ করার একটা সময় পর তাঁর বাবা প্রবাস থেকে ফিরলেন। গ্রামে তেমন কোন কাজ না করতে পেরে তিনি এবার পরিবারের অন্য সব সদস্য সহ ঢাকায় এলেন। ঢাকায় এসে তাঁর বাবা সুজন খানের চাচাদের সাথে ব্যবসা শুরু করলেন। নারায়নগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় তাঁর বাবা ট্রলারের মাধ্যেমে নারায়ণগঞ্জ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পণ্য আনা-নেওয়া করতো। পরবর্তীতে সুজন নিজেও ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের জালকুড়ি এলাকায় এসে, পরিবারের সাথে একত্রে বসবাস করতেন। সর্বশেষ, তিনি স্থানীয় একটি পাটকলে শ্রমিকের কাজ করতেন।

আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রতিবাদী সুজন খাঁন

সারাদেশে ২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পরপরই কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। জুলাই মাসে আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেয়, জুলাইয়ের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীরা বৈষম্য মূলক কোটা পদ্ধতি সংস্কারের উদ্দেশ্য "বাংলা ব্লকেড" সহ বিভিন্ন কর্মসূচি চালায়। এই সময়ে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমাতে পুলিশের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ফলে সংঘর্ষ ঘটে। ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ আর চট্টগ্রাম ওমরগনি এমইএস কলেজের ফয়সাল মাহমুদ শান্ত ও শিক্ষার্থী ওয়াসিম আকরাম সহ ছয়জন শহীদ হলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হতে থাকে।

এরপর ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে ও বিভিন্ন জায়গায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, স্বৈরাচারের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মতো সংগঠনের হামলায় হতাহত সূচকীয়ভাবে বাড়তে থাকে। নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন বাড়তে থাকলে খুনী হাসিনা, সারাদেশে কারফিউ জারি করে এবং ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে নারায়ণগঞ্জেও। সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি এলাকায় ১৮ জুলাই প্রথমবারের মতো ব্যাপক আন্দোলন হয়। আন্দোলনে অংশ নেন, সুজন খাঁনের ছোট ভাই মাহবুব নিজেও। মাহবুব জানায়,"সেদিন আন্দোলনে গিয়ে, ভাইয়াকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কারণ তখন তাঁর কারখানায় থাকার কথা ছিলো।"

আন্দোলন শেষে যে যার মত বাড়িতে ফিরে এলে পরবর্তীতে মাহবুব জানতে পারে যে, শিক্ষার্থী আর সাধারণ মানুষের আন্দোলনে আমার বড় ভাইয়ের কারাখানা শ্রমিকেরাও যুক্ত হয়েছিলো। এ নিয়ে মাহবুব আরও বলেন," আমার বড় ভাই আগে থেকেই বেশ প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন, তাঁর সামনে হওয়া কোন অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিগত আওয়ামী স্বৈরশাসনের শুরু থেকেই তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন, সবসময় এর প্রতিবাদ করতেন। আমরা যখন মুখ ফুটে সরকারের কোন অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারতাম না, তখনও তিনি মামলা-গ্রেপ্তারের ভয় উপেক্ষা করে হাসিনা সরকারের বিভিন্ন অপকর্মের কথা নির্ভয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরতেন।"

জালকুড়ির প্রথম শহীদ মোঃ সুজন খাঁন

প্রতিবাদী সুজন খাঁন বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবীতে শুরু হওয়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে প্রথম থেকেই একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। জালকুড়িতে প্রথম ১৮ জুলাই তীব্র আন্দোলন শুরু হলে, তিনি নিজেও কাজের মাঝে এসে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনার শুরু ১৯ জুলাই, মূলত ১৮ তারিখের পরদিনও জালকুড়ি এলাকায় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সেদিন ছিল শুক্রবার, সকালে উঠেই সুজন খাঁন মাকে জানান তিনি কারখানায় যাবেন। দেশের এমন পরিস্থিতিতে কারফিউয়ের মধ্যে তাকে কারখানা যেতে বাঁধা দেন তাঁর মা। মাকে সুজন জানায়,"এখন মাসের শেষ, এখন একদিন হাজিরা না দিলে পরে বেতন নিয়ে ঝামেলা হইবো। "

ছেলে কারখানায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে, মা ছেলের জন্য কাঁঠাল আর মুড়ির ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তাঁর মা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে জানান, "অই কারখানাই যাইতে চাইলে, ওর লাইগা কাঁঠাল ভাঙলাম, বাজান। আমরা তিন মা-পুত এক লগেই কাঁঠাল আর মুড়ি খাইলাম। কে জানতো, হেইডাই ওর আমার লগে শেষ দেহা।"

সেদিন জুম্মা নামাজের জন্য সাধারণ মানুষের সমাগম বেড়ে গেলে, অন্যদিকে অস্ত্র হাতে প্রস্তুতি নিতে থাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। নামাজ শেষে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জালকুড়ি বাসস্ট্যান্ড মোড়ে একত্রিত হতে থাকে আন্দোলনকারীরা। শুরু থেকেই পুলিশ আর বিজিবির সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হতে থাকে তাদের। পুলিশ-বিজিবি একসাথে আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের ওপর রাবার বুলেট আর টিয়ারশেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনরতদের মাঝে। বিকাল ৩টার কিছু সময় পর কারখানা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দেন সুজন খাঁন। পথিমধ্যে আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্ত হন তিনি। ততক্ষণে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পুলিশ-বিজিবির পাশাপাশি আওয়ামী লীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরাও আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষের ওপর চড়াও হতে থাকে। সন্ত্রাসীদের এমন বেপরোয়া আচরণে উত্তেজিত জনতা জালকুড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নারায়ণগঞ্জের কুখ্যাত সাংসদ শামীম ওসমানের বাসে আগুন দেয়। এবার আরও মারমুখী হয় পুলিশ-বিজিবি। নির্বিচারে গুলি করতে থাকে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর। তখন বেলা ঠিক ৫টা, আন্দোলনের সম্মুখ সারীতে থাকা সুজন খাঁনের কোমড়ে এসে লাগলো ঘাতকের ছোঁড়া বুলেট। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। সাধারণ শিক্ষার্থী আর আন্দোলনরত সাধারণ কিছু মানুষ তাকে দ্রুতই স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার জানালেন তিনি ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁর সাথে আন্দোলনরতরা। সুজন খাঁনের নাম উঠলো শহীদের খাতায়, ইতিহাসে অংশ হয়ে রইলেন তিনি। জুলাই বিপ্লবে তিনিই সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি এলাকার প্রথম শহীদ।

প্রতিবাদে সম্মুখে সুজনেরা থাকে
নিজের রক্তে নব স্বাধীনতা আঁকে,
পাঁজর আঘাতে তাঁরা ভাঙে শৃঙ্খল
সরিয়ে যুগের জেঁকে বসা জগদ্দল।

শহীদ সুজনেরা তখনও স্বৈরাচারের চক্ষুশূল

সুজন খাঁনের শাহাদাতের পর, তাঁর কারখানার এক সহকর্মী রাজু গিয়ে তাঁর পরিবারকে জানালেন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর অবস্থায় ক্লিনিকে ভর্তি তিনি। খবর পেয়ে ক্লিনিকে ছুটে এলেন তাঁর মা-বাবা আর ছোট ভাই। কিন্তু এসে দেখলেন এরমধ্যেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন সুজন। মা-বাবা আর ভাইয়ের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠলো চারপাশ। কিন্তু এরমধ্যেই ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ সুজন খাঁনের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকলো। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের ভাষ্য ছিল এরকম যে, "সারাদেশের অবস্থা তো জানেনই। দ্রুতই আপনাদের লাশ আপনারা ক্লিনিক থেকে নিয়ে যান। তাছাড়া কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে আপনাদের পাশাপাশি আমাদেরও হয়রানি করবে।"

ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কথামতো, কোন মৃত্যু সনদ ছাড়াই দ্রুত শহীদ সুজনের লাশ নিয়ে আসা হলো জালকুড়ি বাসস্ট্যান্ডের কাছে তাঁদের বাড়িতে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হয়রানির চিন্তায় রাতেই শেষ গোসল করানো হলো তাকে। কারফিউয়ের মাঝেও অগণিত জনতার উপস্থিতে রাত প্রায় ১১টার পর রাব্বানীনগর মাদ্রাসায় জানাজা নামাজের পর জালকুড়ি ঈদগাঁহ সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করানো হয় ।

শহীদের পারিবারিক বর্তমান অবস্থা

শহীদ সুজন খাঁনের বাবা প্রবাস থেকে ফিরে, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় এসে ট্রলারের মাধ্যেমে পণ্য পরিবহনের ব্যবসা শুরু করেন। আর অন্যদিকে শহীদ মোঃ সুজন খাঁন স্থানীয় একটি পাটকলে শ্রমিকের কাজ করতেন। পিতার আয়ে বাজার সদাই, আর পুত্রের আয়ে ভাই-বোনের পড়াশোনা। এমন করেই দিন চলতো মধ্যবিত্ত পরিবারটির। পরিবারের বড় ছেলের মৃত্যুতে তাই সংসার চালাতে বেশ হিমসিম খেতে হচ্ছে তাঁর বাবা মঞ্জিল খাঁনের। শহীদের ছোট ভাই মোঃ মাহবুব খাঁন জানান, "পরিবারের সাপ্তাহিক বাজার আর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ ছাড়াও আমার লেখাপড়ার জন্য টাকা দিতেন আমার বড় ভাই। তাঁর অবর্তমানে আমার পড়াশোনার খরচ যোগাতে সংসারে টানাপোড়েন চলে।"

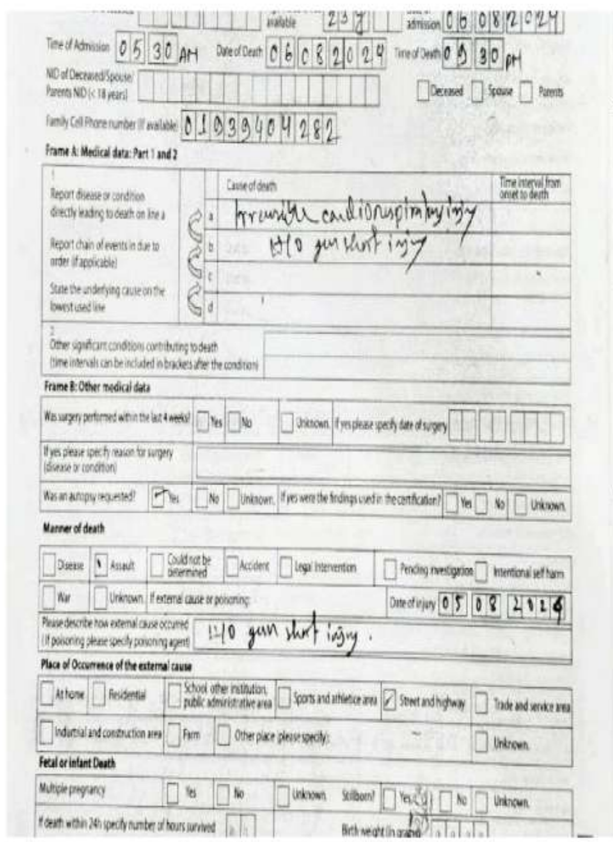

available 23 Y admission 06 08 2024
Time of Admission 05 30 AM Date of Death 06 08 2024 Time of Death 05 30 PM
NID of Deceased/Spouse/ Parents NID (< 18 years) ☐ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents
Family Cell Phone number (if available) 01093404282

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a		
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	gun shot injury	
State the underlying cause on the lowest used line	c		
	d		
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks?	☐ Yes	☐ No	☐ Unknown	If yes please specify date of surgery
If yes please specify reason for surgery (disease or condition)				
Was an autopsy requested?	☑ Yes	☐ No	☐ Unknown	If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Manner of death

☐ Disease ☑ Assault ☐ Could not be determined ☐ Accident ☐ Legal Intervention ☐ Pending investigation ☐ Intentional self harm
☐ War ☐ Unknown If external cause or poisoning: Date of injury 05 08 2024
Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent) gun shot injury.

Place of Occurrence of the external cause

☐ At home ☐ Residential ☐ School, other institution, public administrative area ☐ Sports and athletics area ☑ Street and highway ☐ Trade and service area
☐ Industrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify): ☐ Unknown

Fetal or infant Death

Multiple pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown Stillborn? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
If death within 24h specify number of hours survived Birth weight (in grams)

এক নজরে শহীদ মো: সুজন খাঁন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ

নাম	: মোঃ সুজন খাঁন
জন্ম তারিখ	: ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৪
পেশা	: পাটকল শ্রমিক
পিতার নাম	: মনজিল খাঁন
পিতার পেশা ও বয়স	: ট্রলারে পণ্যপরিবহন, ৫৫ বছর
মাতার নাম	: নুর জাহান বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৫০ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: ১০০০০ টাকা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম, পেশা ও প্রতিষ্ঠান

শহীদের ছোট ভাই	: মোঃ মাহবুব খান, তুলারাম কলেজের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ছাত্র
শহীদের ছোট বোন	: মোসা: খাদিজা আক্তার, গৃহিণী
ঘাতক	: সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুলিশ ও স্থানীয় বিজিবি সদস্যরা
নিহত হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল আনুমানিক ৫টা, জালকুড়ি বাসস্ট্যান্ড মোড় সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
শহীদের কবরের অবস্থান	: জালকুড়ি ঈদগাঁহ সংলগ্ন কবরস্থান, ৯ নম্বর ওয়ার্ড জালকুড়ি সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: জালকুড়ি, ওয়ার্ড নম্বর: ০৯, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা: সিদ্ধিরগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খাঁন বাড়ি হাশেমপুর, ইউনিয়ন: এখলাসপুর, উপজেলা: মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক বা একাধিক প্রস্তাবনা

১. শহীদের দরিদ্র পিতাকে এককালীন কিছু অর্থ সহযোগিতা করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে সহযোগিতা করা

৩. শহীদের কলেজ পড়ুয়া ছোট ভাইয়ের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ কবির

ক্রমিক : ১৭৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪১

শহীদ মোঃ কবিরের পরিচয়

মোঃ কবির একজন সম্মানিত ও ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসেবে সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং মূলত ম্যান পাওয়ারের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি মানবসেবা এবং পরোপকারে আগ্রহী ছিলেন, যা তাঁকে সমাজে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।তিনি গাজীপুর জেলার টঙ্গী পৌরসভার মধ্য আরিচপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর পিতা মৃত মোজাহার আলী এবং মাতা মোছাঃ আমেনা খাতুন, যাঁর বয়স বর্তমানে ৭০ বছর। পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রায় ২০,০০০ টাকা। মোঃ কবিরের জনহিতকর কাজ এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা তাঁকে সমাজে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলেছিল।মোঃ কবির ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর অনুগ্রহে অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতি তাঁর পরিবার ও সমাজের জন্য এক বিশাল শূন্যতা।

যেভাবে ফুলটি ঝরে গেলো

মোঃ কবিরের জীবনকাহিনি যেনো এক সংগ্রামী মানুষের প্রতিচ্ছবি। কুষ্টিয়ার মাটিতে তার জন্ম হলেও জীবনের অধিকাংশ সময়

কাটিয়েছেন গাজীপুর জেলার টঙ্গীর আরিচপুরে। তার পিতা মৃত মোজাহার আলী ও ৭০ বছরের বৃদ্ধা মাতা আমেনা খাতুনের স্নেহছায়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একজন আদম ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে তাকে অর্থনৈতিক দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো–ব্যবসায়িক ঋণ, টঙ্গী বাজারে টিনশেড বাড়ি নির্মাণ, এবং লোকসানের কারণে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। এছাড়া, মানুষের কাছে থাকা ১ কোটি টাকা পাওনা থাকলেও, অন্যরাও তার কাছে প্রায় সমপরিমাণ টাকা দাবি করতো।

পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায়, তার দুই শিশু সন্তান, আসাদুল্লাহেল গালিব (১৩) এবং নাহিয়ান বিন গালিব (১০), যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতো, তাদের জীবনেও অর্থনৈতিক দুর্যোগের কালো ছায়া নেমে এসেছিল। নিজের পরিবার, ঋণের বোঝা এবং জীবনের কঠিন বাস্তবতা সত্ত্বেও মোঃ কবির ছিলেন অত্যন্ত মানবিক ও সামাজিক কাজে নিবেদিতপ্রাণ। তিনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন, পরোপকারে নিজেকে উৎসর্গ করতেন, আর মানুষ তাকে ভালোবাসতো তার জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা এবং বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের কারণে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে দেশজুড়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন বৈষম্যবিরোধী জনআন্দোলনে রূপ নেয়, তখন মোঃ কবিরও এতে অংশ নেন। প্রথমদিকে এটি সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও, পরে এটি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। মানুষের ক্ষোভ, বঞ্চনা, ও অধিকার আদায়ের দাবিতে উত্তাল জনতা রাজপথে নেমে আসে। শেখ হাসিনার সরকার জনতার ক্রমাগত চাপের মুখে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেই পদত্যাগের পূর্বেই তিনি অনেক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তার ঘৃণ্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে যান।

মোঃ কবির সেই আন্দোলনের একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে সেদিন রাজপথে নেমেছিলেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টার দিকে ছাত্র-জনতার সাথে তিনি সরকার পতনের দাবিতে উত্তাল জনস্রোতের অংশ হন। উত্তরার আজিমপুর এলাকায় আমির কমপ্লেক্সের সামনে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে তার মুখে গুলি লেগে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আহত অবস্থায় তাকে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহীদ মোঃ কবিরের মৃত্যু ছিলো একটি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নির্মম বাস্তবতা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি দেশের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। তার মতো একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, যিনি পরিবার, ঋণ, এবং জীবনের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে ছিলেন, সেই মানুষটি দেশ ও মানুষের অধিকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তার মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের নয়, বরং পুরো জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। মোঃ কবিরের মতো একজন মানুষ, যিনি জীবনের কঠিন সংগ্রাম করেও কখনো পিছপা হননি, দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে তার মানবিকতা, দায়িত্ববোধ, এবং সাহসিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ মোঃ কবির ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ, যার জীবন ছিলো

সৎকর্ম এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মোঃ আজিমুদ্দিনের বর্ণনায় জানা যায়, মোঃ কবির তার এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং সম্মানিত ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবসময় সমাজের কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন।

তিনি সমাজের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন এবং অন্যদেরও সহযোগিতা করতেন। তার এই গুণাবলীর জন্য তিনি এলাকার সকলের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। মোঃ কবির ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কখনো কারো সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি গরীব, অসহায়, এবং বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন।তার এই পরোপকারী মনোভাব এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ তাকে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ মোঃ কবির মূলত জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ম্যানপাওয়ার সাপ্লাই। তার ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ রয়েছে। তার পরিবার ভাড়া বাসায় থাকে। টঙ্গী বাজার শেরে বাংলা রোডে ১.৫ কাঠার মত জমি রয়েছে। সেই জমিতে টিনশেড বাড়ি নির্মাণাধীন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: কবির
পেশা	: ব্যবসায়ী, ম্যান পাওয়ারের ব্যবসা করতেন।
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: মধ্য আরিচপুর, টঙ্গী পৌরসভা, টঙ্গী, গাজীপুর
পিতার নাম	: মৃত মোজাহার আলী
মাতার নাম	: মোছা: আমেনা খাতুন, বয়স: ৭০
মাসিক আয়	: ২০০০০/-

পরিবারের অন্য সদস্যদের পরিচিতি

ছেলে	: আসাদুল্লাহিল গালিব, বয়স- ১৩ বছর, শিক্ষার্থী: মিরাসপাড়া হামিদিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রেণী: সপ্তম
ছেলে	: নাহিয়ান বিন গালিস, বয়স -১০ বছর, মিরাসপাড়া হামিদিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রেণি: ৫ম
ভাই	: মো: কামরুল ইসলাম, বয়স: ৩৫ বছর
ঘটনার স্থান	: আমিরত কমপ্লেক্স, আজমপুর, ঢাকা
আক্রমণকারী	: সশস্ত্র বাহিনী
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৫/০৮/২০২৪ ইং, সময়: বিকাল: ৪টা, আজমপুর

শহীদ মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন

ক্রমিক : ১৭৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪২

পরিচিতি নাই

মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন (২০) ১০ মার্চ ২০০৪ সালে গাজীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম জাহাঙ্গীর আলম এবং মায়ের নাম পারভীন বেগম। আবদুল্লাহ আল মামুন কওমী মাদরাসার পাশাপাশি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। মাদরাসার ছাত্রদের সাথে নিয়ে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। দেশবাসী ভেবেছিল কোটা বিরোধী আন্দোলন শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বৈরশাসকের অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। ন্যায়ের পক্ষে থেকে মামুন ও তার সাথীরা এমন ধারণার অবসান ঘটান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দেন এদেশকে রক্ষার জন্য মাদরাসার ছাত্রদের অবদান কোন অংশে কম নয়। ৪ আগস্ট তিনি আন্দোলন থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক অনুসন্ধানের পরে ৫ আগস্ট তাকে একটি হাসপাতালে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

কুরআনপ্রেমী তালেবে এলেম শহীদ মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন ছিলেন একজন কুরআনপ্রেমী তালেবে এলেম। ২৫ পারা কুরআন মুখস্থ ছিল তার। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের অবদান অনস্বীকার্য। যদিও মিডিয়ায় তাদের অবদান তেমনভাবে দেখানো হয়নি। তারা শাহাদাতে তামান্না আর বুকে তাকবিরের স্লোগান ধারণ করেই এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূলত এই আন্দোলন মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, পাবলিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট, ইংলিশ মিডিয়ামসহ সকল শ্রেণি পেশার মুক্তিকামী জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। জুলাই বিপ্লব ছিল সর্বস্তরের সকল নিপীড়িতের চূড়ান্ত সম্মিলিত বিক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ। এই গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আপামর জনতা এবং অগ্রভাগে ছিল শহীদ, আহত ও পঙ্গুত্ব বরণকারী ভাইয়েরা।

খোদা প্রদত্ত জানকে কোরবানি করে তারা সাম্য ও ইনসানিয়াতভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার জিম্মাদারি আমাদের হাতে অর্পণ করে গেছেন ৩৬ জুলাইয়ের সকল শহীদ।

৩৬ দিনের এই আন্দোলন তাই পৃথিবীর অনন্য একটি ইতিহাস হয়েই থাকবে। ১৬ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শহীদ আবু সাঈদ। এরপর থেকেই দেশজুড়ে আন্দোলন সর্বব্যাপী রূপে পরিগ্রহ করে।

স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস। হন্তারক শাসক গোষ্ঠীর নির্মম গণহত্যা আর বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে স্লোগান উঠে---

বুকের ভিতর অনেক ঝর
বুক পেতেছি গুলি কর।
আমার খায়, আমার পরে
আমার বুকেই গুলি করে।
তোর কোটা তুই নে,
আমার ভাই ফিরিয়ে দে।
দেয়ালে দেয়ালে লেখা হয়--

বন্দুকের নলের সাথে ঝাঁজালো বুকের সংলাপ হয় না' এবং 'লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে। ৩ আগস্ট ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ থেকে শোনা যায়, 'আমার ভাই কবরে, খুনিরা কেন বাইরে'; 'আমার ভাই জেলে কেন' এবং 'গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না'–এসব স্লোগান।

সায়েন্স ল্যাব মোড়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল থেকে শোনা যায়, 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস'; 'জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো' এবং 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত'–এর মতো স্লোগানগুলো তাছাড়া নারায়ে তাকবির আল্লাহু হু-আকবার শ্লোগান ছিল জালেমদের বুকে ভয় জাগানিয়া বজ্র ধ্বনি। বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় তাওহীদি জনতা এই আন্দোলনে শরীক হয়।

নারায়ে তাকবির
আল্লাহু আকবর।
মরলে শহীদ
বাঁচলে গাজী
আমরা সবাই
মরতে রাজি।
আমরা সবাই
রাসূল সেনা
ভয় করি না
বুলেট বোমা।

এই সমস্ত স্লোগানে উজ্জীবিত ছিল বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় মানুষ

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এমনই একজন শহীদ। যারা শিরায় শিরায় রক্ত কণায় একত্ববাদের বীজ। একত্ববাদী ইসলাম প্রিয় অনেক শহীদদের মধ্যে অন্যতম একজন শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন। শহীদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন ২০০৪ সালের ১০ মার্চ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক আন্দারমানিক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পেশায় একজন প্রবাসী এবং বয়স ৫০ বছর এবং মাতা মোসাম্মৎ পারভীন বেগম ৪০ বছর বয়সী গৃহিণী।

সে এলাকায় নম্র ও ভদ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। হাতের লেখা সুন্দরের জন্য সে পুরস্কার পায় এবং ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করে। পরবর্তীতে সে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতো। কওমি মাদ্রাসার পড়াশোনার পাশাপাশি ২০২১/২২ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সৎ, আদর্শবান হিসেবে পরিচিত এবং এলাকাবাসীর কাছে প্রিয় মুখ ছিল। উল্লেখযোগ্য সে ২৫ পারা হাফেজে কুরআন ছিল।

নিম্নবিত্ত পরিবারের হওয়ার কারণে সে লেখাপড়ার পাশাপাশি গার্মেন্টসে চাকরি করতো। পিতা ঋণগ্রস্ত থাকায় ছেলের লাশ দেখতে দেশে আসতে পারেনি। আর দুই বোন। তারা প্রায়ই দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণে জর্জরিত।

যেভাবে শহীদ হয়

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের

গুলিতে শহীদ হয় মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা।

৪ আগস্ট ২০২০ রবিবার সাড়ে বারোটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে আব্দুল্লাহ আল মামুন যান। মিছিলটি সফিপুর আনসার একাডেমীর সামনে গেলে তার সাথে পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ৫ আগস্ট গাজীপুর সদর হাসপাতালে মর্গে তার ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তার মরদেহ পাওয়া যায়। শহীদের বুকে হাঁটুতে এবং কোমড়ে গুলির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, মিছিলে স্বৈরাচারী সরকারের সশস্ত্র আনসার বাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং গোলাগুলির একপর্যায়ে আব্দুল্লাহ আল মামুন গুলিবিদ্ধ হয়। নির্মম ঘাতক বাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি করার কারণে শহীদের শরীরে একাধিক গুলি পাওয়া যায়। এর আগে ছাত্র জনতা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে রেখে আসে। জানাযার নামাজ শেষে নিজ এলাকা আন্ধারমানিকে লস্করচালা যৌথ কবরস্থানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

গত ৪ আগস্ট দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে শহীদের বড় বোন তাকে ফোন দিলে এক অজ্ঞাত মহিলা ফোন রিসিভ করে, আব্দুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা জানায়।

শহীদ আব্দুল্লাহ্র শিক্ষক রাসেল আহমেদ প্রিয় ছাত্রের অকাল মৃত্যুতে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষক হিসেবে গর্বে আমার বুকটা ভরে যায়। যখন ভাবি আমাদের স্কুলের একজন সাবেক ছাত্র দেশের সন্ত জুলুম, নিপীড়ন, দুর্নীতি অন্যান্য সকল অন্যায় দ্বারা আক্রান্ত বাংলাদেশকে আলকিত করার জন্য শহীদ হয়। ছেলে হিসেবে, সে আমার দেখা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চাইতে সৎ আদর্শবান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর অটল। আমি এবং এলাকাবাসী শহীদের সঠিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় সম্মাননা চায়।

উল্লেখযোগ্য তিনি পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। আশরাফিয়া মাদ্রাসায় কিতাবখানায় পড়াশোনা করতেন।

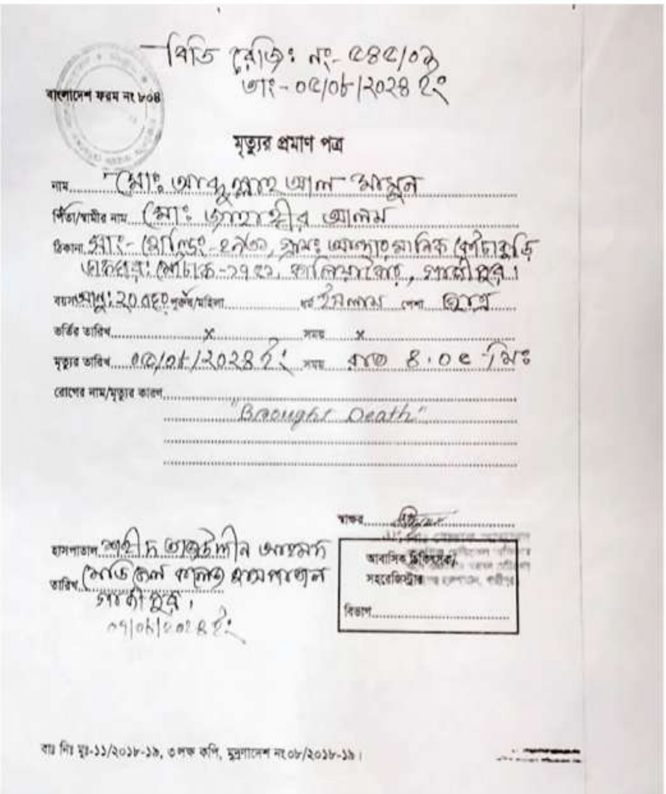

বিডি রেজি: নং- ৫৪৫/০৩
তাং- ০৫/০৮/২০২৪ ইং

বাংলাদেশ ফরম নং ৮০৪

মৃত্যুর প্রমাণ পত্র

নাম "মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন

পিতা/স্বামীর নাম মো: জাহাঙ্গীর আলম

ঠিকানা [illegible], গ্রাম: আন্দারমানিক [illegible] ডাকঘর: মৌচাক-[illegible], কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

বয়স ২০ বছর পুরুষ/মহিলা ... ধর্ম ইসলাম পেশা ছাত্র

ভর্তির তারিখ x সময় x

মৃত্যুর তারিখ ০৫/০৮/২০২৪ ইং সময় রাত ৪.০৫ মি:

রোগের নাম/মৃত্যুর কারণ "Brought Death"

স্বাক্ষর

হাসপাতাল শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গাজীপুর।

তারিখ ০৭/০৮/২০২৪ ইং

আবাসিক চিকিৎসক
সহরেজিস্ট্রার

বিভাগ

বাঃ নিঃ মুঃ-১১/২০১৮-১৯, ৩ লক্ষ কপি, মুদ্রণাদেশ নং০৮/২০১৮-১৯।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন (২০)
পেশা	: শিক্ষার্থী
ঠিকানা	: আন্দারমানিক, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
জন্ম তারিখ	: ১০/০৩/২০০৪
পিতা	: মো: জাহাঙ্গীর আলম (৫০)
পিতার পেশা	: প্রবাসী
মাতার নাম	: মোছা: পারভীন বেগম (৫০)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের ভাই বোন	: তানিয়া আক্তার (২৪), তামান্না আক্তার (১৬)
পারিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
পারিবারিক আয়	: ২৫০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: আনসার বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: সফিপুর আনসার একাডেমি, গাজীপুর
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৪-০৮-২০২৪, সময় জানা নেই, সফিপুর আনসার একাডেমি
শহীদের কবরের অবস্থান	: আন্ধারমানিক লস্করচালা যৌথ কবরস্থান

যেভাবে সহযোগিতা করা যায়

১. ঋণ পরিশোধ
২. প্রবাসী বাবাকে দেশে আনা
৩. বাবার কর্মসংস্থান

লাল জুলাইয়ে হাফেজ শহীদ শরিফুল ইসলাম

শহীদ হাফেজ মো: শরিফুল ইসলাম

ক্রমিক : ১৭৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪৩

শহীদের পরিচয়

শহীদ হাফেজ মো: শরিফুল ইসলাম গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার কেওয়াপাড়া পশ্চিম খন্ড গ্রামে ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শুকুর আলী এবং মাতার নাম কুলসুম আক্তার। পাঁচ ভাইবোন সহ পরিবারের মোট সদস্য সাত জন।

শহীদ শরিফুল পড়ালেখা করতেন চন্নাপাড়া দাওয়াতুস সুন্নাহ মাদ্রাসা দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে। তিনি সুন্দর তেলাওয়াতে পারদর্শী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী শরিফুল সমাজের কাছে আলাদা ভাবেই পরিচিত ছিল। বড় হয়ে ইসলামিক স্কলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন।

শহীদের পিতা ছিলেন ছোট মুদি ব্যবসায়ী। সাতজনের পরিবারের খরচ মুদি দোকানের মাধ্যমে চলতে কষ্ট হওয়ায় শরিফুল টিউশন করতেন। ছোট দুই ভাই এবং মেজো বোন শিক্ষার্থী হওয়ায় তাদের পেছনে পড়ালেখা বাবদ অনেক খরচ হয়।

৩৬ জুলাই তথা ৫ আগস্টের গণবিপ্লবে একটি ঘৃণিত সরকারের পতন ঘটে। জুলাইয়ের এই আন্দোলনে তালেবে এলেমদের অবদান ছিল চোখে পড়ার মত। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কাওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম নিষ্ঠুরতা চালায়। ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানী মতিঝিলের শাপলা চত্বরে রাতের অন্ধকারে গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ছুড়ে হত্যা করা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম নিবন্ধন সনদ

শরিফুল ইসলাম

26-06-23

26-06-23

হয় নিরীহ মাদ্রাসার ছাত্রদের। তাছাড়া বিভিন্ন সময় মাদ্রাসার ছাত্রদের দিয়ে সাজানো হতো বিভিন্ন জঙ্গি নাটক। একারণে মাদ্রাসার ছাত্ররা ছিল আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে অনেক জায়গায় হতে দেয়া হয়নি কুরআনের তাফসির মাহফিল কিংবা ধর্মীয় কোন আয়োজন। কথায় কথায় জামায়াত-শিবির ট্যাগ দিয়ে ভন্ডুল করে দেয়া হতো ধর্মীয় সভা ও অনুষ্ঠানগুলো। নারায়ে তাকবির স্লোগানকে জঙ্গিবাদীদের স্লোগান আর দাড়ি টুপিকে করা হয় সন্ত্রাসীদের লেবাসে পরিণত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালায় তারা। নাটকে, চলচ্চিত্রে, উপন্যাসে সরকারি অর্থ বরাদ্দ করে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের দানব আকারে তুলে ধরার অপচেষ্টা চালায় দীর্ঘ আওয়ামী শাসন আমলে। তাই সরকার বিরোধী যেকোনো আন্দোলনে মাদ্রাসার ছাত্রদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত।

মুখে নরায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর শ্লোগান আর বুকে শহীদ হওয়ার তামান্না লালন করেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে জুলাই আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের এই আন্দোলনে। ৫ আগস্ট জনরোষে পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন তখনও অব্যাহতভাবে চলে পুলিশ, বিজিবি, আনসার, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলা। নিহত আহত হতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। ঐতিহাসিক সেই দিনের তেমনি একজন শহীদ হাফেজ মোঃ শরিফুল ইসলাম।

যেভাবে শহীদ হয়

বাংলাদেশে সংঘটিত ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় মুক্তিকামী জনতা।

স্বৈরাচার সরকারের ঘাতক বাহিনী যখন ছাত্রদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল হাফেজ শরিফুল নিজের জীবন বাজি রেখে আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন । আন্দোলন যখন শেষ পর্যায়ে ,৫ আগস্ট দুপুরে তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন । গাজীপুর জেলার মাওনা চৌরাস্তার অবদান মোড়ে যখন মিছিল নিয়ে আসছিলেন হঠাৎই স্বৈরাচারী সরকারের মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী এবং সন্ত্রাসী বিজিবি আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। সবাই যখন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে হাফেজ শরিফুল মিছিলের সামনেই ছিল । হঠাৎ একটি গুলি এসে তার বুকের ডান পাশে বিদ্ধ হয় । এরপর তিনি ঘটনাস্থলেই পড়ে যান । অমানবিক বিজিবি সেনারা তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তার মাথায় গুলি করে । ঘটনাস্থলেই চিরনিদ্রায় চলে যায় হাফেজ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম । শহীদের পিতা ঐদিন রাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আল-হেরা মেডিকেল সেন্টারে তার লাশ খুঁজে পায় । তরুণ মেধাবী ছেলের লাশ দেখে পিতা সহ্য করতে পারে না, কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরবর্তীতে নিজ এলাকায় মাদ্রাসা মাঠে পরদিন সকালে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদের প্রতিবেশী মোঃ কাওছার তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান; আমার জানা মতে, শরিফুল ইসলাম খুবই ভালো একজন মানুষ ছিল। সে একজন কুরআনে হাফেজ ছিলো। সে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো এবং রমজানে তারাবির নামাজ পড়াতেন। সে এলাকার ছোট বড় সবার খোঁজ খবর রাখতো। আমি দুয়া করি আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
(বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)

প্রবেশপত্র

নিবন্ধন নং : ১৩৮৭০

মারহালা : হিফযুল কুরআন

রোল নং : ১৩০০৯

মাদরাসা : চন্নাপাড়া দাওয়াতুস সুন্নাহ মাদরাসা, চন্নাপাড়া, গাজীপুর শ্রীপুর, গাজীপুর

পরীক্ষার্থীর নাম : মো: শরিফুল ইসলাম

জন্ম তারিখ : ০২/০৪/২০০৩ ঈ:

পিতার নাম : মো: শুক্কুর আলম

মারকায : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম কওমী মাদরাসা, মাওনা চৌরাস্তা, গাজীপুর শ্রীপুর, গাজীপুর

(মুফতী আবু ইউসুফ)

Name MD. SHORIFUL ISLAM

Date of Birth: 02 Apr 2004

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: হাফেজ মো: শরিফুল ইসলাম (২০)
পেশা	: ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: কেওয়াশপশ্চিম খণ্ড, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর
জন্ম তারিখ	: ০২/০৪/২০০৪
পিতা	: শুক্কুর আলী (৫৯)
পেশা	: ব্যবসা
মাতার নাম	: কুলসুম আক্তার
পেশা	: গৃহিণী

শহীদের ভাই-বোন

বোন	: মোছা. জান্নাত (২৫)
বোন	: মোছা. রাবেয়া (২২)
ভাই	: আরিফুল ইসলাম (১৮)
পারিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
পারিবারিক আয়	: ৭০০০ টাকা

যেভাবে সহযোগিতা করা যায়

১. বাবা মায়ের চিকিৎসার ব্যয় বহন
২. ভাই বোনদের পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ
৩. বাবা মাকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

ইফতারি কিনে আর ফেরা হয়নি শহীদ তাজুলের

শহীদ মো: তাজুল ইসলাম

ক্রমিক : ১৭৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪৪

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: তাজুল ইসলাম ১৯৬৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা জেলার ডিমডুলে নিন্দুলে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক স্বচ্ছলতার জন্য তিনি ঢাকায় আসেন এবং উত্তরার আজমপুরে বন্ধুর সাথে যৌথভাবে 'কুমিল্লা রেন্ট-এ কার'-এর ব্যবসা শুরু করেন। উনার স্ত্রী সপ্তম শ্রেণী পাস ও পেশায় একজন গৃহিণী। কন্যা দুজন বিবাহিত। ১৮ বছর বয়সী একটি ছেলে সন্তান আছে। সন্তানের নাম রেদওয়ান সিয়াম। সে সেলাইয়ের কাজ শিখছে।

শহীদের পরিচয়

রাজধানী ঢাকার অন্যান্য স্থানের মত উত্তরায় হতাহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে অনেক বেশি। তাই উত্তরাকে বলা যায় দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ব্যাটেল গ্রাউন্ড। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৮ জুলাই ঘোষিত হয় "কমপ্লিট সাটডাউন" কর্মসূচির। সেদিন উত্তরার আজমপুর ও আশপাশের এলাকায় জড়ো হয় হাজার হাজার আন্দোলন কারী। উত্তরার এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে

মানারাত, নর্দান উত্তরা ইউনিভার্সিটি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ আশপাশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। প্রথম থেকেই আন্দোলনে হেলমেট পরিহিত আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠি, হকিস্টিক হাতে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সন্ত্রাসীদের হামলা করতে দেখা যায়। তাছাড়া অত্যন্ত মারমুখী ছিল পুলিশ, র‌্যাব ও আনসার সদস্যরা। ১৮ জুলাই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ডাকা 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় পুলিশ এবং আগ্নেয়াস্ত্র, রড, লাঠি, বাঁশ নিয়ে ছাত্রলীগ হামলা করলে ১৮ জুলাই সারা দেশে অন্তত ২৯ জন নিহত হন এবং আহত হন অন্তত তিন হাজার। নিহতদের মধ্যে ২৩ জনই ঢাকার। এ ছাড়া, চট্টগ্রামে দুইজন, নরসিংদীতে দুইজন, মাদারীপুরে একজন ও সিলেটে একজন নিহত হন। এত এত খুনের ঘটনায় মজলুম মানুষের আহাজারিতে রোনাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত ১৮ জুলাই সহিংসতার দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তাজুল ইসলাম নামের রেন্ট কার ব্যবসায়ী। ওই দিন বিকেলে কোটা বিরোধীদের সঙ্গে র‌্যাব পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে উত্তরা আজমপুর আমির কমপ্লেক্সের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি নিহত হন। তার একমাত্র ছেলে রেদোয়ান আহমেদ সিয়ামের ভাষ্য 'সেই দিন বাবা আশুরার রোজা ছিলেন, সারাদিন রেন্ট-এ কারের পাশে উত্তরার একটি মসজিদের ভেতর ছিলেন। বিকালে ইফতারি নিয়ে বাসায় ফিরবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আর ফেরা হয়নি। গুলিতে বাবার বুকটা ঝাজরা হয়ে যায়। বুকের ভেতর গুলি রেখেই ময়নাতদন্ত ছাড়া পরদিন তাকে কুমিল্লার বরুড়া উপজেলা উত্তর শিলমুড়ি ইউনিয়নের গামারোয়া গ্রামে দাফন করা হয়।'

শহীদ মো: তাজুল ইসলাম ৪ কাঠা জমির উপরে একটি টিনশেড বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যংক থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার পরিবারের কোন আয় নেই। ঋণে জর্জরিত পরিবারটি দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছেন।

যেভাবে শহীদ হয়

১৮ জুলাই ২০২৪ বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় শহীদ তাজুল ইসলাম নিজ বাড়ি কালিগঞ্জ হতে উত্তরা কর্মস্থলে রোজা অবস্থায় আসরের নামাজ পড়ে ইফতারের জন্য কিছু কেনাকাটার জন্য বের হন। তখন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পালিত সন্ত্রাস বাহিনী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের গুণ্ডারা জনতার উপর এলোপাথাড়ি আক্রমণের ফলে মোহাম্মদ তাইজুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হন এবং ছাত্র-জনতা প্রথমে আহত অবস্থায় উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে তাকে উদ্ধার করে উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

ব্যক্তি হিসেবে ভালো ছিলো। এলাকায় সবার কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলো। নম্র,ভদ্র ও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিল। নামাজের বিষয়ে ছিলেন সদা সচেতন। একজন আদর্শবান, দ্বীনদার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। আল্লাহ যেন তার শাহাদাত কবুল করেন।

সেদিনের পরিস্থিতির বর্ণনা করে সিয়াম বলেন, 'তখন হাসপাতালে রক্তাক্ত অনেক মানুষের চিৎকার আর আহাজারিতে দিশেহারা হয়ে পড়ি। এ বয়সে এত রক্ত কখনও দেখিনি। সিয়ামের ভাষ্য, আমার বাবার তো কোনও অপরাধ ছিল না। তিনি কোটা আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে ছিলেন না। তাকে কেন গুলি করে মারা হলো? এখন কীভাবে চলবে আমাদের সংসারের খরচ। সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই। কার কাছে বিচার চাইবো? বাবার মৃত্যুর শোকে মাও এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

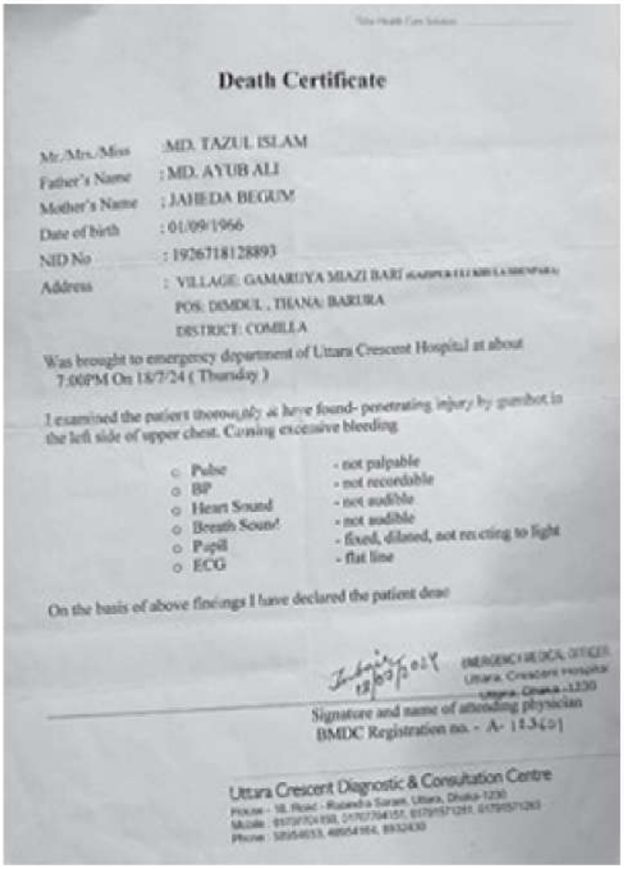

Death Certificate

Mr./Mrs./Miss : MD. TAZUL ISLAM
Father's Name : MD. AYUB ALI
Mother's Name : JAHEDA BEGUM
Date of birth : 01/09/1966
NID No : 1926718128893
Address : VILLAGE: GAMARUYA MIAZI BARI
POS: DIMDUL , THANA: BARURA
DISTRICT: COMILLA

Was brought to emergency department of Uttara Crescent Hospital at about 7:00PM On 18/7/24 (Thursday)

I examined the patient thoroughly & have found- penetrating injury by gunshot in the left side of upper chest. Causing excessive bleeding

- Pulse - not palpable
- BP - not recordable
- Heart Sound - not audible
- Breath Sound - not audible
- Pupil - fixed, dilated, not reacting to light
- ECG - flat line

On the basis of above findings I have declared the patient dead

Signature and name of attending physician
BMDC Registration no. - A- 113401

Uttara Crescent Diagnostic & Consultation Centre

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh

নাম: মোঃ তাজুল ইসলাম
Name: Md. Tazul Islam

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: তাজুল ইসলাম (৫০)
পেশা	: ব্যবসায়ী
স্থায়ী ঠিকানা	: গামারুয়া মিয়াজী, ডিমডুল, বরুরা, কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা	: বাইমারডান্দা, নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
জন্ম তারিখ	: ০১/০৯/১৯৬৬
পিতা	: মৃত মো: আইয়ব আলী
মাতার নাম	: মৃত মোছা: জাহেদা বেগম
শহীদের ছেলে-মেয়ে	: ১. রিদওয়ান সিয়াম (১৮), ২. জান্নাতুল ফিরদাউস (২৫), ৩. নুসরাত জাহান লিমা(২০)
পারিবারিক আয়	: ১৫০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত
আহত হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: উত্তরা আমীর কমপ্লেক্স সংলগ্ন, ১৮-০৭-২০২৪, সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৮-০৭-২০২৪, বিকাল ৬.৪৫ মিনিট, ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, উত্তরা
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ পারিবারিক কবরস্থান, কুমিল্লা

যেভাবে সহযোগিতা করা যায়

১. ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২. ১৫ লাখ টাকা ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে সহযোগিতা করা যায়
৩. পরিবার চালানোর ব্যবস্থা করা

মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় গুলিবিদ্ধ হন জাকির

শহীদ মোঃ জাকির হোসেন

ক্রমিক : ১৭৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪৫

শহীদ পরিচিতি

মোঃ জাকির হোসেনের জন্ম ১৯৮৮ সালের ৬ জুন, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার চর দুর্লভ খাঁ গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী, পরিশ্রমী ও সাহসী। বাবা আব্দুস সামাদ ছিলেন একজন সৎ কৃষক, আর মা মোমেনা বেগম ঘর সামলানোর পাশাপাশি সন্তানদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। জাকির হোসেন পারিবারিক দায়িত্ব নিতে খুবই দক্ষ ছিলেন, আর তার সেই দায়িত্ববোধই তাকে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলে।

জাকির হোসেন গাজীপুরের কাজী ভিআইপি গার্মেন্টসের যৌথ সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। ছোট একটি ব্যবসা থেকে শুরু করে তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপে পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নতি করেছিলেন। তার ছিল একটি ছোট্ট পরিবার। সাত বছর বয়সী ছেলে আব্দুর রহমান ও দুই বছরের ছোট্ট ছেলে বাইজিদ। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখী জীবনযাপনের স্বপ্ন ছিল তার, কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই সব কিছু থেমে যায়।

আন্দোলনের প্রেক্ষপট

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই ছিল জাকিরের জীবনের এক ভয়াবহ দিন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা তখন সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল আর উত্তরা ছিল পুলিশের বেপরোয়া গুলির ক্ষতবিক্ষত। ব্যবসায়িক কাজে গিয়েছিলেন উত্তরায়, কিন্তু সে কাজ শেষ করে ফিরে আসার সময় তার জীবন থেমে যায় পুলিশের গুলিতে। বিকাল ৩:৩০ টায় হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষিপ্ত পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলি তার পিঠে বিদ্ধ হয়। আশেপাশের মানুষজন তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান, কিন্তু ২১ জুলাই ভোর ৪:৩০ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ জাকির হোসেনের মৃত্যু তার পরিবারের জন্য যেমন এক শোকের ঘটনা, তেমনি তার দুই ছোট সন্তানের জন্য অনিশ্চয়তা ও কষ্টের জীবন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার পিঠে পাওয়া গুলির চিহ্ন এখনো তার আত্মত্যাগের নীরব সাক্ষী। তার নামে থাকা ৫ শতাংশ জমির মধ্যে ছোট একটি বাড়ি ছাড়া আর কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই। এছাড়া ব্যবসার জন্য নেওয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঋণও রয়েছে।

আজ তার দুই ছেলের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত। তার স্ত্রী, যিনি একসময় স্বামীকে সাপোর্ট দিয়ে সংসার সামলাতেন; এখন অসহায় আর নিরুপায় পরিস্থিতির সম্মুখীন।

শহীদ মো: জাকির হোসেনের আত্মত্যাগ কেবল তার পরিবারকেই নয়, সমগ্র জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার সংগ্রামে, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য তার মতো হাজারো সাহসী মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। তার মৃত্যু আমাদের মনে গভীর শোকের জন্ম দেয়, তবে তার এই আত্মবলিদান আমাদের মনোবল আরও দৃঢ় করে তোলে।

ঘটনার বিবরণ

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবারের সেই দিনটি ছিল শহীদ মো: জাকির হোসেনের জীবনের শেষ দিন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন সারা দেশে বিক্ষোভের দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছিল। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমে আসছিল। তবে পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছিল, কারফিউ জারি ছিল, ইন্টারনেট এবং সকল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ। কোথায় কী ঘটছে, কেউই সঠিকভাবে জানতে পারছিল না।

ঘটনার দিন নিজের কারখানার জন্য কোনাবাড়িতে কিছু মালপত্র কিনতে গিয়েছিলেন জাকির হোসেন। পরে দুপুরে একজন ক্রেতার সঙ্গে দেখা করতে রাজধানীর উত্তরার দিকে রওনা হন। পথে আব্দুল্লাহপুরে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় রাজধানীতে নানা স্থানে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের ব্যাপক হামলা চলছিল। দেশের পরিস্থিতি ভালো না ভেবে ছেলে জাকির হোসেনকে (৩৮) কল দেন তাঁর মা মোমেনা বেগম। ছেলেকে বাইরে যেতে মানা করেন। কথার একপর্যায়ে হঠাৎ বিকট আওয়াজ পান মা। এরপর আর ছেলের কোনো কথা শুনতে পাননি তিনি।

তখনই ঐ এলাকায় পুলিশের আগ্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিতে বৃষ্টির মত গুলি ছোড়ে স্বৈরাচারী সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পর পর দুটি গুলি এসে পিঠে ও পেটে লাগলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে পড়ে যান জাকির হোসেন। সেখান থেকে হাসপাতালে নেওয়া হলে ১৪ ঘণ্টা পর মারা যান তিনি। পথচারীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর এই লড়াইয়ে তিনি হার মানেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ জুলাই ২০২৪, ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে শহীদ জাকির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হেলিকপ্টার থেকে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছিল। আর সেই গুলিতেই প্রাণ হারান শহীদ জাকির। তাঁর পিঠে গুলি বিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাকিরের পরিবার যখন তার মৃত্যুর সংবাদ পায়, তখন তারা শোকের সাগরে ভাসছিলেন। একটি সাধারণ কাজে বেরিয়ে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি আর কখনও ফিরবেন না, এমনটি তাদের

ভাবনাতীত ছিল। ১৯ জুলাই গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁর পরিবারের কাছে কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না, এমনকি কোনো সাহায্যের সুযোগও ছিল না কারণ পুরো দেশজুড়ে মোবাইল নেটওয়ার্কও স্লো করা ছিলো; সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোও ছিল বন্ধ।

গাজীপুরের কাপাসিয়া চরদুর্লভ খাঁ গ্রামে জাকিরের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁকে স্থানীয় কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। শহীদ জাকির হোসেনের নির্মম মৃত্যু মানুষের মনে কেবল শোকেই জাগায় না বরং ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জাগায় অপরিমেয় ঘৃণা আর সৃষ্টি করে স্বৈরাচারবিরোধী দৃঢ় মনোবল।

শহীদ সম্পর্কে পরিবারের বক্তব্য

জাকিরের মা মোমেনা বেগম বলেন, "সেদিন সকাল থেকেই মনটা খুব খারাপ লাগছিল। চারদিকে নানা গণ্ডগোলের খবর পাচ্ছিলাম। কেউ কেউ বলছিল, গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ হচ্ছে। তাই জাকিরকে ফোন করেছিলাম। তাকে বললাম, বাবা,

সাবধানে থাকিস। কিন্তু সে আমার সঙ্গে কথা বলতেই গুলিবিদ্ধ হয়। মুহূর্তের মধ্যে ফোনের ওপাশ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একজন মা হিসেবে সেই মুহূর্তের কথা মনে হলে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না।"

জাকিরের স্ত্রী জান্নাতুন নাঈম বলেন, "জাকির ১৯ জুলাই সকালে খাবার খেয়ে বাসা থেকে বের হয়, অফিসের কাজে যাবে বলে। সারা দিন অফিসে থাকবে জানিয়েছিল। তারপর সারাদিন আর তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি। বিকেল ৫টার দিকে তার অফিসের কয়েকজন আমাদের বাসায় আসেন। তাদের কাছেই প্রথম জানতে পারি যে, জাকির গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পরে দ্রুত উত্তরার হাসপাতালে ছুটে গেলেও তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।"

জাকিরের পিতা আবদুস সামাদ বলেন, "২০০৩ সালে জাকির তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। কঠোর পরিশ্রম আর মেধার প্রমাণ দিয়ে কয়েক বছর আগে গাজীপুরের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি পায়। গত ছয় মাস আগে ছোট পরিসরে নিজেই একটি পোশাক তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছিল। এখন সব শেষ হয়ে গেলো।"

শহীদের বোন লাকী আক্তার (২৫) বলেন, "আমি বোন হিসেবে বলছি, আমার ভাই অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। সরকার কর্তৃক আইন শৃংখলা বাহিনীর দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হন। তিনি ধর্মের প্রতি অটল ছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা চাই- শহীদ হিসেবে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হোক।"

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মো: জাকির হোসেনের পরিবার নিম্নমধ্যবিত্ত হলেও তাঁকে ঘিরে ছিল অগাধ স্বপ্ন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, যিনি ছোট একটি ব্যবসার মাধ্যমে পরিবারকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তার অকাল মৃত্যু সেই আয়ের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। শহীদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রায় ২ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে, যা তাঁর পরিবারের কাঁধে বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিবারটি মাত্র ৫ শতাংশ জায়গার মধ্যে একটি ছোট বাড়িতে বসবাস করে, যেখানে কোনো অতিরিক্ত জমি নেই। অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকা আজ তাদের জন্য প্রতিদিনের সংগ্রাম। শহীদ জাকিরের মৃত্যুতে তার পরিবার এখন গভীর সংকটে নিমজ্জিত, আর্থিক সহায়তা ছাড়া তাদের সামনে কোনো পথ খোলা নেই।

প্রস্তাবনা

শহীদ মো: জাকির হোসেনের পরিবার আজ আর্থিক সংকট এবং অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন পার করছে। একজন স্বপ্নবান ব্যবসায়ী এবং নিবেদিত প্রাণ পিতার আকস্মিক চলে যাওয়া তাঁর পরিবারের ওপর চেপে বসিয়েছে অসহনীয় ভার। তাঁর স্ত্রী, দুই ছোট সন্তান এবং পরিবারের সদস্যরা আজ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছেন।

এমতাবস্থায়, শহীদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ করার মত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো:

প্রস্তাবনা-১: জাকিরের দুই অবুঝ শিশুর ভবিষ্যৎ যেন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে হারিয়ে না যায়। সেজন্য তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২: শহীদ পরিবারের উপর প্রায় ২ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা আজ তাদের জীবনযুদ্ধে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ঋণ পরিশোধে সহায়তা প্রদান করলে তারা নতুন করে বাঁচার আশায় এগিয়ে যেতে পারবে।

প্রস্তাবনা-৩: শহীদ জাকিরের স্ত্রী বর্তমানে নিরুপায় অবস্থায় আছেন। তার জন্য একটি উপযুক্ত চাকরির ব্যবস্থা করা গেলে তিনি তার সন্তানদের নিয়ে সম্মানের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন হলে শহীদ মো: জাকির হোসেনের পরিবারের জীবনযুদ্ধে কিছুটা হলেও সুখের সন্ধান মিলবে; যা তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন হবে।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: জাকির হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০৬ জুন ১৯৮৮
জন্মস্থান	: গাজীপুর
পেশা/পদবী	: ব্যবসায়ী, কাজী ভিআইপি গার্মেন্টসের যৌথ সত্ত্বাধিকারী
নিজ জেলা	: গাজীপুর
ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য	
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরদুর্লভ খাঁ, ইউনিয়ন: বারিষাব, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: চরদুর্লভ খাঁ, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর
পরিবার সংক্রান্ত তথ্য	
পিতার নাম	: আব্দুস সামাদ (৭০), পেশা: কৃষক
মায়ের নাম	: মোমেনা বেগম (৬০), পেশা: গৃহিণী
মাসিক আয়	: ৮০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: কৃষিকাজ
শহীদের সন্তান	: ১. আব্দুর রহমান (৭ বছর), ২. বায়েজিদ (২ বছর)
ঘটনার স্থান	: বিএনএস সেন্টার, উত্তরা
আক্রমণকারী	: র‍্যাব
আঘাত	: হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২১ জুলাই ২০২৪, ভোর ৪:০০, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চরদুর্লভ খাঁ, কাপাসিয়া, গাজীপুর

নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন

শহীদ মোঃ জুয়েল মিয়া

ক্রমিক : ১৭৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জুয়েল মিয়া, ১৯৮২ সালের ২০ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার সিংরাইল গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: আব্দুল হাই একজন কৃষক এবং মাতা মোসা: জিনুয়ারা একজন গৃহিণী। ছোটবেলা থেকেই আর্থিক অসচ্ছলতা জুয়েলের জীবনকে গ্রাস করেছিল। পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য ছোটবেলাতেই তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। জীবিকার তাগিদে জুয়েল গাজীপুর শহরে চলে আসেন এবং এক্সক্লুসিভ ওয়ার লিমিটেড নামে একটি গার্মেন্টসে লিংকিং অপারেটর হিসেবে কাজ শুরু করেন।

জুয়েলের জীবন ছিল সংগ্রামময়, কিন্তু তার চার বছরের ছেলে সন্তানের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। স্ত্রী, সন্তান এবং পরিবারের সবার প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল অপরিসীম।

যেভাবে তিনি শহীদ হন

২০২৪ সালের জুলাই মাসের কোটা সংস্কার আন্দোলন যখন জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়, তখন জুয়েল মিয়া তার কর্তব্য থেকে পিছপা হননি। ৫ আগস্ট, তিনি ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে ঢাকা লং মার্চে অংশ নেন। শেখ হাসিনার পদত্যাগের সংবাদ শোনার পর বিকেল চারটার দিকে বিজয় মিছিলে যোগ দেন। গাজীপুরের শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তায় স্বৈরাচারী সরকারের বিজিবি বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাতে শুরু করে। জুয়েল মিয়া মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তিনি শহীদ হন।

জুয়েলের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, তার এলাকার জন্যও এক গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার জানাজা শেষে সিংরাইল গ্রামের মাটিতেই তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। তার মৃত্যুর পর, পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ডুবে যায়। তার ছেলের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পথে।

নিকটাত্মীয় মো: হাসমত খান বলেন, "জুয়েল একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন, এবং এলাকাবাসীর প্রতি ছিল তার অপার ভালোবাসা। আমরা আল্লাহর কাছে তার শাহাদাতের কবুল প্রার্থনা করি।"

শহীদ জুয়েল মিয়ার রক্তের ঋণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সংগ্রামের শক্তি ও সাহসের কথা।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন দ্রুত একটি ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলন প্রথমে ছাত্রদের উদ্যোগে শুরু হলেও, ক্রমেই তা দেশের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এক বিশাল অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শেখ হাসিনা সরকার ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু পদত্যাগের আগে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা জনগণের ওপর তার ঘৃণ্য গণহত্যা চালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। খুনী তার সশস্ত্র বাহিনীকে নীরিহ আন্দোলনকারী ও সাধারণ মানুষের ওপর লেলিয়ে দেয়; যার ফলস্বরূপ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষ নিহত ও আহত হন। এরই মধ্যে একজন শহীদ হলেন মোঃ জুয়েল মিয়া।

জুয়েল মিয়া একজন নিরীহ শ্রমিক, ৫ আগস্ট,২০২৪ সাধারণ মানুষের সাথে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে গাজীপুর থেকে ঢাকার দিকে লং মার্চে রওনা দেন। গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তা ওয়াপদার মোড় এলাকায়, বিকেল ৪টার দিকে বিজিবি সদস্যরা তাদের পথরোধ করে। জনতার ওপর চালানো হয় নির্বিচারে গুলি। বিজিবির এই আক্রমণে জুয়েল মিয়া মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরও ছয়জন মানুষ নিহত হন এবং শতাধিক আহত হয়।

ক্ষুব্ধ জনতা বিজিবির একটি বাস ঘিরে ফেললে, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উদ্ধারের জন্য হেলিকপ্টার থেকে আবারও নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। সাধারণ, নিরস্ত্র জনতার ওপর এমন নির্মম এই আক্রমণ ইতিহাস হয়ে থাকবে।

শহীদ জুয়েল মিয়ার মরদেহ জানাজা শেষে ময়মনসিংহে সমাহিত করা হয়। তাঁর এই আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে থাকবে।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ জুয়েল মিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার প্রতিবেশী মো: হাসমত খান জানান, "জুয়েল মিয়া একজন ভালো মানুষ ছিলেন।

তিনি ৫ ওয়াক্ত নামাজী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এলাকার মানুষের সাথে খুব ভালো আচরণ করতেন এবং সবার খোঁজ-খবর রাখতেন। আমরা তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন।"

অর্থনৈতিক বিশেষ অবস্থা

শহীদ জুয়েল মিয়া ছিলেন একজন গার্মেন্টস শ্রমিক, যার আয়ের উপর নির্ভর করত পুরো পরিবার। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী, যিনি সংসারের দায়িত্ব পালন করতেন। তারা গাজীপুরের মাওনা উত্তর পাড়ায় একটি ছোট ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন, যেখানে জীবনযাত্রা ছিল সীমিত ও কষ্টকর। জুয়েল মিয়া ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, তার উপার্জনেই চলত পরিবার। তিনি প্রতি মাসে তার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জন্যও টাকা পাঠাতেন, কারণ তার বাবা হার্টের রোগে আক্রান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তার উপার্জনে তাদের চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো হত।

শহীদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের নান্দাইলের সিংরাইলে রয়েছে একটি টিনের ঘর, যা তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শহীদ জুয়েল মিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে তার পরিবার গভীর সংকটে পড়েছে। তার এই শূন্যতা পূরণ করা আর সম্ভব নয়।

প্রস্তাবনা

শহীদ জুয়েল মিয়ার পরিবার বর্তমানে চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে। এই মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরি। শহীদ জুয়েলের ছোট ছেলে মাত্র ৪ বছর বয়সী, তার শিক্ষার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাই, পরিবারটির সহযোগিতার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়:

প্রস্তাবনা ১: ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা

শহীদ জুয়েল মিয়ার ছেলে এখনো খুব ছোট, তার শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া মানবিক কর্তব্য। তার একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হলে তাকে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া জরুরি। জুয়েলের অবর্তমানে তার ছেলের সঠিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারলে পরিবার একটু ভরসা পাবে।

প্রস্তাবনা ২: পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

পরিবারটি বর্তমানে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করছে, যাতে দীর্ঘমেয়াদে থাকা অনিশ্চিত। তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে শহীদ জুয়েলের স্মৃতি ধরে রাখতে, তার পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী ঘর তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা ৩: বাবা-মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

শহীদের বৃদ্ধ বাবা-মা অর্থনৈতিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল। তার বাবা হার্টের রোগে আক্রান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন। তাদের দুজনেরই চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের বয়সজনিত নানা অসুস্থতার পাশাপাশি জুয়েলের মৃত্যুতে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তাদের চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারলে অন্তত এই বৃদ্ধাবস্থায় তারা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।

শহীদ জুয়েল মিয়ার পরিবারকে সহায়তা করা সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব।

Crown Exclusive Wears Ltd.
Mawna, Sreepur, Gazipur.
পরিচয় পত্র

নাম	: মো: জুয়েল মিয়া
পদবী	: লিংকিং অপারেটর
আই.ডি.নং	: ১১৪৯
সেকশন	: লিংকিং
ডিপার্টমেন্ট	: প্রোডাকশন
গ্রেড	: ২
যোগদান তাং	: ০৯/০৭/২০১৭
রক্তের গ্রুপ	: A '+'

ইস্যু তাং : ০৯/০৭/২০১৭
কাজের ধরন: লিংকিং
Authorized Signature

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মোঃ জুয়েল মিয়া
জন্ম তারিখ	: ২০-০৮-১৯৮২
জন্মস্থান	: সিংদিই, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
নিজ জেলা	: ময়মনসিংহ
পেশা/পদবী	: গার্মেন্টস কর্মী
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: ক্রাউন এক্সক্লুসিভ ওয়্যার লিমিটেড
পদবি	: লিংকিং অপারেটর
ডিপার্টমেন্ট	: প্রোডাকশন
স্থায়ী ঠিকানা	: সিংদিই, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: মাওনা উত্তর পাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর
পিতার নাম	: মোঃ আঃ হাই (৬০ বছর, কৃষক)
মায়ের নাম	: মোসাঃ জিনুয়ারা (৫০ বছর, গৃহিণী)
মাসিক আয়	: ১০,০০০/-
আয়ের উৎস	: কৃষিকাজ
পরিবারের সদস্য	: স্ত্রী ও ১ ছেলে (৩ বছর)
রক্তের গ্রুপ	: এ+
ঘটনার স্থান/পয়েন্ট	: ওয়াবদার মোড়, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর
আক্রমণকারী	: বিজিবি
আহত হওয়ার তারিখ ও সময়	: ০৫-০৮-২০১৪, বিকাল ৪.০০টা
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, বিকাল ৪.১০টা, ওয়াবদার মোড়
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: সিংদিই, নান্দাইল, ময়মনসিংহ

আমি যুদ্ধে যাইতেছি।

শহীদ মো: নজরুল ইসলাম

ক্রমিক : ১৭৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪৭

শহীদের পরিচয়

মো: নজরুল ইসলাম ১৯৮৮ সালের ১৫ অক্টোবর সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জের বারই ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান নজরুল ইসলাম ছোট থেকেই জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তার পিতা মো: জামাল শেখ ছিলেন একজন কৃষক এবং তার মা, জয়গন বেগম, একজন গৃহিণী। পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে নজরুলের শৈশবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তাতে তার জীবনের প্রতিকূলতাকে হার মানাতে কখনো পিছপা হননি।

একটি সংগ্রামী জীবন

মো: নজরুল ইসলাম ১৯৮৮ সালের ১৫ অক্টোবর সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জের বারই ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান নজরুল ইসলাম ছোট থেকেই জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তার পিতা মোঃ জামাল শেখ ছিলেন একজন কৃষক এবং তার মা, জয়গন বেগম, একজন গৃহিণী। পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে নজরুলের শৈশবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তাতে তার জীবনের প্রতিকূলতাকে হার মানাতে কখনো পিছপা হননি।

সংসারের হাল ধরতে তিনি গাজীপুরে চলে আসেন, যেখানে তিনি টিএম ফ্যাশন লিমিটেড নামক একটি গার্মেন্টস কারখানায় সহকারী কাটার হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০২১ সালের ৯ নভেম্বর তিনি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। সেখানে কাজ করতে গিয়েই তিনি তার পরিবারের জন্য একটি স্থিতিশীল জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। গাজীপুরের আউট পাড়া এলাকার একটি ছোট বাসায় বসবাস করছিলেন তিনি। তার পরিবারে ছিলেন তার মা-বাবা, স্ত্রী, এবং ভাইবোন, যাদের মধ্যে মো: আমিরুল নামে এক ভাই রয়েছেন, যিনি পেশায় একজন তাতি।

কঠিন সংগ্রামী জীবনেও তিনি সমাজের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। ২০২৪ সালের ২০ জুলাই, তিনি গাজীপুরে ছাত্র ও জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। সে দিন ছিল এক শনিবার, যখন শহীদ নজরুল ইসলাম সকাল ১১:৩০ মিনিটে আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেন। গাজীপুরের মুন্নি সরকারের বাড়ির সামনে পৌঁছালে পুলিশ শান্তিপ্রিয় ছাত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়।

মিছিলটি পুলিশের ধাওয়া খেয়ে পাশের একটি কবরস্থানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পুলিশ সেখানে গিয়েও গুলি চালায়। খুব কাছ থেকে গুলি করা হলে শহীদ নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, দেশের জন্যও এক শোকের দিন। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ নজরুল ইসলাম তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার আত্মত্যাগ বাংলাদেশের আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

১৯ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার ডিউটি করেছিল নজরুল। ঘটনার দিন শনিবার সারদেশে প্রথম কারফিউ- অফিস বন্ধ তা জানতো না। ফোনে মেসেজ এসেছিলো অফিস বন্ধ। বাজার করে এনেছিল। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল, আমি যুদ্ধে যাইতেছি। এটাই ছিল শেষ কথা।

২০ জুলাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। স্বৈরাচার সরকারের নির্দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং দেশব্যাপী কারফিউ জারি হয়। সাধারণ মানুষের চলাচলও স্থগিত হয়ে যায়, যেন দেশটি একটি রক্তাক্ত কারাগারে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর এই নির্মমতা দেশের সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

সেদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে, শহীদ নজরুল ইসলাম হাজারো ছাত্র-জনতার সঙ্গে প্রতিবাদের মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। তারা সকলেই সরকারের অন্যায় এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য পথে নেমেছিলেন। সকাল ১১:৩০ টায়, তিনি গাজীপুর চৌরাস্তার মুন্নি সরকারের বাড়ির সামনে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু সেখানেই শুরু হয় এক নির্মম ঘটনা। আন্দোলনের এক পর্যায়ে, যখন মিছিল মুন্নি সরকারের বাড়ির সামনে পৌঁছায়, তখন স্বৈরাচার হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ আকস্মিকভাবে আক্রমণ শুরু করে। প্রথমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে এবং মিছিলের নেতা-কর্মীরা পাশের একটি কবরস্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই আশ্রয়ের স্থানটিও নিরাপত্তা দিতে পারেনি আন্দোলনকারীদের।

নজরুল ইসলামসহ যারা কবরস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা ভেবেছিলেন, সেখানে গিয়ে হয়তো পুলিশের গুলির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কিন্তু পুলিশের নির্মম আক্রমণ সেখানে গিয়েও তাদের পিছু ছাড়েনি। খুনী হাসিনার পুলিশ বাহিনী কবরস্থানে প্রবেশ করে, খুব কাছ থেকে সরাসরি গুলি চালায়। নজরুল ইসলামের শরীরে

গুলি লেগে তিনি সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। মৃত্যু হয় তার সেখানেই, তার স্বপ্ন, আশা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে।

শহীদ নজরুল ইসলামের এই মৃত্যু একটি হৃদয়বিদারক অধ্যায়। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গিয়ে তার প্রাণ চলে যায় নিষ্ঠুর পুলিশের গুলিতে, যা পুরো জাতিকে শোকাচ্ছন্ন করে তোলে। এই নির্মম

হত্যাকাণ্ড দেশের মানুষকে আরও দৃঢ় প্রতিরোধের গড়তে অনুপ্রাণিত করে। নজরুল ইসলামের আত্মত্যাগ ন্যায়বিচারের দাবির পক্ষে উদাহরণ হয়ে থাকবে। শহীদ নজরুল ইসলামের মৃত্যু শুধু একটি পরিবারের নয়, বরং একটি জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। তার এই আত্মত্যাগ স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত সকল মানুষের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে, যা কখনোই ভুলে যাওয়ার মতো নয়।

শহিদ সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনের অনুভূতি

শহিদের শ্বশুর বললেন, তার কথা আর কী বলব; বলে শেষ করা যাবে না। খুবই ভালো লোক ছিলো। অমন মাটির মানুষ আর হয় না। আমার মেয়েরে খুব ভালো জেনেছে, ভালো রেখেছে। কোন কষ্ট দিয়েছে বলে জানা নেই। 'তুমি' ছাড়া 'তুই' শব্দটিও উচ্চারণ করেনি। আমার মেয়ে খুবই কমবয়সী আইডি কার্ডও হয়নি। সারাক্ষণ কান্না করে। তার চোখের পানি সওয়া যায় না। নজরুলের আচার ব্যবহার নম্রতা দায়িত্বশীলতা অতুলনীয় ছিল⊠

পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদের বাবা-মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। শহীদ নজরুল ৯ বছরের সংসার জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন। তার স্ত্রীও গার্মেন্টস-এ কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে কাজ ছেড়ে নানা বাড়িতে উঠেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মামলার করার কারণে নানা ভয়ে গাজীপুরের গার্মেন্টসের কর্মস্থল ছেড়েছেন। পিতার বাড়িতে কোন ঘর নেই। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে পিতা-মাতাসহ নানাবাড়িতে অবস্থান করছেন। শহিদের স্ত্রীর পরিবার একেবারেই নিঃস্ব অবস্থায় রয়েছেন। শহিদের শ্বশুর বলেন, "এক শতাংশ জায়গা বেচে মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম। এখন মেয়ের পুনঃবিবাহ দিতে হবে কিন্তু আমিতো নিঃস্ব।"

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

নজরুল ইসলাম একজন গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়িতে কিছু জমি আছে। ফসল থেকে কিছু টাকা পেলেও তারা স্বামী-স্ত্রী গার্মেন্টস-এ চাকরি করতেন। স্বামীর হত্যা নিয়ে মামলা করায় হুমকি-ধামকিতে ভীত হয়ে চাকরি ছেড়ে নানা বাড়িতে উঠেছেন শহীদের স্ত্রী।

প্রস্তাবনা

মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে শহীদ পরিবারের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এই পরিবারটি বর্তমানে কঠিন আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। শহীদের ত্যাগ আমাদের জন্য যে আদর্শ স্থাপন করেছে, তা অনস্বীকার্য। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমাদের উচিত তাঁর পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা।

প্রথমত, শহীদের স্ত্রীর জীবনধারণের জন্য নিয়মিত ব্যয়ভার বহন করা প্রয়োজন। তিনি বর্তমানে অসহায় অবস্থায় আছেন। তাঁর এই বিপদের সময় আমাদের সহানুভূতির হাত প্রসারিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শহীদের পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত। তাদের মাসিক ও এককালীন আর্থিক সহযোগিতা করা; যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বাকি জীবন কাটাতে পারেন।

এভাবেই আমরা শহীদের পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করে তাঁদের ত্যাগের প্রতি সত্যিকার সম্মান জানাতে পারি।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মোঃ নজরুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ১৫-১০-১৯৮৮
জন্মস্থান	: রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
পেশা/পদবী	: গার্মেন্টস কর্মী
নিজ জেলা	: সিরাজগঞ্জ
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: জাবেদা টাওয়ার, টিএম ফ্যাসন লিঃ
পদবী	: সহকারী কাটার
যোগদান	: ০৯-১১-২০২১
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ বারই ভাগ, ইউনিয়নঃ বহুলি, থানাঃ রায়গঞ্জ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা নংঃ ৯৯, এলাকা : আউট পাড়া, চান্দনা, ব্লক-সি, ওয়ার্ড-১৭, অঞ্চল-০৬ থানাঃ বাসন, জেলাঃ গাজীপুর
পিতার নাম	: মোঃ জামাল শেখ
পিতার পেশা	: কৃষক
মায়ের নাম	: জয়গন বেগম
মায়ের পেশা	: গৃহিণী
মাসিক আয়	: ১২,৫০০/-
আয়ের উৎস	: চাকরি
ঘটনার স্থান	: মুন্নি সরকারের বাড়ি (গাজীপুর)
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০-০৭-২০২৪, দুপুর ১২.০০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২০-০৭-২০২৪, দুপুর ১২.০০
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম (সিরাজগঞ্জ থানার পাশে)

"মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন"

শহীদ মো: এলিম হোসেন

ক্রমিক : ১৮০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৪৮

শহীদ পরিচিতি

মো: এলিম হোসেন ১৯৮২ সালের ৬ জুন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের রাখালিয়াচালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মো: বেলায়েত হোসেন একজন বৃদ্ধ এবং মাতা আনোয়ারা বেগম একজন গৃহিণী। পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় ছোট বয়সেই পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। লেখাপড়া চালিয়ে যেতে না পারার কারণে তিনি অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং প্লাইবোর্ডের ব্যবসা শুরু করেন। এলিম হোসেন তার পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল রাখতে কঠোর পরিশ্রম করতেন।

তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে। এরিন সিকদার (বয়স ১৫, শিক্ষার্থী) ও ইর্জা সিকদার (বয়স ১)। মৃত্যুর পূর্বে, এলিম ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তার মৃত্যুর পর পরিবারটি গভীর শোক এবং সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

মো: এলিম হোসেন ছিলেন এক নির্ভীক যোদ্ধা, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বৈষম্যমুক্ত সমাজ এবং ন্যায়ের জন্য। ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের সেই কালো দিনে, তিনি ঢাকা লং মার্চে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে লক্ষ জনতা ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। স্বৈরাচার হাসিনার পতনের একদফা দাবীতে সারাদেশের মত রাজপথে নেমে পরেছিলো গাজীপুরবাসী। ছাত্র-জনতার এই অহিংস মিছিল সেদিন সফিপুর আনসার একাডেমির সামনে এসে পৌঁছালে, হঠাৎই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নিষ্ঠুর চিত্র ফুটে ওঠে। শেখ হাসিনার শাসনকালে লেলিয়ে দেওয়া আনসার বাহিনী, যারা ক্ষমতায় অবৈধভাবে টিকে থাকা নিশ্চিত করতে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর বর্বরভাবে আঘাত হানে, তারা

এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে।

ঘাতকের বুলেট এসে তার বুকের ডান পাশে বিদ্ধ হয়ে ভেতরে আটকে যায়। সেখানেই রক্তে ভিজে যান তিনি। আশেপাশের মানুষ তাকে উদ্ধার করে দ্রুত সফিপুর মর্ডান হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু জীবনের অবসান ঘটেছিল ঘটনাস্থলেই। হাসপাতালের নেওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার বিকাল ৩:৩০ টায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত্যুর পর তাঁর নিজ গ্রামের মানুষ তাঁকে শেষ বিদায় জানায়। রাখালিয়াচালা, সফিপুরে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মানের সাথে তাঁকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। রেখে গেলেন দুই কন্যা, যাদের একজন মাত্র ৮ বছর বয়সী, অন্যজন মাত্র এক বছর। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারটি এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পতিত হয়।

মো: এলিম হোসেনের এই আত্মত্যাগ যেন দেশের মুক্তিকামী মানুষকে নতুন প্রেরণা ও শক্তি জোগাবে চিরকাল। তাঁর বুকের রক্ত যেন এ দেশের প্রতিটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামে চিরকাল অনুপ্রাণিত করে রাখে। শহিদ এলিমের মৃত্যু জাতির হৃদয়ে নতুন করে সংগ্রামের বীজ বপন করে গেল। তিনি চলে গেলেও তাঁর চেতনা ও আত্মমর্যাদা চিরঅমলিন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদের চাচা বলেন, বাড়ি থেকে ১ কিলো দূরে বাজার। বাজারের একদিকে ব্রিজের কাছেই গুলিবিদ্ধ হয় এলিম। নির্বিচারে গুলি করেছে, যে যেভাবে পেরেছে গুলি করেছে। আমার ভাতিজার বুকের বাম পাশে ১টি বুলেট ভেতরে আটকে গেলেও সারা গায়ে ও চেহারায় বিদ্ধ ছিলো অসংখ্য ছররা গুলি। ভাতিজা খুব ভালো ছিলো। স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল ঝগড়া ফ্যাসাদে ছিলো না। মানুষের জন্য ভালো ছাড়া মন্দ করেনি। মানুষের পাশে ছিলো। আর মানুষও কেঁদেছে মৃত্যুর পর। ১০-১২ হাজার মানুষ এসেছিলো জানাজার নামাজে। বিএনপির রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলো। ওর পরিবারটা অসহায় হয়ে গেছে। অর্থসম্পদ যাই থাক পরিবারের মূল অভিভাবক চলে গেলে যা হয়। শোকতো সইতেই হবে লোকতো আর পাওয়া যাবে না। দোয়া করি আল্লাহ তাকে ভালো রাখুক।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মো: এলিম হোসেন একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তার দক্ষতা ও পরিশ্রমের ফলে পরিবারের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। অর্থনৈতিক কষ্ট তাদের নেই।

প্রস্তাবনা

শহীদ মো: এলিম হোসেনের পরিবারটি আর্থিকভাবে সচ্ছল। তারা আর্থিক সহযোগিতা চাচ্ছেন না, বরং তাদের প্রধান দাবি হচ্ছে, শহীদ মো: এলিম হোসেনকে যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হোক। পরিবার তাঁর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে এবং দেশের সেবায় তাঁর আত্মত্যাগের যথাযথ স্বীকৃতি পেতে আগ্রহী। দেশ ও জাতির জন্য তার যে অবদান, তা যেন চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, শহীদের চাচা জানান, অর্থ সম্পদ যা-ই থাকুক পরিবারে মূল অভিভাবক চলে গেলে আরও বহু রকমের অসহায়ত্ব থাকে। বিশেষ করে তার ছোট বাচ্চা দুটি অভিভাবকহীন হয়ে গেলো। তাদের পড়ালেখার পর সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিতে সরকারের সহযোগিতা চাই। তাদের পিতার অভাবতো পূরণ হবে না; তবে সরকারই যেন তাদের অভিভাবক হন এটাই আশা আমার।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: এলিম হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০৬ জুন ১৯৮২
জন্মস্থান	: রাখালিয়াচালা
পেশা/পদবী	: ব্যবসায়ী
মাসিক আয়	: নির্দিষ্ট নয়
নিজ জেলা	: গাজীপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রাখালিয়াচালা, ইউনিয়ন: ৬ নং মৌচাক, থানা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: রাখালিয়াচালা, এলাকা: নেত্রীবাড়ি, থানা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর
পিতার নাম	: বেলায়েত হোসেন (বৃদ্ধ)
মায়ের নাম	: আনোয়ারা বেগম (গৃহিণী)
শহীদের সন্তান	: ২ মেয়ে ১. এরিন সিকদার, বয়স: ১৫ বছর, ১০ম শ্রেণি ২. ইর্জা সিকদার, বয়স: বয়স: ১ বছর
ঘটনার স্থান/পয়েন্ট	: সফিপুর আনসার একাডেমি
আক্রমণকারী	: আনসার সদস্য
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩.৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩.৩০টা
মৃত্যুর স্থান	: সফিপুর আনসার একাডেমি, গাজীপুর
শহীদের কবরের অবস্থান	: রাখালিয়াচালা, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

“বিয়ের ২৫ দিনের মাথায় শাহাদাত বরণ করেন”

শহীদ জাকারিয়া হাসান

ক্রমিক ১৮১

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৪৯

এক অসমাপ্ত জীবনের গল্প

জাকারিয়া হাসান, গাজীপুরের কালিগঞ্জের এক অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে। ছোটবেলা থেকেই জীবন সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। ফুটপাতে কাপড়ের ব্যবসা করে উত্তরা রাজলক্ষ্মী মার্কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার পিতা আকবর আলী শেখ একজন চা বিক্রেতা, মা ঝর্না বেগম একজন গৃহিণী। কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই পরিবারকে সহায়তা করে যাচ্ছিলেন তিনি।

জাকারিয়ার স্বপ্ন ছিল ছোট, কিন্তু তার হৃদয় ছিল বিশাল। পরিবারকে একটু ভালোভাবে দেখার, সংসারে সুখ আনার স্বপ্ন ছিল তার। জীবনের ঠিক এক নতুন অধ্যায়ে পা রেখেছিলেন, বিয়ের ২৫ দিনের মাথায়, যখন সবকিছু রঙিন হওয়ার কথা ছিল, তখনই ১৮ আগস্ট ২০২৪, সেই বিকেলটা কালো মেঘের মতো ছায়া ফেলে জাকারিয়ার জীবনে। রাজলক্ষ্মী কুশল সেন্টারে কাপড়ের দোকানে থাকার সময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগের যৌথ আক্রমণে জীবনটি শেষ হয়ে যায়।

তার মৃত্যুর সঙ্গে একটি পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায় তার বাবা-মা, বড় ভাই মুজাহিরুল হাসান শেখ, যিনি নিজেও পরিবারের দায়িত্ব নিতে লড়ছেন। জাকারিয়ার জীবনের শেষ ঠিকানা হয় তার নিজ গ্রাম কালিগঞ্জের পারিবারিক কবরস্থানে, যেখানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

জাকারিয়া হাসান আমাদের শিখিয়ে গেছেন, লড়াই শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে হয় না, কখনো কখনো জীবন দিয়ে লড়াই করতে হয়।

ঘটনার বিবরণ

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল একটি ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রামী প্রয়াস। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা চাকরিতে কোটার নামে নানা বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ রাস্তায় নেমেছিল, তাদের দাবি ছিল উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের উদাসীনতা এবং ফ্যাসিবাদী নীতির বিরুদ্ধে এই দাবিগুলোকে জবাব দেওয়ার পরিবর্তে, সরকার তা দমন করতে চেয়েছিল।

১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার। জাকারিয়া ছাত্র জনতার সঙ্গে

শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশ নেন। তারা রাজলক্ষ্মী কুশল সেন্টারের দিকে এগোচ্ছিল। মিছিলটি এগিয়ে গেলে স্বৈরাচারী সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ ও আওয়ামী লীগ বাহিনী বিনা উসকানিতে মিছিলের ওপর আক্রমণ চালায়। সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। জাকারিয়া ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত জাকারিয়াকে দ্রুত উদ্ধার করে উত্তরা রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ জাকারিয়ার মরদেহ কালিগঞ্জে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে জানাজা শেষে তাকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। জাকারিয়ার এই শাহাদাত তার পরিবারের জন্য এক অসীম বেদনা হয়ে আসে, কিন্তু তার স্বপ্ন ও সংগ্রাম আজও মানুষের মনে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে।

জাকারিয়ার মৃত্যুর পর সারা দেশে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজের হৃদয়ে যে ক্ষোভ জ্বলে উঠেছিল, তা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাজপথে হাজারো ছাত্রছাত্রী, শ্রমজীবী মানুষ, এবং সাধারণ জনগণ কণ্ঠে একই স্লোগান নিয়ে নেমে আসে–"ন্যায়বিচার চাই, খুনি সরকারের পতন চাই!" স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ যতই দমনমূলক পদক্ষেপ নেয়, ততই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শহীদ জাকারিয়ার পরিবার এই শোকের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের ভালোবাসা এবং সহানুভূতি পেতে শুরু করে। কালিগঞ্জের ছোট গ্রামটি এখন শহীদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মানুষ তার কবরের পাশে এসে শপথ নেয়, "আমরা জাকারিয়ার স্বপ্ন পূরণ করব।" সেই স্বপ্ন ছিল একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

জাকারিয়ার রক্তে রাঙা রাজপথ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় হয়ে উঠেছে, যেখানে গণমানুষের সংগ্রাম থামবে না, যতক্ষণ না বৈষম্য ও দমনমূলক শাসনের অবসান ঘটে।

আর্থিক অবস্থা

শহীদ জাকারিয়া হাসান একজন ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী। সচ্ছলতার জন্য তিনি অল্প বয়সেই কাজকর্ম করতেন। মৃত্যুর আগে ফুটপাতে কাপড়ের দোকান দিয়ে সংসার চালাতেন। আর স্ত্রী পাপিয়া আক্তার শর্মী পেশায় একজন নার্স। মাত্র ২৫ দিনের মাথায় তিনি তার স্বামীকে হারান। তার বাবা দিন এনে দিন খেয়ে সংসার চালান। তার বাবা চা বিক্রেতা হিসেবে বাড়ির পাশেই ব্যবসা করছেন। তার বড় ছেলে কয়লা ঘাটে ছোট চাকুরী করছেন। তার পরিবারের অবস্থা মোটামুটি। তার বাবার পক্ষে পরিবারের জন্য সংসার চালানো কষ্টকর হচ্ছে।

শহীদ সম্পর্কে বন্ধুর বক্তব্য

শহীদের বন্ধু মুনসুর আলী বলেন, জাকারিয়া ভদ্র ও নম্র ছিলেন। তিনি মুলগাও দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি এলাকার সামাজিক কাজগুলি করতেন। যে আন্দোলন করতে গিয়ে নিহত হলেন আল্লাহ যেন তাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন। দেশ যেন ফ্যাসীবাদ দূর হয়। ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে কবুল করেন।

প্রস্তাবনা

শহীদ জাকারিয়া হাসানের পরিবার আজ এক নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তার অকাল মৃত্যুতে পুরো পরিবারের স্বপ্নগুলো যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পরিবারটি আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে, যদি আমরা সবাই মিলে কিছু সহায়তা করতে পারি।

প্রথমত, শহীদ জাকারিয়ার বড় ভাই মুজাহিরুল হাসান শেখ বর্তমানে একটি ছোট প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। যদি তার জন্য একটি স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা যায়, তবে পরিবারটি একটি নির্দিষ্ট আয়ের উৎস পাবে, যা তাদের স্থিতিশীলভাবে চলতে সহায়ক হবে।

দ্বিতীয়ত, শহীদের পিতা আকবর আলী শেখ একজন চা বিক্রেতা। তার ছোট্ট দোকানটিতে পুঁজির অভাবে তিনি এগোতে পারছেন না। যদি তার দোকানে কিছু পুঁজির সংস্থান করা যায়, তবে তিনি নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন এবং পরিবারের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি আসবে।

তৃতীয়ত, শহীদ জাকারিয়ার নববধূ, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর গভীর শোকে আচ্ছন্ন, তার জন্য একটি হাসপাতালে নার্সিংয়ের চাকরির ব্যবস্থা করা গেলে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

এই প্রস্তাবনাগুলি বাস্তবায়িত হলে শহীদ জাকারিয়া হাসানের পরিবার আবারও নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারবে, এবং তাদের এই অন্ধকার সময়ে কিছুটা আশার আলো দেখা দেখাবে।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: জাকারিয়া হাসান
জন্ম তারিখ	: ১২ অক্টোবর ১৯৯৮
জন্মস্থান	: কালিগঞ্জ, গাজীপুর
পেশা	: ব্যবসায়ী (ফুটপাতে কাপড়ের ব্যবসা, রাজলক্ষ্মী, উত্তরা)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দেওপাড়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: দেওপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
পিতা	: আকবর আলী শেখ (চা বিক্রেতা)
মাতা	: ঝর্না বেগম
স্ত্রী	: পাপিয়া আক্তার শর্মি, পেশা: নার্স
মাসিক আয়	: ৮-১০ হাজার টাকা
আয়ের উৎস	: চা বিক্রি
বিশেষ তথ্য	: শহীদ জাকারিয়া হাসান বিয়ের ২৫ দিনের মাথায় শাহাদাত বরণ করেন
ঘটনার স্থান	: রাজলক্ষ্মী কুশল সেন্টার, উত্তরা
আক্রমণকারী	: পুলিশ ও আওয়ামীলীগ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৮ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৪:০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৮ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৪:১০টা
মৃত্যুর স্থান	: রাজলক্ষ্মী কুশল সেন্টার, উত্তরা
শহীদের কবরের অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসে। এসব ঘটনায় স্থান পায় যা কিছু ভালো তাই মানব সভ্যতার অভিশাপ-আশীর্বাদ। ইতিহাস পথ দেখায় নতুন নতুন দিগন্তের। ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার, নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিক থেকে ইতিহাসে এই দিনটিও গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়।

শহীদ মো: রশিদ

ক্রমিক ১৮২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৫০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: রশিদ একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। তিনি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যা আহরণ করে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে ঢাকা পাড়ি জমান। তিনি টঙ্গী বাজার ফায়ার সার্ভিসের পাশে টিআইসি গেট এর পার্শ্বে পুরাতন মালামাল ক্রয় বিক্রয় করতেন। তার পরিবার বর্তমানে ছেলেকে দিয়ে ব্যবসা চালানোর চেষ্টা করছে। তার গ্রামে কোন ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি নেই। পরিবার চালানোর মত উল্লেখযোগ্য কোন আয় বর্তমানে নেই বললেই চলে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এই অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় ভয়ংকর বেপরোয়া হয়ে উঠা সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় মুক্তিকামী জনতা।

সামগ্রিক ঘটনার বিবরণ

২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। এ আন্দোলনে তরুণ থেকে বৃদ্ধ হাতে হাত রেখে অংশগ্রহণ করে যা বিশ্বে বিরল। দুর্নীতি আর অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কেবল জনসাধারণ নয়, ছাত্র সমাজের ভিতরেও তৈরি করে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা। অধিকার আদায়ে সচেতন শিক্ষিত ছাত্রসমাজ এক সময় স্বৈরশাসন আর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে থাকে এবং সর্বশেষ মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। ক্ষোভ আর হতাশা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুরাহা হয় না তখন বিপ্লবই হয়ে ওঠে অপরিহার্য নিয়তি। ২০২৪ সালে ছাত্র আন্দোলন তেমনি দেশে ইতিহাস সৃষ্টি করে বিপ্লবী পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট রিজিম পরিবর্তন করে সফল হয় ছাত্র আন্দোলন। তবে এ আন্দোলনের প্রভাব অনেক গভীর ও ব্যাপক। জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলন সবচেয়ে বড় অর্জন মানুষে মানুষে সংহতিবোধ। ছাত্র-জনতা দল তৈরি করে বাড়িঘর ও উপাসনালয় পাহাড়া দেয়।

বীর শহীদ মো: রশিদ ঢাকা জেলার অন্তর্গত কদমতলার শ্যামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ছিল। অভাবের তাড়নায় ৮ম শ্রেণীর পর তিনি আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেনি। পরিবারের হাল ধরতে বাধ্য হয়ে বেছে নেয় টাকা উপার্জনের পথ। পরিবারের হাল ধরতে বিভিন্ন কাজ করে অবশেষে টঙ্গীতে একটি দোকান ভাড়া করে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। মৃত্যুকালে তার পুরাতন মালামাল কেনা বেচার এই ব্যবসাটিই উপার্জনের অন্যতম উপায় ছিল। যা দিয়ে পরিবার চালাতেন। তার ১৫ বছরের একজন ছেলে আছে। সে মরকুন নতুন কুঁড়ি স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করে। তার ৭ বছরের ২য় শ্রেণিতে পড়ুয়া আরেকটি মেয়ে আছে। তিনিও পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সোমবার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ১ দফা দাবির প্রেক্ষিতে ডাকা ঢাকা লং মার্চ এ যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে সকাল ৮ টায় বের হন। তখন ঘড়ির কাটা আনুমানিক বিকাল ৪ টার দিকে ছাত্র-জনতার মিছিল উত্তরা ১ নং সেক্টরের মসজিদের সামনে আসলে স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ বাহিনী তাদের উদ্দেশ্য করে ছাদের উপর থেকে গুলি বর্ষণ করে। মো: রশিদ তখন মিছিলের একেবারে সম্মুখ দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঘাতক বাহিনীর একটা গুলি এসে হঠাৎ তার মাথায় বিঁধে। তখনই তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়নে। ছাত্র-জনতা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আগারগাঁও নিউরো সাইন্স হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পর্যবেক্ষণ করে মৃত ঘোষণা করেন।

জানাযা ও দাফন

শহীদের নামাজে জানাযা শেষে জুরাইন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর একজন ছেলে ও মেয়ে ছিলো।

সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে প্রত্যক্ষ সূত্রের মারফত জানা যায় যে শহীদ মো: রশিদ ব্যবসায়ী হিসেবে একজন ভালো মানুষ ছিলেন। গ্রাহকদের নিকট তাঁর আচরণ ও লেনদেন ছিল অমায়িক। আশেপাশের লোকজন তাঁকে খুবই ভালো জানতেন।

প্রস্তাবনা

১। এককালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।

২। মাসিক ১০০০০ টাকা হারে বার্ষিক পরিবারের প্রতি তদারকি করা।

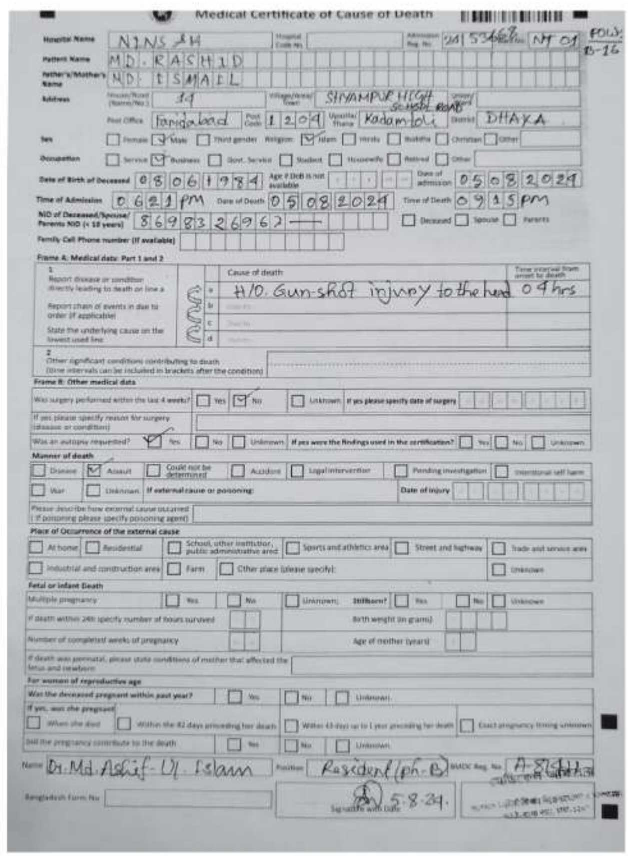

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: NINS & H

Patient Name: MD. RASHID

Father's/Mother's Name: MD. ISMAIL

Address: House/Road: 14; Village/Area/Town: SHYAMPUR HIGH SCHOOL ROAD; Post Office: Faridabad; Post Code: 1204; Upazila/Thana: Kadamtoli; District: DHAKA

Sex: Male; Religion: Islam; Occupation: Business

Date of Birth of Deceased: 08 06 1984; Date of admission: 05 08 2024

Time of Admission: 06 21 PM; Date of Death: 05 08 2024; Time of Death: 09 15 PM

NID of Deceased/Spouse/Parents NID: 8698326962

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

Cause of death: a. H/O. Gun-shot injury to the head — Time interval from onset to death: 04 hrs

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? No

Was an autopsy requested? Yes

Manner of death: Assault

Name: Dr. Md. Ashif-Ul-Islam; Position: Resident (ph-B)

Signature with Date: 5.8.24.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম: মোঃ রশিদ

Name: MD RASHID

পিতা: মোঃ ইসমাইল

মাতা: মোসাঃ রাশিদা বেগম

Date of Birth: 06 Jun 1984

NID No. 869 832 6967

একনজরে শহীদের প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মোঃ রশীদ
বয়স	: ৩৯ বছর, পেশাঃ ব্যাবসা
পেশাগত পরিচয়	: টঙ্গী বাজার ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন টিআইসি গেট এর পার্শ্বে পুরাতন মালামাল ক্রয় বিক্রয় করতেন
জন্ম	: ৬ জুন ১৯৮৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রামঃ শ্যামপুর, থানাঃ কদমদলা, জেলাঃ ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: মরকুলমধ্য পাড়া, টঙ্গী থানা এবং গাজীপুর জেলায় বাস করেন
পিতা	: ইসমাইল, পেশা ও বয়স : শ্রমিক ও ৬০
মাতা	: রাশিদা বেগম। পেশা : গৃহিণী বয়স : ৫৫
পরিবারের সদস্য	: ৩
ঘটনার স্থান	: উত্তরা ১ নং সেক্টর মসজিদের সামনে
আক্রমণকারীর সুনির্দিষ্ট নাম ও তথ্য	: পুলিশ ও ছাত্র লীগ
আহত হওয়ার সময়কাল	: আনুমানিক ৫ আগস্ট বিকাল ৩.০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট বিকাল ৫.৩০ টা উত্তরা ১ নং সেক্টর মসজিদের সামনে
শহীদের কবরের অবস্থান	: জুরাইন

শহীদ মোঃ কামাল মিয়া

ক্রমিক ১৮৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ৫১

পরিচয়

শহীদ মো: কামাল মিয়া ১৯৮৫ সালের ২ মে নরসিংদীর বেলাবর থানার রিনাইবার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন একজন অটোরিকশা চালক। বর্তমান ঠিকানা ঢাকা জেলার পল্টনের শান্তিনগরে পিতা মৃত আব্দুস সাত্তার, মাতা রওশন আরা। পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

কামাল মিয়া ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার চার সন্তানের মধ্যে বড় মেয়ে বিবাহিত। বাকি তিন সন্তানকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে পড়ালেখা করাচ্ছিলেন তিনি। মেজ মেয়ে সুরভী আক্তার রামপুরা টিভি সেন্টার মাদরাসায় অধ্যয়নরত, ছোট মেয়ে সুরাইয়া আক্তার সেগুনবাগিচায় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, একমাত্র ছেলে নয় বছর বয়সী ইয়াসিন মিয়া মালিবাগ চৌধুরী পাড়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত। কামাল মিয়া তার স্বল্প আয় দিয়েও সন্তানগুলোকে বড় ও আদর্শ মানুষ করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এছাড়া তার বড় মেয়ে বিবাহিত হলেও তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে হয়। বর্তমানে কামাল মিয়াকে হারিয়ে তার পরিবার শোকে মুহ্যমান। সন্তানদের পড়ালেখা প্রায় বন্ধের উপক্রম, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মুখে। তার স্ত্রী মানসিক,আর্থিক সবভাবেই ভেঙে পড়েছেন।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

২০২৪ এর ১৯ জুলাই। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তুমুল আকার নিয়েছে। একদিকে ছাত্র-জনতা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে পুলিশ বাহিনি ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করেই যাচ্ছে। আবার আন্দোলন দমিয়ে দেয়ার জন্য তৎকালীন সরকার ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে৷ তাই দেশের কোথায় কি হচ্ছে কেউ জানতে পারছেনা, বিশ্ববাসী জানতে পারছেনা বাংলাদেশে কি হচ্ছে!

সেদিন বিকালে বাসা থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন কামাল মিয়া। পরিস্থিতি ভালোনা। পুলিশ আন্দোলন ঠেকাতে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ছে এমনই এক গুলিতে আহত হন নিরপরাধ নিরীহ কামাল। পরে পথচারীরা তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। বাদ মাগরিব ৭ টার দিকে তার বাসায় ফোন করে জানানো হয় তার আহত হওয়ার কথা। সন্ধ্যা ৭ টা ৫৫ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শহীদ কামালকে তার নিজ গ্রাম নরসিংদীতে দাফন করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন এবং তার পরিবারের উপর রহম করুন।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান।

২. বিবাহিত মেয়ের খরচ চালিয়ে যাওয়া।

৩. শহীদের সন্তানদের পড়াশুনার যাবতীয় খরচ বহন করা ও শিক্ষবৃত্তির ব্যবস্থা করা।

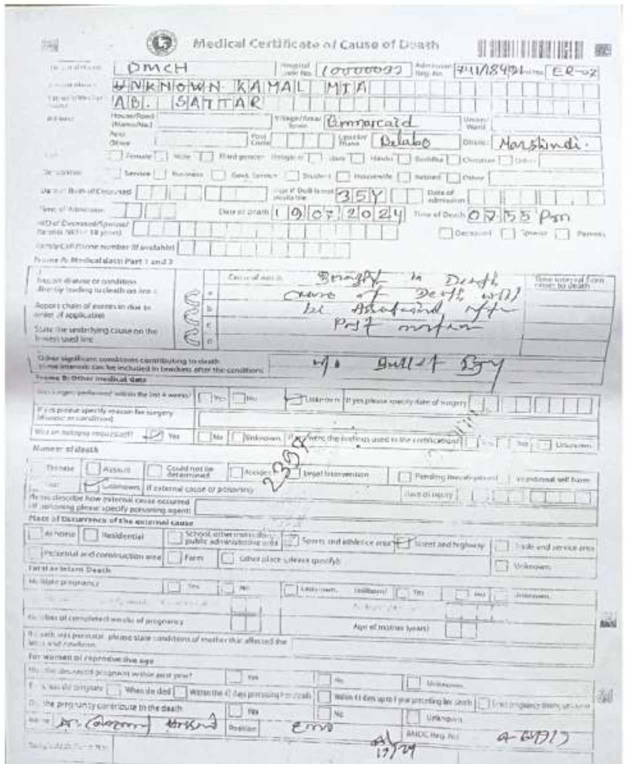
Medical Certificate of Cause of Death

DMCH

UNKNOWN KAMAL MIA

AB. SATTAR

Belabo

Narshindi

35Y

Date of Death: 19 07 2024

Time of Death: 07 55 Pm

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
কামাল মিয়া
Name
KAMAL MIA
পিতা
আঃ ছাত্তার
মাতা
রসুনারা
Date of Birth 02 May 1985
NID No 688 476 6129

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
পৃষ্ঠা নং 1006
তারিখ ২০/০৭/২৪ইং
মৃতের নাম কামাল মিয়া
পিতা/স্বামীর নাম মৃত আব্দুল ছাত্তার বয়স (৩৫)
ময়না তদন্ত নং ৩০৭৩/২০২৪ইং তারিখ ২০/০৭/২৪ইং
ময়না তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পুরো নাম	: মো: কামাল মিয়া
পেশা	: অটোরিকশা চালক
স্হায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রিনাইবার, ইউনিয়ন: রিনাইবার, থানা: বেলাবর, জেলা: নরসিংদী
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: বটতলার গলি, এলাকা: শান্তিনগর ৫৩/১১, থানা: পল্টন, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: মৃত আব্দুস সাত্তার
মাতার নাম	: রওশন আরা
ঘটনার স্থান	: শান্তিনগর (পল্টন এলাকা)
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার তারিখ	: তারিখ: ১৯/০৭/২০২৪, সময় - ৭.০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: তারিখ : ১৯/০৭/২০২৪, সময়: সন্ধ্যা ৭:৫৫টা
কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

শহীদ শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত

ক্রমিক ১৮৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৫২

প্রারম্ভিকতা

আনন্দ মিছিল থেকে ফেরার পথে সৎ ও হালাল ব্যবসায়ী শহীদ শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে পুলিশ কতৃক গুলি বৃদ্ধ হয়ে হঠাৎ অকালে মারা যান। দেশের জন্য মহান ব্রত নিয়ে আত্মত্যাগের ইতিহাস অল্প কয়েকজনই রচনা করেন। যারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তারা শুধু নিজেদের জন্য নয়, পুরো জাতির জন্য এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকেন। তাদের এ আত্মত্যাগ তখন হয়ে দাঁড়ায় দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির রক্ষাকবচ। এমন ব্যক্তিরা শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিক এবং নৈতিক শক্তি দিয়ে আগলে রাখেন জাতিকে। তাদের সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে ওঠে আলোকবর্তিকা। ইতিহাসের পাতায় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বীরদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে এবং তারা জাতির হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকেন।

পরিচিতি

শহীদ সাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত ১৯৬৪ সালের ২ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ইলাশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা হলেন আব্দুল মাজীদ ও আরফাতের নেছা। তিনি গাজিপুরের টঙ্গীতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যবসা করতেন। শাহাদাত হোসেনের আয়ের মাধ্যম ছিল ব্যবসা। এছাড়াও ওনার টঙ্গীতে নিজস্ব পাকা বাড়ি রয়েছে। উনার গ্রামের বাড়িতেও কিছু জায়গা জমি আছে। শাহাদাত এর ছেলে আবু নাসের হামজার বয়স ২৬। তিনি উনার ব্যবসা দেখাশোনা করছেন। তার ছোট মেয়ে ফাতেমা আক্তার হেফজ শেষ করেছেন। বর্তমানে নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই সংগঠিত মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় মুক্তিকামী নীরিহ ছাত্র জনতা।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

এমনই একজন বীর শহীদ শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত। তিনি ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ জনতার সাথে যোগ দেয়। তিনি ছাত্র-জনতার সাথে মহাখালী পর্যন্ত যায়। আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের গণআন্দোলনে রূপ নেয়। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে টঙ্গী থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাসিন্দা শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত। কিন্তু ঢাকায় যাওয়ার পূর্বেই জানতে পারেন গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। এরপর রাজনৈতিক সহকর্মীদের সাথে আনন্দ মিছিল নিয়ে টঙ্গীতে ফিরছিলেন তিনি কিন্তু তার আর ফেরা হয়নি।

শাহাদাত বরণ

এলাকায় দানবির ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত ইলাশপুর বড় মসজিদ এবং মাদ্রাসার সভাপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে টঙ্গীতে ব্যবসা করতেন। শহীদ শাখাওয়াত হোসেনের জামাতা ইকবাল হোসেন কুমিল্লার কাগজকে বলেন ব্যবসায়ীক কাজে তিনি দীর্ঘদিন থেকেই টঙ্গিতে বসবাস করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট যখন শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, সেই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ও তার অন্যান্য রাজনৈতিক সহকর্মীরা টঙ্গী থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু তারা ঢাকায় যাওয়ার পূর্বেই খবর আসে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেছেন। এরপর তারা আনন্দ মিছিল করতে করতে টঙ্গীতে ফেরার জন্য রওনা হন। কিন্তু ফেরার পথে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উত্তরা আজমপুর এলাকায় তাদের লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুড়তে থাকে। এসময় আমার শ্বশুরের মাথায় ও পেটে গুলি লাগে। তাকে উদ্ধার কওে স্থানীয় জাহানা ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে টঙ্গি মেডিকেল আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানাজা ও দাফন

৫ আগস্ট রাত ৯ টার দিকে টঙ্গীতে তার প্রথম জানাজার মানুষ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সেখান থেকে তার মরদেহ কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় রাত সাড়ে ৩ টার দিকে আমরা চৌদ্দগ্রাম এসে পৌঁছাই। পরদিন ৬ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়ের অনুভূতি

আমার শ্বশুর অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তার এই মৃত্যু আমরা মেনে নিতে পারছি না। তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ হত্যাকান্ডের বিচার চাই। ক্ষতিপূরণ চাই। এ বিষয়ে আমরা মামলা দায়ের করব।

শহীদ শাখাওয়াত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ইলাশপুর, ধনপুর গ্রামের আবদুল মজিদের পুত্র। তার বয়স হয়েছিলো ৬১ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ মেয়ে ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

প্রস্তাবনা

১। রেখে যাওয়া সন্তানের ব্যবসার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা

২। হিফজ শেষ করে নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে ফাতেমা আক্তারের পড়ালেখায় সহযোগিতা করা।

এক নজরে শহীদ শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাতের তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	: শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত
পিতার নাম	: আব্দুল মজিদ
মাতার নাম	: আরাফাতের নেছা
শহীদের জন্ম	: ২ আগস্ট ১৯৬৪
পেশা/পদবী	: ব্যবসা
বর্তমান ঠিকানা	: হোল্ডিং নং ১১২, আরিচপুর, টঙ্গী, গাজীপুর
ঘটানার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
ঘটনার স্থান	: আজমপুর, ঢাকা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ
মৃত্যুর তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট

মেধা
কোটা

শোকের রং লাল
আমি ৭১ দেখিনি কিন্তু ২৪ দেখছি
Gen Z
আমার ক্যাম্পাসে রক্ত কেন?
দেশটা আমাদের কারো বাপের না!!
আমরা অনেক জন
মুগ্ধ
পানি লাগবে?
দিনে নাটক রাতে আটক
আমার একটা ছোট্ট বোন আছে স্যার!!
জুলাই বিজয় মাস...
ঠক! ঠক! বাসায় ছাত্র আছে?
সবুজ কই
আবু সাঈদ
আমরা ছাত্র
ARMY-IBA
BNMPC, BRAC
বন্ধ করিনাই একা একা বন্ধ হয়ে গেছে
Public × Private
১ দফা ১ দাবি
Silence — Loud
"আমার বিচার তুমি কর, তোমার বিচার করবে কে?"
শোন মহাজন! আমি নই তো একজন...

শহীদ মো: অহিদ মিয়া

ক্রমিক ১৮৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৫৩

পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ অহিদ মিয়া গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানায় ১৯৯৭ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: খোরশেদ এবং মাতার নাম ফুরকান বিবি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর আর পড়ালেখা করার সুযোগ পাননি মোহাম্মদ অহিদ মিয়া। এরপরই ঢুকে যান চাকরি জগতে। পোশাক কারখানার হেলপার হিসেবে নিয়োগ পান। স্বল্প বেতনে মাকে নিয়ে ভালোই বেশ ভালো চলছিল শহীদের সংসার। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, হঠাৎ তার বড় বোনের তালাক হয়ে যায়। তালাকপ্রাপ্ত বোনের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। এরপর অপারেটরের কাজ শিখে ২০২২ সালে যোগ দেন শান টেক্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে। অপারেটর হিসেবে তার বেতন ছিল ১৫ হাজার টাকা।

পটভূমি

বাংলাদেশে গত ১৫ বছর ধরে একটিমাত্র শাসকগোষ্ঠী ছিল ক্ষমতায় যারা নির্বাচন কিংবা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য নির্যাতন কিংবা দমন-পীড়ন

সহ অনেক কিছু তারা করেছে। তারা মিডিয়াকে ভয়াবহভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আদালত অকার্যকর হয়ে গেছে। মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন কোনো কাজ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেরুদণ্ডহীন মাস্তানদের সমাবেশ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তৈরি করেছিল। দুর্নীতির কারণে একদিকে যেমন জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে, অন্যদিকে হাজারো কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এর মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের গোপন চুক্তি, মেগাপ্রকল্পের কারণে মানুষের মধ্যে বিষণ্ণতা বাসা বেঁধেছিল। সবশেষ ২০২৪ সালের প্রহসনের নির্বাচনের পর মানুষের মধ্যে একটি হতাশা তৈরি হয়, একটা জাতিগত ডিপ্রেশন তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা মানুষের মধ্যে অসহায়ত্ব তৈরি করেছিল। আওয়ামীলীগের বিকল্প বিএনপি-জামায়াত জোটের অতীত মানুষ দেখেছে। জাতীয় পার্টিকেও তারা দেখেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা বেশি সুখের ছিল না। এজন্য জনগণের মনে ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও গত ১৫ বছরের অন্যান্য আন্দোলনগুলো সরকার পতনের দিকে যায়নি। কিন্তু মানুষের মাঝে প্রশ্ন ছিল যে এগুলো কতদিন চলবে? স্বৈরাচারী ব্যবস্থা, মানুষকে অপমান, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা আর কতদিন চলবে?

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যে সরকার পতন আন্দোলনের দিকে গেল, তা কোনো পরিকল্পিত ঘটনা ছিল না। সমাজের মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে আন্দোলনে। শুধু এই সময়ের আন্দোলন দিয়েও এটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এখানে মূল বিষয় হলো এর সূত্রপাত রাজনৈতিক নেতৃত্বে হয়নি। গণঅভ্যুত্থান তো আগেও দেখেছি। ১৯৬৯, ১৯৯০ এ গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। '৬৯ এ রাজনৈতিক দলগুলো যেমন–আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ সামনে ছিল। এই আন্দোলনের ফল মুক্তিযুদ্ধ। আরেকটা গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল ১৯৯০ সালে এরশাদ পতন আন্দোলন। তখন আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বামদলের নেতৃত্বে তিনটি রাজনৈতিক জোটের সম্মিলিত আন্দোলন হয়। এবারের জুলাই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, এর কোনো নির্দিষ্ট নেতা ছিল না। কিন্তু যার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সেই স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা আন্দোলন দমাতে গিয়ে যা যা করলেন, তার সবই এটাকে সরকার পতন আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছে।

কোটা বাতিলের পরিপত্র আদালত বাতিল করে দেওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হলো। তাদের অনেকে ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছিল। তারা আবার অনিশ্চয়তায় পড়ল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোটা সংস্কার আন্দোলন আবার শুরু হয়। প্রথম থেকেই শান্তিপূর্ণ হওয়ায় জনগণের সমর্থন পায়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শান্তিপূর্ণ মিছিলে বা সমাবেশে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ আক্রমণ করল, মেয়েদের ওপর আক্রমণ করা হলো, এরপর আন্দোলনকে অবজ্ঞা করে ধূর্ত শেখ হাসিনা বক্তব্য দিলেন। এছাড়াও ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ, র‍্যাব শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করল, এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলল। ১৬ জুলাই আবু সাঈদসহ সাতজন যখন নিহত হলো, তখন মানুষের প্রতিক্রিয়া এমন হলো যে আর কত সহ্য করা যায়? আবু সাঈদের ওপর যেভাবে গুলি হয়েছে এর তো কোনোভাবেই যৌক্তিকতা নেই। এর প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ সমর্থন দিলো আন্দোলনে। একপর্যায়ে পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা যখন পারছিল না, তখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা এলো, যেটা ছিল সরকারের ধারণার বাইরে। পরে কলেজের শিক্ষার্থীরা, স্কুলের শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত আন্দোলনে যোগ দিলো, পুরো দেশে স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলন।

যেভাবে শহীদ হন

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার সংবাদে বিকাল তিনটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। অহিদ মিয়া উত্তরার আজমপুরের আমীর কমপ্লেক্স এলাকায় আসার পর বিজয় মিছিল করার আগেই গুলিবিদ্ধ হন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হাতে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে ডাক্তার সংকট অবস্থা দেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেন। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে রাতেই ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। এদিকে পরিবার খুঁজতে থাকে ইয়াতিম এই ছেলেকে। পরে ৭ তারিখ পরিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে তার লাশ খুঁজে পায় এবং ৮ তারিখ সকাল ৯ টায় পরিবার লাশ গ্রহন করে।

জানাজা ও দাফন

৮ আগস্ট শহীদ মো: অহিদ মিয়ার নিজ এলাকায় বাদ যোহর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে গাজীপুরের টঙ্গী মরখুন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

অনুভূতি ও মন্তব্য

শহীদ অহিদের বন্ধু মো: তানভীর আহমেদ বলেন, সে আমার খুব কাছের বন্ধু। হাসিখুশি নামাজি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি পরোপকারী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি দেশের জন্য শাহাদত বরণ করেন। বৃদ্ধা মা ও তালাকপ্রাপ্তা বোনের এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য সহযোগিতার আহবান করেন। বন্ধুর এই করুণ মৃত্যুর সুষ্ঠ বিচারের দাবি করেন।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম অহিদ মিয়ার অকাল মৃত্যুতে বয়স্কা বৃদ্ধা মা এবং তালাকপ্রাপ্তা বোন অতীব কষ্টে জীবন যাপন করছে। প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে বৃদ্ধা মা এখন দিশেহারা।

প্রস্তাবনা

১। শহীদের পরিবারের জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। মা ও বোনের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য একটা স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করে পরিবারের পাশে দাড়ানো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র
মোঃ অহিদ মিয়া
মোঃ খোরশেদ
ফোরকান বিবি
Date of Birth 02 May 1997
NID No. 375 296 1056

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কবরস্থান (টঙ্গী অঞ্চল-১), গাজীপুর

780

একনজরে শহীদ মোহাম্মদ অহিদ মিয়ার ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ মো: অহিদ মিয়া
জন্ম	: ২ মে ১৯৯৭
জন্মস্থান	: টঙ্গী, গাজীপুর
পেশা	: চাকরিজীবী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব আরিচপুর, ইউনিয়ন: সিট কর্পোরেশন, থানা: টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর
পিতা	: মৃত মোহাম্মদ খোরশেদ
মাতা	: মোসা: ফোরখান বিবি
পেশা	: গৃহিণী, বয়স : ৫২ বছর
মাসিক আয়	: ১৫০০০ টাকা।
আয়ের উৎস	: চাকরি

সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে লুফে নেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তখনই স্কুল পড়ুয়া কিশোর শহীদ মোহাম্মদ সামিউ আমান নুর ঐ গণবিপ্লবে নিজেকে সম্পৃক্ত করার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। সমাজে নম্র ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত কিশোর শহীদ মোহাম্মদ সামিউ আমান নুর ছিল সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এক লড়াকু তরুণ সৈনিক। তার দৃঢ়তা ও সাহস দেখে পরবর্তী তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে প্রেরণা যোগাবে।

শহীদ মো: সামিউ আমান নুর

ক্রমিক: ১৮৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৫৪

পরিচিতি

শহীদ মো: সামিউ আমান নূর ২০১০ সালের ১২ নভেম্বর গাজীপুর জেলার পূর্ব আচিনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ৫৭ বছর বয়সী প্রবাসি এবং মাথা শাহানুরা আমান গৃহিণী। মো: সামিউ আমান নূর সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তার দুজন বোন আছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলায়ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। সামিউর শাহাদতে এলাকায় শোকে স্তব্ধ। সকলের কাছে খুবই পছন্দনীয় ছিলেন তিনি।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ছাত্ররাই অজেয়- এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এ সফলতা যতটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজের বিকল অবস্থাকে সচল করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্রে ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। এর ফলে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, র‍্যাব সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই মুক্তিকামী জনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

ছাত্র আন্দোলন 'সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে লুফে নেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তখনই তাদের যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে মুক্তিকামী ছাত্র জনতার সাথে ঝাপিয়ে পড়ে মেধাবী অকুতোভয় বীর সৈনিক সামিউ আমান নূর।

শাহাদাত বরণ

বীর যোদ্ধা শহীদ মো: সামিউ আমান নূর ৫ আগস্ট সোমবার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ জনতার সাথে যোগ দেয়। মুক্তিকামী ছাত্র জনতার আন্দোলনের তোপের মুখে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন অবধারিত ছিল এবং অসংখ্য তাজা প্রাণের

বিনিময়ে তা হলোও। সামিউ আমান বিকাল ৫.০০ ঘটিকার সময় উত্তরার বিএনএস ফ্লাইওভার এলাকায় বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার পোষা সন্ত্রাসীরা তখনো বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজয় মিছিলে জয়োল্লাসে মেতে উঠা নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও ঘাতক পুলিশ নির্বিচারে

গুলিবর্ষণ শুরু করে। মুহূর্তেই রাজপথ রূপ নেয় রণক্ষেত্রে; বিজয়ের আনন্দ হয়ে যায় শোকাচ্ছন্ন। পরিস্থিতির এক পর্যায়ে ঘাতকের ছোঁড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সামিউ আমান নূর। প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রতিকূল পরিস্থিতে ঘটনাস্থল থেকে সুকৌশলে তাকে উদ্ধার করে উত্তরা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় সন্ধ্যায় ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে শহীদের মরদেহ গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার বাগমারা নিজ গ্রামে বিপ্লবী সামিউ আমানের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ মো: সামিউ আমান নূর এর চাচা মোঃ নাসির উদ্দীন নিজের ভাতিজা সম্পর্কে জানান, সে আমার অত্যন্ত স্নেহের মেধাবী ভাতিজা ছিলেন। সে সবসময় হাসিমুখে মামা বলে ডাকতো। আমি খুবই স্নেহ করতাম। সে ইংরেজিতে কবিতা লিখতো এবং ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী ছিলো। আমি তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

প্রস্তাবনা

৩. রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বকৃতি ও মর্যাদা প্রদান
২. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
৩. ছোট বোনদের যাবতীয় খরচ বহন করা

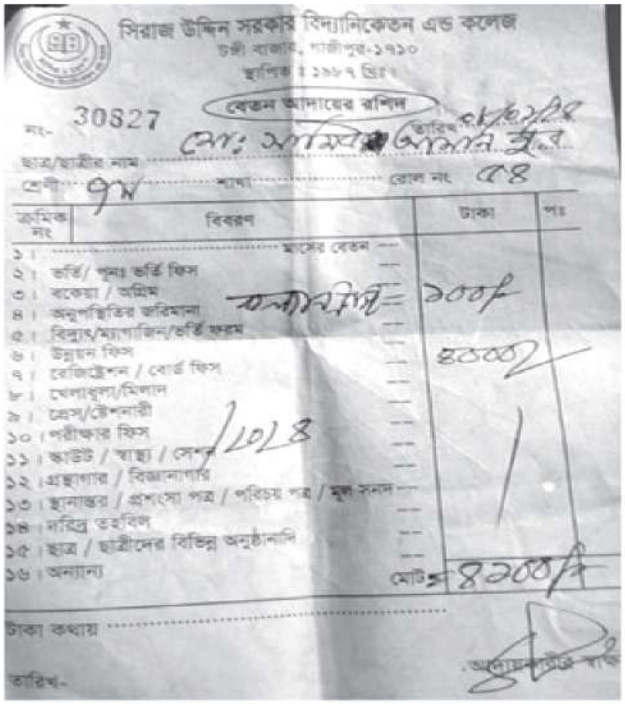
সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন এন্ড কলেজ
টঙ্গী বাজার, গাজীপুর-১৭১০
স্থাপিত ঃ ১৯৮৭ খ্রিঃ

বেতন আদায়ের রশিদ

নং- 30827

ছাত্র/ছাত্রীর নাম মো: সামিউ আমান নূর

শ্রেণী ৭ম শাখা রোল নং ৫৪

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	পঃ
১।	মাসের বেতন		
২।	ভর্তি/ পুনঃ ভর্তি ফিস		
৩।	বকেয়া / অগ্রিম	৯০০/-	
৪।	অনুপস্থিতির জরিমানা		
৫।	বিদ্যুৎ/ম্যাগাজিন/ভর্তি ফরম		
৬।	উন্নয়ন ফিস	৪০০০/	
৭।	রেজিস্ট্রেশন / বোর্ড ফিস		
৮।	খেলাধুলা/মিলাদ		
৯।	প্রেস/স্টেশনারী		
১০।	পরীক্ষার ফিস		
১১।	স্কাউট / স্বাস্থ্য / সেশন		
১২।	গ্রন্থাগার / বিজ্ঞানাগার		
১৩।	স্থানান্তর / প্রশংসা পত্র / পরিচয় পত্র / মূল সনদ		
১৪।	দরিদ্র তহবিল		
১৫।	ছাত্র / ছাত্রীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি		
১৬।	অন্যান্য		
	মোট=	৪৯০০/-	

টাকা কথায়

তারিখ-

আদায়কারীর স্বাক্ষর

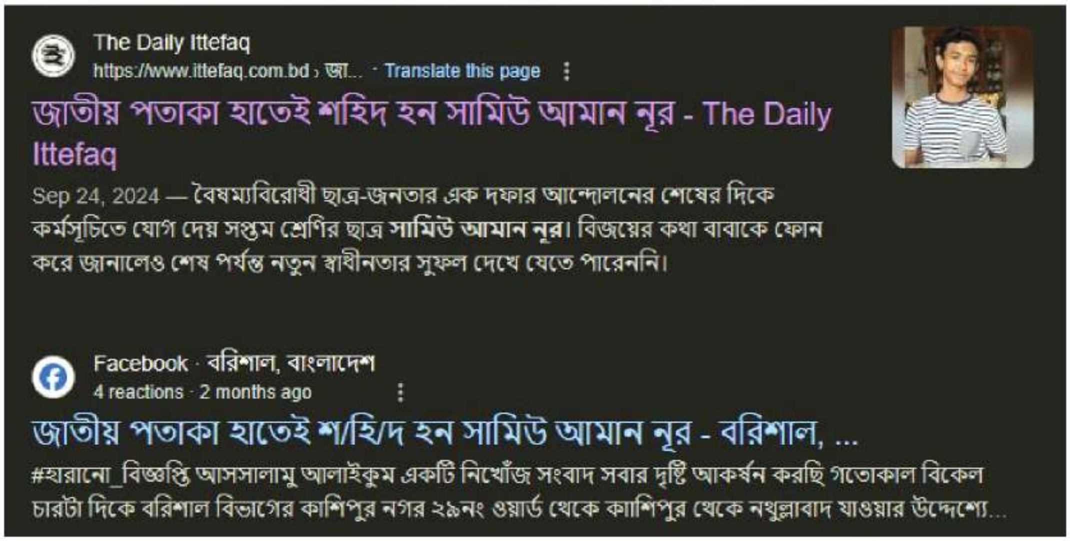

একনজরে শহীদ মোঃ সামিউ আমান নূর

নাম	: মোঃ সামিউ আমান নুর
জন্ম তারিখ	: ১২ নভেম্বর ২০১০
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: সিরাজউদ্দীন সরকার বিদ্যানিকেতন এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র
ঘটনার স্থান	: বিএনএস ফ্লাইওভার এলাকা, উত্তরা
আক্রমণকারী	: স্বৈরশাসকের পেটুয়া ছাত্রলীগ ও পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম বাগমারায়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ৩৩৮ কাজী নজরুল ইসলাম রোড, ইউনিয়ন: সিটি কর্পোরেশন, থানা: টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর
পিতা	: মোঃ আমান উল্লাহ পেশা ও বয়স: ৫৭ বছর (প্রবাসী)
মাতা	: শাহনু আমান পেশা ও বয়স : গৃহিণী ও ৪৫ বছর
মাসিক আয়	: ৩০০০০
আয়ের উৎস	: বাড়ি ভাড়া
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

শহীদ মো: রুখতন মিয়া

ক্রমিক: ১৮৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৫৫

পরিচিতি

মো: রুখতন মিয়া অকুতোভয় সৈনিক, যিনি জুলাই বিপ্লবের বীর শহীদ। তার জন্ম ৫ জুলাই ১৯৭৮ সালে, পিতা আদর আলী এবং মাতা সহর বানুর আদরের পুত্র তিনি। তার স্থায়ী ঠিকানা নারাচাতল ইউনিয়নের লুনেশ্বর থানার আটপাড়া, জেলা নেত্রকোনা। বর্তমানে তিনি বাস করেন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার সফিপুর এলাকার আন্দারমানিক রোডে। পেশায় তিনি দারোয়ান হলেও, তার একমাত্র পরিচয় আজ চব্বিশের গর্বিত শহীদ, দেশ-মাতৃকার সাহসী সন্তান। তার আত্মত্যাগ আমাদের কাছে চিরকালীন এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

আন্দোলন-সংগ্রাম-শহীদ

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে ঘটে যাওয়া ছাত্র জনতার আন্দোলন, শহীদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলে, কিছু মূল বিষয় উত্থাপন করা যেতে পারে:

শহীদরা আন্দোলনের চেতনাকে জীবন্ত রাখেন এবং অন্যদেরকে সংগ্রামের জন্য প্রেরণা দেন। তাদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে সামাজিক ন্যায় এবং উন্নতির জন্য আন্দোলন করার গুরুত্ব বুঝতে সহায়ক হয়। শহীদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। শহীদের আত্মদানের মাধ্যমে

ইতিহাসের একটি অংশ হিসেবে তাদের স্মৃতি চিরকাল মনে রাখা হয়। শহীদদের আত্মত্যাগ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদের একটি প্রতীক। তাদের সাহসী পদক্ষেপ অন্যদেরকে দুর্নীতি, নিপীড়ন ও সামাজিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে। শহীদদের আত্মত্যাগ অনেক সময় সমাজে বা দেশে ব্যাপক পরিবর্তন আনার প্রেরণা দেয়। আন্দোলন সফল হলে তা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি মাধ্যম হয়। শহীদরা সংগঠনের শক্তি ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেন। তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা একত্রিত হয়ে একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। শহীদের গুরুত্ব শুধু তাদের আত্মত্যাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তারা আন্দোলনের একটি স্থায়ী চিহ্ন হয়ে ওঠেন, যাদের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রাম চলতে থাকে।

শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়। আন্দোলনটি ছিল কোটা বিরোধী আন্দোলন। ফ্যাসিস্ট এই আন্দোলন দমন করতে প্রয়োগ করে শক্তি। প্রয়োগ করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য শব্দ। বিস্ফোরিত বিক্ষোভে আন্দোলন রূপ নেয় বৈষম্যবিরোধী নামে। তারপরই শুরু হয় তুমুল নির্যাতন। নির্যাতনে আন্দোলনকারীরা হারাতে থাকেন নিজের চোখ, হাত, জবান ও জান। রাজপথ রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আন্দোলন দাঁড়িয়ে যায় এক দফায়। পনর বছর বাংলাদেশের ঘাড়ের উপর বসা দৈত্যের পতনের আওয়াজ ওঠে। সরকার পতনের দাবীতে রাজপথ নাচতে থাকে। এই দাবী সফল হয়। পালিয়ে যায় হাসিনা।

শহীদের রক্ত, শহীদের ত্যাগ আমাদের সম্বল। একটি দেশ, জাতি, সংগঠনের প্রেরণা। তারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা। গত হওয়া গৌরবময় ইতিহাস। এই ইতিহাস চর্চা করা জেনারেশনের দায়িত্ব। তাদের ভুলে গেলে, তারা অবমূল্যায়নে পড়লে ক্রান্তিকালে উদ্ধারের সূত্রশূন্য হয়ে যাবে। শহীদরা আমাদের বীর। আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা তাই শ্রদ্ধার কণ্ঠে বলি লও লও লও সালাম হে আমার বীর ভ্রাতা। শহীদ রুখতন মিয়া আমার বীর ভ্রাতা। তোমায় সালাম।

যেভাবে শহীদ হন

৫ আগস্ট খুনি, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে যায়। লাখো জনতার উত্তাল স্লোগানে কেঁপে ওঠে হাসিনার গদি। চোরের মতো পালাতে বাধ্য হয়। জনস্রোত নামে বিজয়ের মিছিল নিয়ে। মোঃ রুখতন মিয়া দ্রুত বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তার মনেও আনন্দের দোলা। ঘর ছাড়েন আগস্টের ৫ তারিখে আনুমানিক ৩ টা ৩০ মিনিটে। বিজয় মিছিল পৌঁছে সফিপুর আনসার একাডেমির ১ নং গেটে।

মিছিল ১ নং গেটে আসতেই মিছিলে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে হাসিনার দোসরবাহিনী। সময় তখন বিকাল প্রায় চারটা। রুখতন মিয়া মিছিলের সম্মুখভাগে। পনের বছর কথা বলতে পারেনি। স্তব্ধ ছিল মুখ। রুদ্ধ ছিল জবান। স্বৈরাচার, জালিম হাসিনার পালানোর খবরে আনন্দে মিছিল আত্মহারা। মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্রকাশ করছেন আনন্দ। হঠাৎ গুলির শব্দে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আনসারের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন রুখতন মিয়া। বিজয় মিছিল মূহুর্তে বিষাদময় হয়ে যায়। সঙ্গীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান গাজীপুর সদর হাসপাতালে। সন্ধ্যা প্রায় ৬ টায় চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লাশ স্বজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানাযা ও দাফন

পরবর্তীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জন্মস্থান নেত্রকোনায়। সেখানে জানাজা শেষে কবর দেওয়া হয় স্থানীয় কবরস্থানে।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

রেনা বেগম রুখতন মিয়ার প্রতিবেশী। তার মতে রুখতন মিয়া একজন ভালো মানুষ। তিনি কারও সাথে কখনও খারাপ আচরণ করতেন না। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন।

আমেনা বেগম বলেন রুখতন মিয়া কখনও কারও সাথে কটু কথা বলতেন না। তিনি ছিলেন সাহসী মানুষ। অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ব্যক্তি হিসেবে খুব ভাল ছিলেন।

পারিবারিক অবস্থা

মোঃ রুখতন মিয়া দরিদ্র পরিবারের সন্তান। নিত্যদিনের সঙ্গী তার দুঃখ ও দারিদ্রতা। গ্রামের বাড়িতে দুই শতক জমি তার সম্বল। জীবনে সঞ্চয়ের কিছু নেই। পেশায় তিনি দারোয়ান। স্বল্প বেতন। কষ্টে জীবন যাচ্ছে। তার তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে সাব্বির। বয়স ২৪ বছর। পিতার সংসারে সহযোগিতা করতে তিনিও বেছে নেন শ্রমিক জীবন। মেঝো ছেলে রাব্বির বয়স ২০ বছর। তিনি কাঁচামালের ব্যবসা করেন। ছোট ছেলে তোফায়েল ৯ম শ্রেণী আর মেয়ে ৫ম শ্রেণীতে পড়ছেন। স্ত্রী ও ১ মেয়ে ও ৩ ছেলে নিয়ে নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। বাড়ি নেই,ঘর নেই,সঞ্চয়হীন জীবন। কষ্ট তাদের নিত্য সঙ্গী। পরিবারের প্রধান মৃত্যু বরণ করায় তারা এখন বিপর্যস্ত। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব নাজুক। জীবন চালানো খুব কষ্টের।

প্রস্তাবনা ১

- শহীদের পরিবার নিঃস্ব। প্রথমেই তাদের এককালীন অনুদানের দরকার।
- স্থায়ী বাসস্থানের দরকার।
- স্ত্রীকে দর্জি কাজ শিখিয়ে সেলাই মেশিন কিনে দিয়ে স্বাবলম্বী করে দেওয়া যায়।
- দুধালো গাভীও কিনে দেওয়া যায়।

প্রস্তাবনা ২

- ছেলেদের ব্যবসার পুঁজি দিয়ে কর্মক্ষম করে দেওয়া।
- লেখাপড়া যারা করছে তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া।

প্রস্তাবনা ৩

- নিয়মিত মাসিক ভাতা চালু করা।
- মেয়েকে বিয়ের সময় বিয়ের খরচ দেওয়া।

শহীদ শহীদ মোঃ রুখতন মিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

নাম	: মোঃ রুখতন মিয়া
জন্ম তারিখ	: ০৫-০৭-১৯৭৮
পিতা	: আদর আলী
মাতা	: সহর বানু
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নারাচাতল, ইউনিয়ন: লুনেস্বরম থানা: আটপাড়া জেলা: নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: আন্দারমানিক রোড, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

স্বাধীনতার
সূর্যোদয়

নতুন
পানিতে
সফর
এবার
হে মাঝি
সিন্দাবাদ

শহীদ জিয়াউর রহমান

ক্রমিক: ১৮৮

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৫৬

পরিচিতি

শহীদ জিয়াউর রহমান ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে দিনাজপুরের বিড়াল থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: আব্দুল কাফী মাতা খালেদা বেগম। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি কাজের জন্য ঢাকা শহরে আসেন। ইন ফেব্রিক্স লিঃ কিউসি পদে চাকুরী করতেন। মৃত্যুকালে তার এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলে মোহাম্মদ তানজিলুর রহমান শারাফ নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। মেয়ে মোছাম্মৎ জাফনা আক্তার জুঁই পড়াশোনা করে। পা পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিলেন গ্রামের বাড়িতে তেমন ঘর বাড়ি নেই। গাজীপুর একটি ভাড়া বাসাতে থাকতেন।

আন্দোলনে যোগদান ও শাহাদাত বরণ

একজন বীর শহীদ জিয়াউর রহমান। ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে অংশ নিতে ৮.৩০ মিনিটে বাসা থেকে বের হন শহীদ জিয়াউর রহমান ছাত্র জনতার মিছিলটি উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে আসলে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকারের ঘাতক ঘাতক পুলিশ বাহিনী শান্তিরপির ও ছাত্র-জনতার উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। শহীদ জিয়া রহমান তখন মিছিলের সামনে ছিলেন হঠাৎ একটি গুলি এসে তার পিঠে বৃদ্ধ হয় এবং পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। ছাত্র জনতা তাকে উদ্ধার করে উত্তরার রেড ক্রিসেন্ট হসপিটালে নিয়ে যায়, অবস্থার অবনতি দেখে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আনা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অবশেষে ৯ আগস্ট আইসিইউ তে থাকা অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৭.২০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন।

পারিবারিক অবস্থা

দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলে শহীদ জিয়াউর রহমান, যিনি জুলাই বিপ্লবের গর্বিত শহীদ। তার জন্ম তারিখ ২০-০২-১৯৮১ সালে, পিতা মো: আব্দুল কাফী এবং মাতা খালেদা বেগম। তার স্থায়ী ঠিকানা মুন্সিপাড়া ইউনিয়নের এমনগর থানার বিরল, জেলা দিনাজপুর। বর্তমানে তিনি গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার। বিজয়ের দিনে তাকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার খুনি পুলিশের গুলিতে শহীদ করা হয়, যা দেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। শহীদ জিয়াউরের স্ত্রী শাহানাজ আক্তার, বর্তমানে শহীদ পরিবারের সঙ্গে গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। তাদের ভোটার আইডিতে উল্লেখিত ঠিকানা মিরপুর, ঢাকা হলেও, তারা সেখান থেকে বের হয়ে গ্রামের শান্তিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জিয়াউর রহমান EN FABRIC LTD এ QC পদে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু তার আত্মত্যাগ দেশমাতার জন্য একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

শহীদ জিয়াউর রহমান দারিদ্রতার কষাঘাতে ছিলেন জর্জরিত। তিনি স্ত্রী, পুত্র,কন্যা নিয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন।

স্বল্প বেতনে কোন রকমে চলত সংসার। তার বেশকিছু ঋণ আছে। এক ছেলে মোহাম্মদ তানজিলুর রহমান শারাফ ৯ম শ্রেণীতে পাঠরত। মেয়ে মোছাঃ জাফনা আক্তার জুঁইও পড়াশোনা করতেন। বাবার মৃত্যুতে তাদের লেখাপড়া বন্ধ। তার মা ভাড়া বাসা ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছেন। তারা এখন প্রায় অভুক্ত, খেয়ে না খেয়ে যাচ্ছে দিন। সংসার খরচ, বাচ্চাদের পড়ালেখা বন্ধ সব মিলে দুর্বিষহ সময়। পরিবারটি চরম সংকটে সময় অতিক্রম করছে।

প্রতিবেশীর প্রত্যয়ন

প্রতিবেশী মাহবুবুর রহমানের মতে তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি নম্র,ভদ্র ও অমায়িক ছিলেন। দরিদ্র কিন্তু সততায় ছিলেম অনন্য। চাকরি করতেন, রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল তার মাঝে। শহীদ জিয়াউর রহমান সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন পরোপকারী।

প্রস্তাবনা ১

প্রথমেই তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা দরকার।
পরিবারটিকে স্বস্তির পরিবেশে রাখতে এককালীন অনুদান দরকার।
বাসা ভাড়ার ঋণ ৪০০০০ টাকা। এটিও পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রস্তাবনা ২

তাদের থাকার মতো কোন ঘরবাড়ি নাই
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক
সংসার চালানোর মতো মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

প্রস্তাবনা ৩

ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করা
শহীদের স্ত্রীকে সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম: মোঃ জিয়াউর রহমান
Name: MD. ZIAUR RAHMAN
পিতা: মোঃ আব্দুল কাফী
মাতা: খালেদা
Date of Birth: 20 Feb 1981
NID No. 915 138 2653

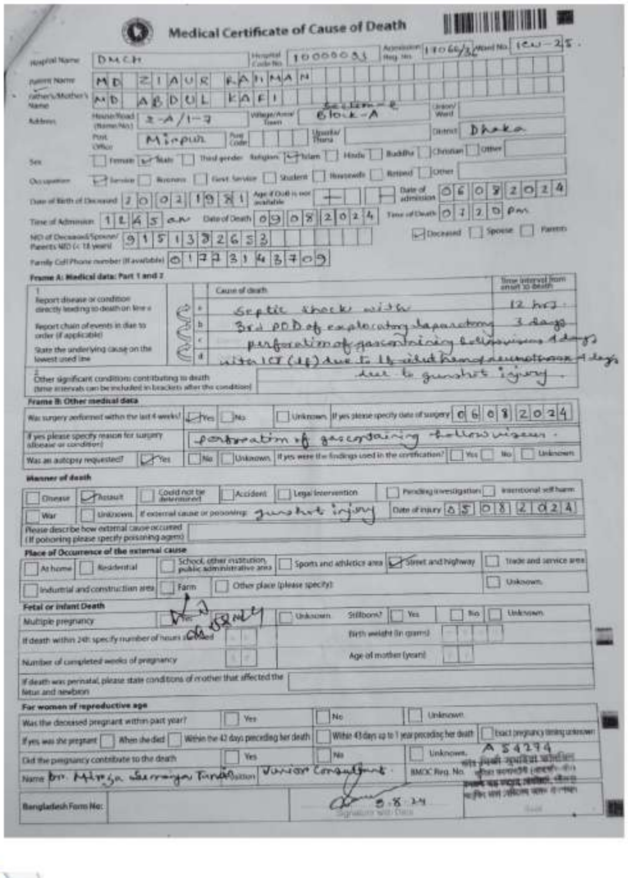

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH | Hospital Code No: 10000031 | Admission Reg. No: 14066/36 | Ward No: ICU-25
Patient Name: MD ZIAUR RAHMAN
Father's/Mother's Name: MD ABDUL KAFI
Address: House/Road: 2-A/1-7 | Village/Area/Town: Section-2 Block-A | District: Dhaka
Post Office: Mirpur
Sex: Male | Religion: Islam
Occupation: Service
Date of Birth of Deceased: 20 02 1981 | Date of admission: 06 08 2024
Time of Admission: 12 45 am | Date of Death: 09 08 2024 | Time of Death: 07 20 pm
NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 9151382653 | Deceased
Family Cell Phone number (if available): 01773143709

Frame A: Medical data: Part 1 and 2
Cause of death:
a. Septic shock with — 12 hrs
b. 3rd POD of exploratory laparotomy — 3 days
c. perforation of gas containing hollow viscus — 4 days
d. with ICT (Lt) due to Lt sided haemopneumothorax — 4 days
Other significant conditions contributing to death: due to gunshot injury.

Frame B: Other medical data
Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes | If yes please specify date of surgery: 06 08 2024
If yes please specify reason for surgery: perforation of gas containing hollow viscus.
Was an autopsy requested? Yes

Manner of death: Assault | If external cause or poisoning: gunshot injury | Date of injury: 05 08 2024
Place of Occurrence of the external cause: Street and highway

Name: Dr. Mirza [illegible] | Position: Junior Consultant | BMDC Reg. No: A 54274
Signature with Date: 9-8-24

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: জিয়াউর রহমান
জন্ম তারিখ	: ২০-০২-১৯৮১
পিতা	: মো: আব্দুল কাফী
মাতা	: খালেদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুন্সিপাড়া, ইউনিয়ন: এমনগর, থানা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: প্লট ৩০৮ বড় দেওয়া, এলাকা: আদর্শপাড়া, থানা: টঙ্গী, জেলা গাজীপুর
পরিবারের সদস্য	: ৩ জন
ঘটনার স্থান	: বিএনএস সেন্টার, বেস্ট বাই শোরুম এর সামনে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
মৃত্যুর তারিখ ও স্থান	: ০৯-০৮-২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কবর	: নিজ এলাকা, দিনাজপুরে

শহীদ মোহাম্মদ সাইফুল হাসান

ক্রমিক : ১৮৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৫৭

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ সাইফুল হাসান গাজীপুর জেলার টঙ্গী অঞ্চলের দারুল ইসলাম ট্রাস্ট আবাসনের বাসিন্দা । ১৯৭৩ সালে গাজীপুর জেলাতেই তার জন্ম। তার পিতা আবেদ আলী মোল্লা এবং মাতা মোসা: হাওয়াতুন খাতুন। তার দুজন সন্তান একজন অষ্টম শ্রেণীতে এবং আরেকজন উচ্চমাধ্যমিকে পড়ালেখা করেন ।

ব্যক্তিগত জীবন

শহীদ সাইফুল হাসান Badhan Hijra Sangha নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। তিনি সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া হিজরা সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং মেধা দিয়ে দ্রুতই সফলতার দিকে এগোচ্ছিলেন। তার বেতন ছিল ৫০ হাজার টাকা। পরিশ্রমী শহীদ সাইফুল পরিবারের খরচ চালাতে চাকুরীর পাশাপাশি জমির ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। অল্প অল্প জমানো টাকা দিয়ে নিজে একটি ফ্ল্যাট কেনেন দারুল ইসলাম ট্রাস্ট আবাসনে। পরিবারসহ সেই ফ্ল্যাটেই থাকতেন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সংগঠিত কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নীরিহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের নির্বিচার গুলিতে শহীদ হয় মুক্তিকামী জনতা।

আন্দোলনে যোগদান ও শাহাদাতের ঘটনা

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান স্বৈরাচার সরকার পতনের লক্ষে ছাত্র জনতা যেদিন লং মার্চের ডাক দেয় সেই ৫ আগস্ট সন্তান সহ শাহবাগের দিকে রওনা হন। যমুনা ফিউচার পার্ক এলাকা অতিক্রম করাকালীন হঠাৎই সেনাবাহিনী আক্রমন করে। সন্তানদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে এগিয়ে আসেন এবং হঠাৎ একটি গুলি তার মাথার ডান পাশে এসে লাগে। প্রচন্ড রক্তক্ষরণ এবং মাথার ঘিলু বের হয়ে আসছিল। ছোট্ট সন্তান কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঘাতক সরকারের বলি হয়ে প্রিয় সন্তানের সামনে পড়ে থাকে তার নিথর দেহটি। আবছা হয়ে আসে দৃষ্টি শক্তি। শেষ বারের মত স্নেহের সন্তানদের মমতাভরে দেখতে দেখতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেন। চোখের সামনে বাবার এমন আত্মত্যাগে বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সন্তান। এহেন পরিস্থিতিতে জনতা তার দেহটি উদ্ধার করে সাথে সাথে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। শহীদ সাইফুল হাসানকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পর্যবেক্ষণের পর মৃত ঘোষণা করেন।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে শহীদের মরদেহ নিজ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। নিজ মহল্লায় বাদ এশা জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে ট্রাস্টের কবরস্থানেই চিরনিদ্রায় দাফন করা হয় শহীদ মোহাম্মদ সাইফুল হাসানকে।

পারিবারিক অনুভূতি

দীর্ঘ দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা স্বৈরাচার সরকারের শোষণে ক্ষুব্ধ মুক্তিকামী জনতা ততক্ষণে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিজয় উল্লাসে মেতে উঠে। সরকার পতনের এই আনন্দের দিনে ছোট্ট সন্তান পিতার লাশ বয়ে নিয়ে যায় নিজ বাসায়। বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিয়তির এমন নির্মম পরিহাস যেন পরিবারের কেউই মেনে নিতে পারছিলোনা।

একমাত্র উপার্জনক্ষম স্বামীকে হারিয়ে ছোট্ট দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত শহীদ সাইফুল হাসানের স্ত্রী। সৎ, মেধাবী এবং যোগ্য করে তোলার বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন গুজরান করছেন তিনি। পাশাপাশি দ্রুত এ নির্মম হত্যার বিচার চেয়েছে শহীদের পরিবার পরিজন।

বড় ছেলে মোহাম্মাদ রাওশান রাফ ও তার বাবার সাথেই ছিল।পিতাপুত্র মিলেই গিয়েছিল শেখ হাসিনার পতন মিছিলে। ছেলের মতে তার বাবা একজন সৎ আদর্শবান পিতা।তিনি সামাজিক,রাজনৈতি সচেতন মানুষ ছিলেন। পরোপকারী, মিশুক মানুষ ছিলেন। পিতা হিসেবেও তার বাবা মহান বাবা। সত্য,ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন আপোষহীন। তার বাবার মৃত্যুশোকে তারা মুহ্যমান। তার বাবা দেশের জন্য সরাসরি দাঁড়িয়ে গেলেন বুলেটের সামনে।এটি তার বুককে গর্বে স্ফীত করে। বাবার জন্য তার গর্ব হয়।পাশাপাশি বাবার শূন্যতায় হৃদয় হাহাকার করে।

প্রস্তাবনা ১

শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া হোক।

মাসিক ভাতার ব্যবস্থাও করা হোক।

প্রস্তাবনা ২

লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ করতে সন্তানদের সমুদয় খরচ বহন করতে তাদের শিক্ষা ভাতা দেওয়া হোক।

স্ত্রীকে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
জন্ম	: ০১-০৩-১৯৭৩
পিতা	: মৃত মোহাম্মদ জাবেদ আলী মোল্লা
মাতা	: মোসা: হাওয়াতুন নেসা।
স্থায়ী ঠিকানা	: মহল্লা: আউচপাড়া, এলাকা: গাজীপুর মহানগর, থানা: টঙ্গী পশ্চিম গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ৫৫/৩ দারুল ইসলাম ট্রাস্ট
এলাকা	: গাজীপুর মহানগর, থানা: টঙ্গি, জেলা: গাজীপুর
পরিবারের সদস্য	: মা সহ ৪ জন
বড় ছেলে	: এইস এস সি অধ্যায়নরত
ছোট ছেলে	: ৮ম শ্রেণী
কবর	: গাজীপুর নিজ এলাকায়

শহীদ মো: সুজন মিয়া

ক্রমিক: ১৯০

আইডি ঢাকা বিভাগ ৫৮

জন্ম ও পরিচিতি

মোঃ সুজন মিয়া ১৯৯২ সালের পহেলা মার্চ গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদরের খোলা হাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সুজা মিয়া মৃত এবং মাতা ছালমা বেগম ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা। তিনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।

পারিবারিক জীবন

পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি গাজীপুরে আসেন এবং প্রাণ কোম্পানির ডি এস আর এ যোগদান করেন। সন্তানগুলোকে কুরআনে হাফেজ বানারই তার স্বপ্ন ছিলো। সে জন্য দুই সন্তানকেই হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করেন এবং তিনি তার টাকা দিয়ে মা ও স্ত্রীর ব্যয় বহন করতেন।তার বেতন দিয়ে ভরণ পোষণ কঠিন হওয়ায় তার স্ত্রী অন্যত্র বাসা বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতো। তাদের পারিবারিক অবস্থা খুবই করুণ। উল্লেখযোগ্য সুজন মিয়ার একটি কন্যা সন্তান আছে তার বয়স ১১ বছর সে স্থানে একটি হেফজ মাদ্রাসায় হাফিজি পড়াশোনা করছেন এবং একটি ছেলে আছে সেও হেফজ মাদ্রাসায় হাফিজিয়া অধ্যায়নরত। মোঃ সুজন মিয়া ভাল মানুষ হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন।

আন্দোলনে যোগদান

টঙ্গী হোসেন মার্কেট থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে সুজন মিয়াদের মিছিল যাচ্ছিলো উত্তরার দিকে। উত্তরা থানার সামনে আসলে ভারতীয় পুলিশ,হাসিনার পোষা পুলিশ মিছিলে নির্বিচারে গুলি করে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান মতে সুজন মিয়া ভারতীয় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ।

একটি স্বাধীন দেশকে করদ রাজ্যে পরিনত করেছিল হাসিনা। ৫ আগস্টে সে পালিয়ে যায় ভারতে। তার আগে দেশে চালায় গণহত্যা। নির্মমভাবে হত্যা করে ছাত্র জনতাকে। জুলাইয়ের শুরুতে আন্দোলনের সূত্রপাত। কোটা সংস্কার আন্দোলনই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনটি ছিল অহিংস। সরকার এই আন্দোলন দমন করতে প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের সব বাহিনীকে। মাঠে নামায় দলীয় সন্ত্রাসীদের। যুদ্ধাবস্থার মতো হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছুঁড়ে। মানুষ নিজ বাসভবনেও খুন হন। মুক্তিকামী জনতা আরও ক্ষুব্ধ হয়। ছাত্র আন্দোলন জনতার আন্দোলন হয়ে যায়। বেজে ওঠে হাসিনার বিদায় ঘন্টাধ্বনি। সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নামে। অবরুদ্ধ মানুষ মুক্তি প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। দীর্ঘ ষোল বছরের হিসাব মেলাতে তারা আন্দোলনে শরিক হয়। অবশেষে পালিয়ে যায় নরখেকো হাসিনা। ৫ আগস্টের দুপুরে বিশেষ বিমানে ভারত চলে যায় শেখ কন্যা। মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিব আশ্রয় নিয়েছিল পাকিস্তানে। জেলখানা ছিল ছদ্মাবরণ। দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হল প্রতিবেশীর তাবেদারী থেকে। সকল আওয়ামী নেতাকর্মীদের তোপের মুখে রেখে হাসিনাও পালিয়ে গেলেন। মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হল।

শাহাদাত বরণ

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগের খবরে যে বিজয় মিছিল শুরু হয় সেই বিজয় মিছিলের সাথে যোগদেন শহীদ মোহাম্মদ সুজন মিয়া। তিনি মিছিলের সাথে সাথে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট থেকে উত্তরার দিকে গিয়েছিলেন। শান্তিপ্রিয় মিছিলটি উত্তরায় আসলে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের সন্ত্রাসী পুলিশবাহিনী মিছিলটির দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান উত্তরা থানার সামনে গেলে হাসিনা সরকারের ফ্যাসিস্ট পুলিশ, ভারতীয় পুলিশ কর্তৃক গুলিতে মাথার এক পাশ থেকে গুলি প্রবেশ করে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাই। সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। আনুমানিক বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জানাজা ও দাফন

হাসপাতাল থেকে শহীদ সুজন মিয়ার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর সময় ছিল ৫ আগস্ট আনুমানিক ৫.৩০ টা।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

এলাকায় সুজন মিয়া একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। তিনি সহজ, সরল এবং মিশুক মানুষ। কারও সাথে কোন ঝগড়াঝাঁটিতে যেতেন না।

প্রস্তাবনা

১। প্রাথমিকভাবে এককালীন অনুদান প্রদান।
২। মাসিক ভাতা প্রদান।
৩। স্ত্রীকে সেলাইমেশিন কিনে দেওয়া।
৪। বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৫। সন্তানদের এতিমখানার আওতায় এনে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা।

দুর্বৃত্তের গুলিতে মারা যান দুধ ব্যবসায়ী সুজন মিয়া

স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী রাইসু বেগম বাকরুদ্ধ

মোঃ হানিফ : সুজন মিয়া একজন দুধ ব্যবসায়ী। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বিজয় মিছিলের সাথে টঙ্গীর হোসেন মার্কেট থেকে উত্তরায় গিয়েছিলেন আনন্দ উল্লাসের সাথে। কে জানতো এই যাওয়াই তার শেষ যাত্রা।

রাজধানীর উত্তরা থানার সামনে হঠাৎ করে দুর্বৃত্তরা গোলাগুলি শুরু করে। দুর্বৃত্তের গুলি এসে লাগে সুজনের মাথায়। তাকে উদ্ধার করে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান সুজন। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর উত্তরার আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে সেখানে তার লাশ পাওয়া যায়। সুজন গাজীপুর জেলার টঙ্গীর মুক্তার বাড়ী রোডে ভাড়া থাকতেন। ২ সন্তানের জনক সুজন।

সুজনের স্ত্রী রাইসু বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ছোট ছোট দুটি বাচ্চা নিয়ে আমি কিভাবে সংসার চালাবো।

একমাত্র উপার্জনক্ষম স্বামীকে হারিয়ে তিনি এখন বাকরুদ্ধ। অসহায় পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। বাচ্চা দুটির একজনের বয়স ৮ আরেকজনের বয়স ৬।

গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া স্বামীকে হারিয়ে দুই সন্তান নিয়ে নির্বাক রাইসু বেগম। স্বামীর এমন মৃত্যু যেন মানতেই পারছেন না স্ত্রী রাইসু বেগম। তার কথা স্মরণে আসতেই চোখ গড়িয়ে জলের ধারা বইতে থাকে।

তিনি বলেন, কার কাছে নালিশ করবো, কার কাছে বিচার চাইবো। ছোট্ট এ বাচ্চাদের নিয়ে আমি এখন কী করব, কিছুই জানি না।

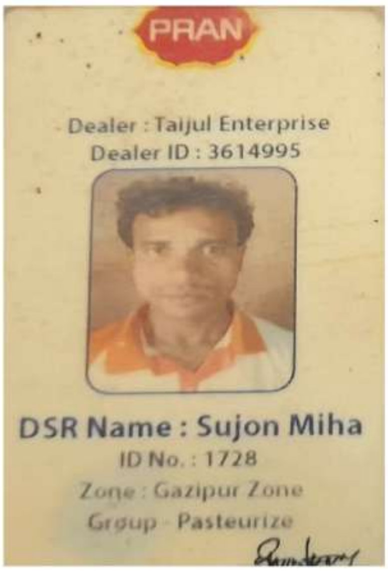

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: সুজন মিয়া
জন্ম তারিখ	: ০১-০৩-১৯৯২
পিতা	: মো: সুজা মিয়া
মাতা	: মোছা: ছালমা বেগম
গ্রাম	: খোলাহাতা, ইউনিয়ন: পৌরসভা
থানা	: গাইবান্ধা সদর, জেলা: গাইবান্ধা
বাসা	: ২২১ হাজী আবুল হাসেম বাড়ি, এলাকা: আউচপাড়া মুক্তারপাড়
থানা	: টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর
সদস্য	: ৪ জন; এক ছেলে,এক মেয়ে, মা ও স্ত্রী। মেয়ের বয়স ১১ বছর ও ছেলে ৯ বছর

শহীদ ফয়জুল ইসলাম রাজন

ক্রমিক : ১৯১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৫৯

জন্ম ও পরিচিতি

২০০৬ সালের ০৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নে উত্তর বাহেরচর এলাকায় নুরে আলম ও মাহমুদা দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ ফয়জুল ইসলাম রাজন। পিতা-মাতার বিচ্ছেদ হওয়ায় রাজন ও তাঁর দুই সহোদর মায়ের কাছেই লালিত পালিত হয়েছেন। শাহাদাত বরণের পূর্বে মিরপুরের ঢাকা মডেল ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়তেন তিনি। একটি দোকানে কাজ করে যোগাড় করতেন নিজের লেখাপড়ার খরচ। ১৯ জুলাই ২০২৪ মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বর এলাকায় ছাত্র আন্দোলনে নামলে পুলিশের গুলি ভেদ করে রাজনের বুক।

জনমনে অসন্তুষ

২০০৮ সালে এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামীলীগ। দলপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। নির্বাচনের আগে সুশাসনের কথা বললেও ক্ষমতায় এসে রুপ বদলায়। ধীরে ধীরে ভালো মানুষের চাদরে ঢাকা স্বৈরাচারের আসল চেহারা বেরিয়ে আসতে থাকে। ক্রমেই দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্বৈরাচারি শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করে। দিনের ভোট রাতে, একজনের ভোট আরেকজন দেওয়ার ঘৃণ্য কালচার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয় দুর্নীতি, ঘুষ, মাদক, চোরাচালান, অর্থ পাচার, ব্যাংক লুট, উন্নয়নের নামে অর্থ আত্মসাৎ, দলীয় লোকদের দিয়ে জনগনের সম্পদ লুট, দ্রব্য মূল্যের মাত্রাতিরিক্ত উর্দ্ধগতি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশকে একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সরকারি চাকরিতে দুর্নীতি, ঘুষের মাধ্যমে দলীয় অযোগ্য লোকদের নিয়োগ, কোটা প্রথার মাধ্যমে মেধাবীদের বঞ্চিত করাসহ নানাবিধ বৈষম্য তৈরি করা হয়।

বৈষম্য চরম আকার ধারণ করলে জনমনে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। ২০১৮ সালে ছাত্ররা কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। সেখানে আন্দোলনকারীদের উপর সরকার দলের ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহীনি হামলা চালায়। তাতেও আন্দোলন থামাতে না পেরে এক নির্বাহী আদেশে কোটা প্রথা বাতিল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কার্যত কোন বাস্তবায়ন দেখা যায় না। ২০২৪ সালে আবারও এই বিষয়টা সামনে চলে আসে। আদালতের এক আদেশে সরকারের নির্বাহী আদেশকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় আন্দোলন। কোটার নামে চরম বৈষম্য এদেশের মুক্তিকামী মানুষ বরদাস্ত করতে পারে না। একদিকে বৈষম্য আর জনগনের মনে চেপে থাকা দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থাকলেও তা ক্রমেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ সরকারের পতনের এক দফা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলন দমনে সরকার মরিয়া হয়ে উঠে। পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, ডিবি, আনসার বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে সরকার আন্দোলনকারীদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। গুলি করে মানুষ হত্যা করে। সরকারের বাহিনীদের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বন্দুকধারী হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

গত ১৯ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টায় মিরপুর-১০ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে আন্দোলনরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নরপশু নেতাকর্মীরা। তাদের ছোড়া গুলিতে ফয়জুল ইসলাম রাজন গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত রাজনকে মিরপুর-৬ এলাকার ডাক্তার আজমল হাসপাতাল লিমিটেডে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবারের অনুভূতি

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ১৯ জুলাই ২০২৪ ছিল ভয়ংকর একটি দিন। রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফয়জুল ইসলাম রাজন। তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে যায় বুলেট। ক্ষতচিহ্ন রেখে যাওয়া টি-শার্ট জড়িয়ে এখনও ডুকরে কাঁদেন তার মা। আদরের ছোটভাইয়ের মরদেহ নিজ হাতে গোসল করানোর মুহূর্তটা এখনো ভুলতে পারছেন না রাকিব। তিনি বলেন, 'আমি এবং মহল্লার একজন ভাইয়ের মরদেহ গোসল করানোর সময় আমার মাথা ঘুরেছে। ছোট ভাইয়ের গুলিবিদ্ধ মরদেহ গোসল করাতে কষ্ট হয়েছে। এরপরেও আমি আমার চোখ ঢেকে নিজ হাতে ভাইকে গোসল করিয়েছি। ভাই হারানোর বেদনা কত কষ্টের তা বুঝাতে পারবোনা। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনা হোক।'

রাজনের মা বলেন, 'গুলিটা বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনার দিন আমার মেয়ে এবং মেয়ের জামাই আজোয়া হাসপাতালে রাত দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে লাশ নিয়ে আসে। আমি এই হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচার চাই।'

পারিবারিক আর্থিক বিবৃতি

ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নে উত্তর বাহেরচর এলাকায় রাজনের মায়ের সংসার। ৯ বছর আগে স্বামী অন্য সংসার গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিন সন্তান নিয়ে শুরু হয়েছিল তার জীবন সংগ্রাম। ছোট ছেলের মৃত্যুর পর কিছুদিন আগে চাকরি হারিয়েছেন বড় ছেলেও।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদের বড় ভাইকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে
৩. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন। নির্মাণে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

নিউজ লিংক

১. https://www.shomoyeralo.com/news/289288
২. https://banglalive24.com/681
৩. https://www.jugantor.com/capital/865493

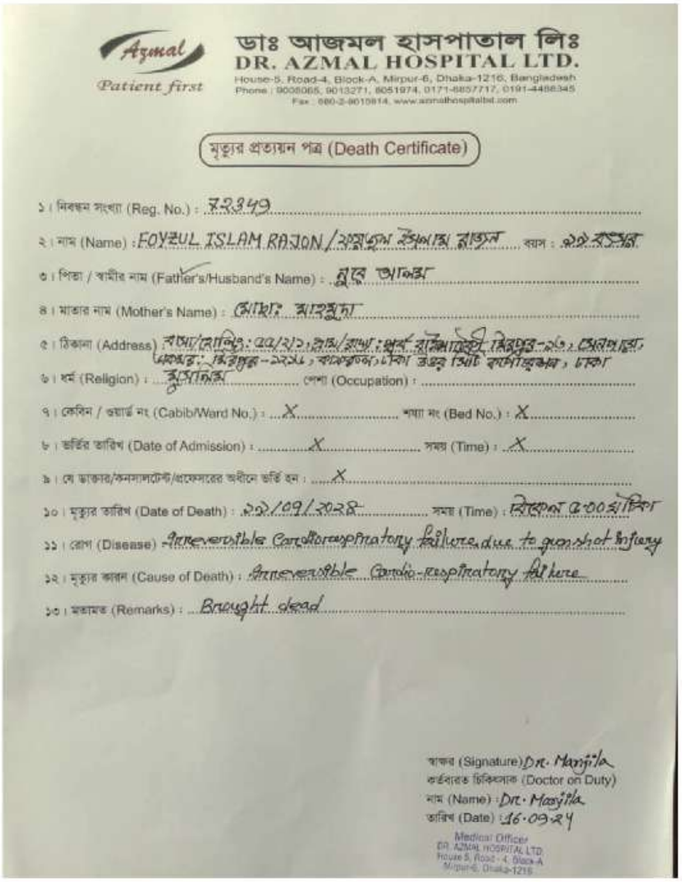
Azmal Patient first

ডাঃ আজমল হাসপাতাল লিঃ
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.
House-5, Road-4, Block-A, Mirpur-6, Dhaka-1216, Bangladesh
Phone : 9008065, 9013271, 8051974, 0171-6857717, 0191-4486345
Fax : 880-2-9015814, www.azmalhospitalbd.com

মৃত্যুর প্রত্যয়ন পত্র (Death Certificate)

১। নিবন্ধন সংখ্যা (Reg. No.) : 72349
২। নাম (Name) : FOYZUL ISLAM RAJON / ফয়জুল ইসলাম রাজন বয়স : ১৮ বছর
৩। পিতা / স্বামীর নাম (Father's/Husband's Name) : নুরে আলম
৪। মাতার নাম (Mother's Name) : মোছাঃ মাহমুদা
৫। ঠিকানা (Address) : [illegible]
৬। ধর্ম (Religion) : মুসলিম পেশা (Occupation) :
৭। কেবিন / ওয়ার্ড নং (Cabib/Ward No.) : X শয্যা নং (Bed No.) : X
৮। ভর্তির তারিখ (Date of Admission) : X সময় (Time) : X
৯। যে ডাক্তার/কনসালটেন্ট/প্রফেসরের অধীনে ভর্তি হন : X
১০। মৃত্যুর তারিখ (Date of Death) : ১৯/০৭/২০২৪ সময় (Time) : বিকেল ৫:০০ ঘটিকা
১১। রোগ (Disease) : Irreversible Cardiorespiratory failure due to gunshot injury
১২। মৃত্যুর কারণ (Cause of Death) : Irreversible Cardio-respiratory failure
১৩। মতামত (Remarks) : Brought dead

স্বাক্ষর (Signature) Dr. Manjila
কর্তব্যরত চিকিৎসক (Doctor on Duty)
নাম (Name) : Dr. Manjila
তারিখ (Date) : 16-09-24
Medical Officer
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.
House 5, Road - 4, Block-A
Mirpur-6, Dhaka-1216

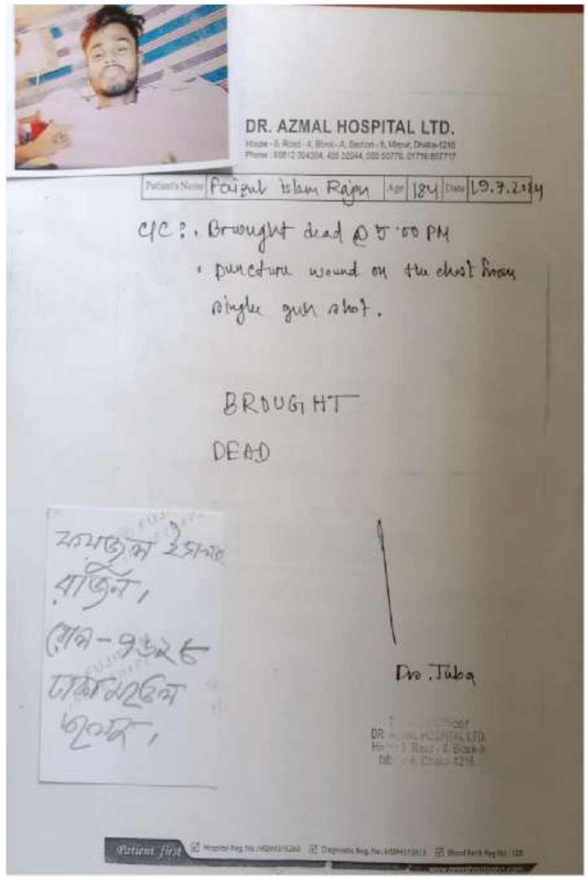
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.

Patient's Name	Foizul Islam Rajon	Age	18y	Date	19.7.2024

C/C : Brought dead @ 5:00 PM
· puncture wound on the chest from single gun shot.

BROUGHT
DEAD

Dr. Juba

Patient first

একজনরে শহীদের তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: শহীদ ফয়জুল ইসলাম রাজন
পিতা	: মো: নুরে আলম
মাতা	: মোছা: মাহমুদা
পেশা	: ছাত্র ও দোকান কর্মচারী
প্রতিষ্ঠান	: মিরপুর ঢাকা মডেল ডিগ্রি কলেজ, একাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ, রোল: ৭৬২৮
জন্মসাল	: ২০০৬ সালের ০৬ সেপ্টেম্বর
স্থায়ী ঠিকানা	: কেরানীগঞ্জ, কলাতিয়া, উত্তর বাহেরচর, ঢাকা
আহতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, মিরপুর-১০ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সংলগ্ন
নিহতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, মিরপুর-৬ ডা: আজমল হাসপাতাল লিমিটেড, বিকাল ৫.০০ টা

শহীদ মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম রাব্বি

ক্রমিক : ১৯২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬০

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

হত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এক অকুতোভয় বীর যিনি আর কেউ নন; তিনি হলেন শহীদ মো: আশিকুল ইসলাম রাব্বি। সমাজের সহজ সরল ও শান্ত স্বভাবের লোক শহীদ মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম রাব্বি। যিনি ২০০৩ অক্টোবরের ২ তারিখ এক শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে স্বপ্ন বুনতে থাকে শহীদ রাব্বি। স্বৈরাচার খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনী বিজিবি কতৃক গুলি বৃদ্ধ হয়ে হঠাৎ অকালে মারা যাওয়ার দরুন কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়; পুরো পরিবারে হতাশা নেমে আসে। পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের প্রিয়মুখ শহীদ রাব্বি মাদ্রাসায় লেখা পড়ার পাশাপাশি আয়ের মাধ্যমে পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্যই টিউশন করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলনে প্রথম দিকেই উত্তাল হয়ে উঠে নরসিংদীর অলি গলি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনতা মিলে বিক্ষোভ মিছিলে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেতে থাকেন। এক পর্যায়ে স্বৈরাচার সরকার ইন্টাননেট বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ ছাত্র জনতার উপর পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়। আন্দোলননের ঢেউ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় শহীদ রাব্বি এলাকার ছাত্র জনতার কোটা সংস্কারের দাবিতে চলা স্বৈরাচার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে তিনি বন্ধুদের সাথে মিলে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তিনি টিউশন যাওয়ার পথে হঠাৎ মিছিল শুরু হলে তৎক্ষনাৎ বন্ধুদের সাথে নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। ২১ জুলাই ২০২৪ রবিবার সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে শহীদ রাব্বি তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। যখন সে মাজার বাসস্ট্যান্ড বালুর মাঠে যায় তখন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের বিজিবি তাঁর বুকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সে ৩০ মিনিট পড়ে ছিল মাঠে। পরে তাকে ছাত্রজনতা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। কিন্তু ততক্ষণে সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন।

ছাত্ররাই অজেয়- এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এ সফলতা যতটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে চলাকালীন তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। ফলশ্রুতিতে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ছাত্র আন্দোলন 'সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে লুফে নেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তখনই তাদের যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম রাব্বি। পরিবারে অভাব অনটন মাথায় রেখে স্বপ্ন দেখা তরুণ প্রজন্মের আইডল শহীদ রাব্বি অকাতরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে তা কখনো কল্পনাতীত ছিল না।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শহীদ আশিকুল ইসলাম রাব্বি পৌলানপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রারাসার মানবিক গ্রুপের আলিম ২য় বর্ষের ছাত্র। তাঁর জন্ম ২০০৩ সালের ২ অক্টোবর নরসিংদী জেলার ভগীরথপুর গ্রামে। তিনি পড়াশোনা পাশাপাশি অটো চালাতেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল খালেক সরকার, তিনি একজন টেক্সটাইল তাঁতী। মায়ের নাম শামসুন্নাহার, তিনি একজন গৃহিণী। আব্দুল খালেক সরকারের মাসিক আয় ৮০০০/- টাকা। ছেলের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত, তাই চাকুরি থেকে বিরত আছেন। আত্মীয়স্বজন তাদেরকে সহায়তা করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা ঋণগ্রস্থ। তার বাবার ২ শতাংশ জমির উপর একটি পাকা বাড়ি আছে। আশিকুল ইসলাম রাব্বি ২১ জুলাই'২৪ রবিবার সকাল ১১.৩০ মিনিটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিতে বের হন। যখন তিনি মাজার বাসস্ট্যান্ড বালুরমাঠে যায় তখন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের বিজিবি তাঁর বুকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সে ৩০ মিনিট পড়ে ছিলো মাঠে। পরে তাকে ছাত্রজনতা নিয়ে নরসিংদী, সদর হাসপাতালে ভর্তি করায়, কিন্তু ততক্ষণে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

গ্রামে বসবাসরত বন্ধুদের মতে শহীদ রাব্বি খুব সৎ ও সদালাপী ছিলন। প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করতেন ও বন্ধুদের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। শহীদ রাব্বি নামাজী ছিলেন এমনকি মসজিদে কুরআন তালিমেও অংশগ্রহণ করতেন।

প্রস্তাবনা

১। শহীদ পরিবারকে মাসিক ১০০০০ টাকা প্রদানের মাধ্যম সহায়তা দেওয়া।

২। ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা

৩। বাৎসরিক ১ লক্ষ প্রধান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
Name: MD ASIKUL ISLAM RABBI
Date of Birth: 02 Oct 2003

একনজরে শহীদ আশিকুল ইসলাম রাব্বির ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ আশিকুল ইসলাম রাব্বি
পেশা	: ছাত্র
মাদ্রাসা	: পৌলানপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা
জন্ম	: ২ অক্টোবর ২০০৩
ঠিকানা	: গ্রাম: ভগীরথপুর, ইউনিয়ন: মেহেরপাড়া, থানা: সাধবদী, জেলা: নরসিংদী
ঘটনার স্থান	: শেখেরচর মাজার, বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা
আক্রমণকারী	: ফ্যাসিস্ট সরকারের পেটোয়া বাহিনী বিজিবি সদস্য
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২১ জুলাই সকাল ১১ টা ৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২১ জুলাই দুপুর ১২ টা ৪৫ মিনিট
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজগ্রাম,নরসিংদী
পিতা	: আব্দুল খালেক সরকার
বয়স	: ৬০ পেশা: শ্রমিক
মাতা	: শামসুন্নাহার বয়স : ৫০ পেশা: গৃহিণী
মাসিক আয়	: ৮০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: শ্রমিক
পরিবারের সদস্য	: ২ জন

শহীদ মোঃ ইমন মিয়া

ক্রমিক : ১৯৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬১

প্রারম্ভিকতা

আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-এ এই রোদবৃষ্টির বর্ষা-শরৎ ঋতুতে সূচিত হলো নতুন আরও এক অধ্যায়ের। এ দেশের তারুণ্য আমাদের দিশা দেখাতে চাইছে। জুলাইয়ের খরতাপে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পতন ঘটে কর্তৃত্ববাদী সরকারের। শুরু হয় নতুন বাংলাদেশ গঠনের কর্মযজ্ঞ। ইতিমধ্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে দক্ষ, যোগ্য ও গুণীজনদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। অনেক মৃত্যু ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অর্জিত এ নতুন সময়ে সকল বৈষম্য ও ভয়ের অন্ধকার দূর হবে। সব দুর্নীতি, প্রতিহিংসা, দমন-পীড়ন অতিক্রম করে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে মানবিক রাষ্ট্র। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দূর করা হবে বেকারত্ব।

এই ধরনের চিন্তা চেতনা নিয়ে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই বুক ভরা আশা লালন করছিলেন শহীদ মো: ইমন মিয়া পেশায় কৃষক পিতা কায়েম মিয়ার ঘরেই জন্ম গ্রহণ করছিলেন নরসিংদী আইডিয়াল কলেজের মেধাবী ও চৌকস শিক্ষার্থী শহীদ মোহাম্মদ ইমন মিয়া। পড়াশোনা শেষ না হতেই তিনি ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে সত্য, সাম্য ও বৈষম্যহীন জাতি গঠনে জনতার এক দফা এক দাবি স্বৈরশাসক ও খুনি হাসিনা তুই কবে যাবি এই স্লোগানে মুখরিত হয়ে জনতার কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন।

শহীদ মোঃ ইমন মিয়া গত ১৮ জুলাই ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে নরসিংদী জেলখানা মোড় শান্তি সমাবেশে অংশ নেয়। ছাত্র-জনতার এই গণআন্দোলনে স্বৈরাচারের নির্বিচার গণহত্যায় মৃত্যুর মিছিলে সর্বশেষ নাম মোঃ ইমন মিয়া ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি সচেতন ও দেশপ্রেমিক একজন মেধাবী তরুণ হিসেবে উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামী আদর্শের একজন ত্যাগী ও একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে মোঃ ইমন মিয়া জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত ন্যায্যতার আন্দোলনে ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিরলস ভূমিকা পালন করে গেছেন। জীবন দিয়ে শহীদ ইমন দেশমাতৃকার প্রতি তার অপরিসীম ভালবাসা প্রমাণ করে গেল।

শহীদ পরিচিত ও ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

দড়িচর গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মেধাবী ও চৌকস শহীদ ইমন মিয়া ছিলেন এক প্রতিবাদী ছাত্র। অভাব অনটনে থেকে নিজেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ভর্তি হয়েছিলেন নরসিংদী আইডিয়াল কলেজে। স্বপ্ন পূরণে ছিল খুবই উদ্যমী ও কৌশলী। কোটা আন্দোলনের কারণে লালিত স্বপ্ন ভেঙে গেল। যা খুব হতাশা জনক। কেননা ১৮ জুলাই ২০২৪ বৃহস্পতিবার সকালে ইমন মিয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। নরসিংদী জেলখানা মোড়ে শান্তি সমাবেশে অংশ নেয়। হঠাৎ স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী ঘাতক পুলিশ বাহিনী কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই শান্তিপ্রিয় ছাত্র জনতার উপর অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে। ইমন মিয়া ছাত্রদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানায়। ছাত্ররা নিজেদের রক্ষার পাশাপাশি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাৎক্ষণিক আহত ছাত্রদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করাসহ মারাত্মক আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য একদল ছাত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইমন পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ারশেল থেকে রক্ষা করতে ছাত্র-জনতাকে এছাড়া পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ারশেল গুলো দ্রুত পুলিশের অবস্থানের দিকেই ছুঁড়ে মারতে উপায় বাতলে দেয়। হঠাৎ সন্ত্রাসী পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীদের থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গুলি তার বুকে লাগে। ইমন মিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রচন্ড গোলাগুলির ভেতর ছাত্র জনতা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানাযা ও দাফন

শহীদের মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯ জুলাই শুক্রবার বাড়ির পাশে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শহীদ পরিবারের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ইমন মিয়ার পিতা কায়েম মিয়া একজন কৃষক ও মাতা মর্জিনা বেগম গৃহিণী। শহীদ ইমন মিয়া পিতামাতার ছোট সন্তান ছিলেন। আদরের সন্তানকে তারা পড়ালেখা করাতেন এবং স্বপ্ন দেখতেন এই ছেলে বড় হয়ে তাদের দেখাশোনা করবে। পরিবারে দরিদ্রতা দূর হবে। ইমন মিয়ার অকাল মৃত্যুতে তার পুরো পরিবার ভেঙে পড়েছে।

ইমন মিয়ার বাবা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অর্থনৈতিকভাবে তিনি অসচ্ছল। তার মাসিক আয় কমবেশি ৮ হাজার টাকা। জনাব কায়েম মিয়া বড় ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি পরিবার নিয়ে ৪.৫ শতাংশ জমিতে একটি টিনের ঘরে বসবাস করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

শহীদ ইমন মিয়া, আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার পর থেকে এক-প্রকার অস্থির থাকতেন। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বলতেন এগুলো দেখে বসে থাকা যায় না। আমি আন্দোলনে যামু এবং ১৮ তারিখ আন্দোলনে যুক্ত হলেন। একপর্যায়ে আঘাত পুলিশ ও গুন্ডা ছাত্রলীগ কতৃক নিক্ষিপ্ত গুলির আগাতে তিনি শাহাদাত বরণ করে।

প্রস্তাবনা

১। মাসিক ১০০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা।
২। বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা।

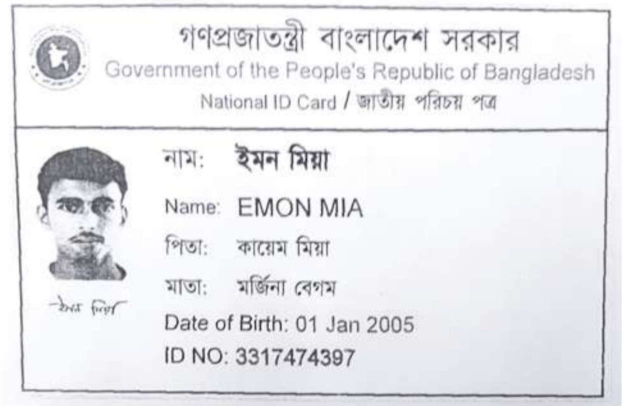

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: ইমন মিয়া
Name: EMON MIA
পিতা: কায়েম মিয়া
মাতা: মর্জিনা বেগম
Date of Birth: 01 Jan 2005
ID NO: 3317474397

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: ইমন মিয়া
বয়স	: ১৯ বছর
পেশা	: ছাত্র
কলেজ	: নরসিংদী আইডিয়াল কলেজ
জন্ম	: ১ জানুয়ারি ২০০৫
ঠিকানা	: গ্রাম: দড়িচর, ইউনিয়ন: গজারিয়া, থানা: পলাশ, জেলা: নরসিংদী
পিতা	: কায়েম মিয়া পেশা: কৃষক আয়: ৮০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: কৃষিকাজ
মাতা:	মর্জিনা বেগম পেশা : গৃহিণী
ঘটনার স্থান	: জেলখান মোড়, নরসিংদী
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৮ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৪.০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৮ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৪.০০টার সময়
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজগ্রাম দড়িচর এলাকায়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের পৈশাচিকতার শিকার, বাংলার বীর কৃষক আর দূর্ভাগা পিতাদের অন্যতম একজন প্রতিনিধি শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমান, নিজের মহামূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিয়ে দেশের প্রতি; দেশের মানুষের প্রতি কিছু দায়িত্ব রেখে গেছেন।

শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমান

ক্রমিক : ১৯৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬২

শহীদের পরিচয়

শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমান ১৯৮০ সালের ৩ জুলাই নরসিংদী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী মো: আমির উদ্দিন মিয়া এবং মাতা মোছা: ফাতেমা বেগম। শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমান পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। এলাকায় তিনি একজন সৎ এবং ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

শহীদের সাধারণ জীবন

কাজী মোঃ আব্দুর রহমান অতি সাধারন একজন মানুষ ছিলেন। কৃষিকাজ করে জীবন নির্বাহ করতেন তিনি। সারাদিন কাজের ব্যস্ততা আর পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মাঝেও দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম চর্চাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন তিনি। কৃষক হিসেবে ক্ষেতে খামারে কাজ করলেও বেশভূষায় থাকতেন পরিপাটি। পায়জামা পাঞ্জাবি আর টুপি ছিলো তার প্রিয় পোশাক। শত ব্যস্ততার মাঝেও নামাজ ছাড়তেন না তিনি। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম আর ইবাদত বন্দেগি করেই জীবন অতিবাহিত করতে চাইতেন তিনি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে উপযুক্ত জায়গায় বিয়ে দেয়ার মতো সুন্দর এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

গ্রামবাংলার কৃষক শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমান সাহেবের মতো বাংলাদেশের সাধারন মানুষও চায় দু'বেলা দুমুঠো খেয়ে-পড়ে বেঁচে-বর্তে থাকতে। অথচ সেই মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ করতে পারাটাই যেন অসাধ্য সাধন এই বৈষম্যের সমাজের। মুসলমান হিসেবে দাঁড়ি টুপি থাকাটাই যেন আজ সবচেয়ে বড়ো বিপদ। দেশের ইসলামবিদ্বেষী সরকার মুসলমানদের উপর যেমন জুলুম করেছে, তেমনি সবজায়গায় হরিলুট করে দেশের মধ্যে তৈরি করেছে এক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। দিনের ভোট রাতে করা নির্লজ্জ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার একের পর এক ডামি-নির্বাচন করে সিন্দাবাদের ভূতের মতো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। বিরোধী দলের প্রতিনিয়ত ন্যায্য দাবির আন্দোলন; মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বিবৃতি; সুশীল সমাজের পরামর্শ; আন্তর্জাতিক হুশিয়ারি; আলেম-ওলামাদের প্রতিবাদ; নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক আত্মাহুতি; গণমানুষের আহাজারি কোনো কিছুই তারা গ্রাহ্য করছে না। বরং বিরোধী দল-মত দমনের জন্য সারাদেশে শুরু করলো গণগ্রেপ্তার, গুম-খুন, জেল-জুলুম আর অত্যাচার-নির্যাতন। কারাগার আর আয়নাঘরে ভরে ফেললো বাংলাদেশ।

হঠাৎ উত্তপ্ত রাজপথ

ভোটচোর আওয়ামী সরকার তার গুম-খুন রাজনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। জুলাইয়ের শুরুতে ছাত্রদের করা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে ঘুরানোর জন্য সরকার নানা রকম কুটচাল চালতে থাকে। তাদের কোনো চালে ধরা না দিয়ে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাধারন শিক্ষার্থীদের এমন দৃঢ়তা দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে স্বৈরাচার সরকার। ১৬ জুলাই থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নৈরাজ্য। গুম, খুন, হত্যা।

১৭, ১৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালায় গণহত্যা! শহীদের মিছিলে যুক্ত হয় আবু সাঈদ আর মুগ্ধ'র মতো শত শত শিক্ষার্থীর নাম।

১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রদের খুনে হাত রাঙানো স্বৈরাচার হাসিনা ইন্টারনেট বন্ধ করে সারাদেশে কারফিউ জারি করে। নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী কাজছাড়া কেউ বাসা থেকে বের হতে পারবে না। যেকোনো জায়গায় ১০/১২ জন একসাথে দেখলেই চালানো হচ্ছে গুলি।

এমন অবস্থায় ১৯ জুলাই শুক্রবার জনাব কাজী আব্দুর রহমান পরিবারের জন্য বাজার করতে বের হতে চাইলে তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের বাঁধায় আর বের হতে পারেননি। কিন্তু "কারফিউর মধ্যে কেনো বাজারে যেতে পারবো না? সরকার কি আমাকে ঘরে খাবার এনে দিবে? আমি কি কোনো দল করি? আর গতকাল সরকার তো ঘোষণা দিয়েছেই যে হাটবাজারসহ জরুরী প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া যাবে। তাহলে আর কি সমস্যা?" নিজের স্ত্রী আর সন্তানদেরকে সেদিন এমন কিছু সরল প্রশ্ন করেছিলেন সদালাপী সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষটি। তারা তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে আজকে ঘরে যা আছে তাই দিয়ে কষ্ট করে চলে যাবে, তিনি যেন পরের দিন বাজার করে নিয়ে আসেন। স্ত্রী-সন্তানের কথা সহজেই মেনে নেন শহীদ আব্দুর রহমান।

আহত হওয়ার ঘটনা

২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার দুপুর ৩টায় কাজী আব্দুর রহমান বাজার করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে পাঁচদোনা মোড়ে যান। একটি রিকশাতে করে গিয়ে বাজারের সামনে পৌঁছানোর পর রিক্সা থেকে নেমে বাজারের ভিতরে ঢুকবেন এমন সময় কোনো রকম ঘোষণা, মাইকিং বা সংকেত ছাড়াই স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের সন্ত্রাসী বিজিবি বাহিনী মানুষকে ভীত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনতাকে লক্ষ্য করে অনবরত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে আসে বাজারের সামনে। এখানে এসে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে স্বৈরাচারীর পদলেহনকারী বিজিবি বাহিনী। এগুলোর মধ্যে একটি গুলি জনাব কাজী মোঃ আব্দুর রহমানের পিঠ দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কিছু বুঝে ওঠার আগেই এসব ঘটে যায়। কোনরকম হুঁশিয়ারি ছাড়াই বিজিবি হঠাৎ করে গুলি শুরু করে। শরীরে গুলি লাগলে পেট ফুটো হয়ে ভূরি বের হয়ে আসে তার। তিনি পেটে হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে যান।

শহীদকে উদ্ধার প্রচেষ্টা

ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনতা প্রথমবার চেষ্টা করেও তাকে খুনি বিজিবির হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। বিজিবি তখন অনবরত গুলি বর্ষণ করছিলো নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার বজ্রকণ্ঠ চিরতরে রোধ করার জন্য। সেখানে আরো অনেকে শাহাদাত বরণ করেন। পরিচিত একজন আব্দুর রহমানের বাড়ীতে খবর জানান। খবর পেয়ে শহীদের ছেলে আর ভাতিজা বাড়ি থেকে ছুটে চলেন বাজারের দিকে। তারা গ্রামের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে বাজারে যাবার সময় সেই রাস্তায়ও বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি

লাশ পড়ে থাকতে দেখে। ফলে মূহুর্তের মধ্যে এখানে কি হয়ে গেছে তা তারা অনুমান করতে পারে। স্বৈরাচারী বিজিবি সাধারণ একটা গ্রামের ছোট রাস্তায় ঢুকেও মানুষ হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। একটার পর একটা লাশ ঠেঙ্গিয়ে সামনে আগাতে ভয় লাগছে দুই চাচাতো ভাইয়ের। কিন্তু জন্মদাতা পিতাকে; বাবার মতো চাচাকে তো উদ্ধার করতেই হবে। একটা সময় তারা পৌঁছে যায় বাজারের সামনে। একটু দূর থেকেই দেখতে পায় শহীদ কাজী আব্দুর রহমান মাটিতে পড়ে আছেন। আর মাত্র কয়েক কদম গেলেই পৌঁছা যাবে তার কাছে। এমন সময় আবার রক্ত পিপাসু বিজিবির গুলি। একটু দূরেই যে বিজিবির গাড়ি ছিলো তারা তা লক্ষ্য করেনি। সাথে সাথে তারা পিছনের দিকে সরে যায়। বিজিবির মুহুর্মুহু গুলিতে কোনোভাবেই আর সামনে আগানো যাচ্ছে না। দুই চাচাতো ভাই বুদ্ধি করে আরও একটু পিছনে গিয়ে রাস্তা থেকে বিলের মধ্যে নেমে যায়। তারপর ফসলের ক্ষেত পেরিয়ে বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে বাজারের পিছন দিক দিয়ে ঢুকে। আস্তে আস্তে চুপিচুপি পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যায় দুজন। একটা সময় বাজারের সামনে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তারপর বিজিবির গুলির শব্দ কিছুটা কমে আসলে তারা দৌড়ে যায় শহীদ আব্দুর রহমানের কাছে। দুই ভাই মিলে শহীদকে রাস্তা থেকে তুলতে যাবে এমন সময় তাদের পিছন দিক থেকে কয়েকজন বিজিবি চিৎকার করে উঠে। বিচ্ছিরি ভাষায় গালিগালাজ করে তাদের দুজনকে। একজন রেগে গিয়ে কিছু একটা ছুড়ে মারে তাদের দিকে। আরএকজন বিজিবি সদস্য তাদেরকেও গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গুলি করার প্রস্তুতি নিতে গেলে অন্য একজন বিজিবি সদস্য তাকে বাধা দেয় আর দুই চাচাতো ভাইকে ইশারা করে তাড়াতাড়ি লাশ নিয়ে চলে যেতে। শহীদের লাশের পাশে নিজেরাই যখন মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক তখন বিজিবির মধ্য থেকেই একজন সদস্যের এমন সংকেত পেয়ে যেন তাদের সাহস বেড়ে গেলো। কাল বিলম্ব না করে দুইজন মিলে শহীদ আব্দুর রহমানকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়।

উদ্ধার ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

শহীদ আব্দুর রহমানের ছেলে আর ভাতিজা তাঁকে বাজারের ভিতরের দিকে মাছ বাজারের মধ্যে নিয়ে আসে। তারপর তারা কয়েকটি এম্বুলেন্সকে কল করে। কিন্তু এখানকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা শুনে কোনো একটা এম্বুলেন্স আসতে রাজি হয়নি। অবশেষ উপস্থিত হাটুরেদের মধ্য থেকে কয়েকজনের সহযোগিতায় একটা মাছের ভ্যান খালি করে সেটাতে করেই তারা নরসিংদী জেলার সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় শহীদ আব্দুর রহমানকে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আব্দুর রহমান এখনো মৃত্যু বরণ করেননি। তিনি এখনো বেঁচে আছেন! কিন্তু তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাকে বাঁচাতে হলে যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাবা বেঁচে আছেন! চাচা বেঁচে আছেন! ডাক্তারের মুখে এমন সংবাদ শুনে জীবনের শ্রেষ্ঠতম খুশি হয় যেন শহীদের ছেলে আর ভাতিজা। সাথে সাথে তারা এই সুসংবাদ তাদের পরিবারকে জানায়। কেননা এর আগে ভ্যানে করে তাকে নিয়ে আসার সময় বাড়িতে কল করে শাহাদাতের খবর জানানো হয়। জনাব আব্দুর রহমানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তার পরিবারের সদস্যরা তখনই রওনা দিয়েছিল জেলা হাসপাতালের দিকে। পথিমধ্যে আবার তার বেচে থাকার সংবাদে যারপরনাই খুশি হয়ে যায় তারা।

ডাক্তারের পরামর্শ মতো সকলে মিলে একটা এম্বুলেন্স ভাড়া করে এবার গুরুতর আহত আব্দুর রহমানকে নিয়ে পরিবার রওনা দিলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

পথিমধ্যে ঘাতক পুলিশ বিজিবির বাঁধা

আহত আব্দুর রহমানকে বহনকারী এম্বুলেন্স ঢাকা শাহবাগ মোড় দিয়ে যাবার সময় সেখানে টহলরত পুলিশ আর বিজিবি এম্বুল্যান্সের গতিরোধ করে। আটকে দেয় তাদের গাড়ি। খুনি পুলিশ আর নিষ্ঠুর বিজিবি গুলিবিদ্ধ আহত আব্দুর রহমানকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দিবে না। আহত আব্দুর রহমানের শ্যালকেরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। তারা কোনোভাবেই এই রোগীকে হাসপাতালে নিতে দিবে না। তাহলে নাকি তাদের চাকরি থাকবে না। স্বৈরাচারের পা চাটা এই বাহিনী দুটোকে নানাভাবে বুঝাতে বুঝাতে অনেক সময় চলে যায়। স্বৈরাচার পুলিশ আর বিজিবি এরকম সরকারি আক্রমণে আহত রোগীকে কোনো হাসপাতালে কিছুতেই ভর্তি হতে দিবে না। ওইদিকে আহত আব্দুর রহমানের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার শরীর থেকে। এমন সময় আহত আব্দুর রহমানকে বাঁচানোর জন্য তার এক শ্যালকের মাথায় আসলো নতুন কৌশল। তার মনে পড়ে গেলো বাংলাদেশের পুলিশের চিরায়ত চরিত্রের কথা। সাথে সাথে তিনি পুলিশের একজন অফিসারকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার হাতে বেশ কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বিজিবিকে ম্যানেজ করতে অনুরোধ করে। হারামখোর সেই পুলিশের চেষ্টায় অবশেষে কাজ হলো। তারপর আবার ঢাকা মেডিকেলের দিকে ছুটে চলে আহত আব্দুর রহমানকে বহন করা এম্বুলেন্স। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তাকে নিয়ে এম্বুলেন্স পৌঁছালো ঢাকা মেডিকেলের ইমারজেন্সি বিভাগে।

হাসপাতালে ভর্তিতে বাধা

হাসপাতালে পৌঁছে আহত আব্দুর রহমানকে ভর্তি করতে গেলে সেখানেও বাঁধা। স্বৈরাচার সরকারের বাহিনী দ্বারা আহতদেরকে ভর্তি নিতে তারা প্রচণ্ড রকম নারাজ। মনে হয় যেন পুরো দেশটাকে তারা ইজারা নিয়েছে। এইসব ন্যাক্কারজনক দৃশ্য দেখে আহত আব্দুর রহমানের ছেলে আর ভাতিজা কর্তব্যরতদের উপর রেগে যেতে নিলে তার শ্যালক তাদেরকে শান্ত করেন।

অমানবিক শর্ত মেনে ভর্তি

অনেক অনুনয় বিনয় করেও যখন স্বৈরাচার কর্মকর্তা কর্মচারীদের মন গলানো গেলো না তখন শাহবাগে পুলিশ আর বিজিবিকে যেভাবে ম্যানেজ করে এসেছে এখানেও সেভাবে ম্যানেজ করে আহত আব্দুর

রহমানকে ভর্তি করানো হয়। তবে শর্ত থাকে যে হাসপাতালের চিকিৎসাদি দ্রব্য, ঔষধ, খাবার এই ধরনের সরকারি কোনো সুবিধাই আহত আব্দুর রহমানকে দেয়া হবে না। সবকিছুই তাকে কিনে নিতে হবে এবং যা কিছুই ঘটুক না কেনো এখানে কোনো কান্নাকাটি করা যাবে না। কোনো মিডিয়ার সাথে কথা বলা যাবে না। এসব কথার যদি কোনো হের ফের হয় তাহলে সাথে সাথে রুগীকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হবে। নিরুপায় হয়ে স্বৈরাচারের সকল শর্ত মেনে নেয় আহত আব্দুর রহমানের পরিবার।

ঢাকা মেডিকেলে ১২ দিন

ভর্তি করানোর পরে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহত আব্দুর রহমানকে প্রথমে ঢালাও বিছানায় এবং কিছুদিন পরে বেডে দেয়া হয়। ওই সময়ে ঢাকা মেডিকেলে কেবল রোগী আর রোগী। বেশির

ভাগই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে আহত। ১৬,১৭,১৮ জুলাইয়ের রোগী বেশি। তখন সরকারের সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিলো না, তাই ভর্তি নিতো। ভর্তির প্রায় চারদিন পরে আহত আব্দুর রহমানের অপারেশন হয়। ৮ ব্যাগ রক্ত লাগে তার। একে তো পরিবারের বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন গ্রামের বাড়িতে আছে তার উপর আবার দেশের এমন উত্তপ্ত অবস্থা। তাই রক্ত বা ডোনার সংগ্রহ করা সোনার হরিণ সংগ্রহ করার মতো অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পরে রক্ত সংগ্রহ হয় এবং আহত আব্দুর রহমানের অপারেশন হয়। অপারেশন শেষে টানা ছয় দিন আইসিইউতে থেকে স্বৈরাচার হাসিনার বিষাক্ত কামড়ের সাথে লড়াই করতে করতে ৩১ জুলাই সকাল ৭টা বাজে মহান মুনিবের ডাকে সারা দিয়ে শহীদের অমর পেয়ালা পান করেন ধর্মপ্রাণ কাজী মো: আব্দুর রহমান। সন্তানদের পড়াশোনা করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের হাতে তাদের উপযুক্ত জায়গায় বিয়ে দেয়ার মতো সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ ইহজগতে আর দেখা হলো না তার।

শহীদের লাশ আনতে বাঁধা

শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমানের শাহাদাতের পরে তার পরিবার যখন হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা জানতে পারে, হাসপাতাল থেকে লাশ দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে নাকি সরকারের নির্দেশনা পেয়েছে হাসপাতাল। কেউ যদি একান্তই লাশ নিতে চায় তাহলে পুলিশের সাথে সমঝোতা করে নিতে হবে। এমন তথ্য পেয়ে পুলিশের কাছে ছুটে যায় শহীদ আব্দুর রহমানের পরিবার। এবার আর কোনো কথা বুঝিয়ে কাজ হয়নি। ফ্যাসিস্ট পুলিশের এক কথা। প্রশাসন বা সরকার দলীয় কারো দ্বারা আক্রান্ত কোনো লাশ পারিবারের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। অতঃপর এখানেও কিছু টাকা পয়সা দিলে, দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার জানায়, শহীদের নামে জঙ্গি মামলা হলে লাশ দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমান একজন জঙ্গি ছিলেন এবং একারণেই তিনি বিজিবির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, এমন লিখিত কাগজে শহীদ পরিবার স্বাক্ষর করলে তবেই তাদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা যেতে পারে; নয়তো এই লাশ হাসপাতালের মর্গে নষ্ট হবে অথবা বেওয়ারিশ জঙ্গি লাশ হিসেবে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে জমা দেয়া বা সরকারি নির্দেশ মতো অন্য যেকোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নির্লজ্জ খুনি পুলিশের মুখে এমন লোমহর্ষক কথা শুনে তাজ্জব বনে যান শহীদ পরিবার। অবশেষে তারা গুন্ডা পুলিশের কথায় রাজি হয়ে তাদের কাগজে স্বাক্ষর করেন। সারাজীবন কোনো দল বা রাজনীতি না করা বাংলার এক পরহেজগার সাধারণ কৃষক স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের নৃশংস গণহত্যার শিকার হয়েও মৃত্যুর মাত্র কয়েক মূহুর্তেই একজন জঙ্গির পরিচয় পেয়ে গেলেন। পরিবারের একমাত্র অভিভাবকের এমন করুণ মৃত্যুতে কেউ যেন কান্না করারও সাহস পাচ্ছে না। প্রতিমুহূর্তে একটা না একটা নতুন নৈরাজ্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে শহীদ পরিবারকে।

এই অবর্ণনীয় বর্বরোচিত সেক্টরগুলো একটা একটা করে চুকিয়ে ৩১ জুলাই বিকাল ৫ টায় শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমানের মরদেহ নিয়ে এম্বুলেন্স রওনা দেয় নরসিংদীর উদ্দেশ্যে।

নিজের বাড়িতে শহীদের লাশ

সন্ধ্যার পরে শহীদের লাশের গাড়ি নিজ বাড়িতে পৌঁছালে চারদিকে কান্নার রব শোনা যায়। এমন সহজ সরল নির্ভেজাল একজন নামাজি ব্যক্তির এরকম নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার কথা শুনে আশপাশের গ্রাম থেকেও ছুটে আসে শত শত মানুষ। অবশেষে ঐ রাতেই বাদ এশা শহীদের নিজ জন্মস্থান চৌয়া, মেহেরপারা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে হাজারো জনতার উপস্থিতিতে জানাজা শেষে মেহের পাড়ায় সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয় শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমানকে।

স্মৃতিচারণ

শহীদ সম্পর্কে তাঁর ভাতিজা জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান বলেন- "মোহাম্মদ আবদুর রহমান, তিনি একজন আলেম ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোন দলের অধিভুক্ত নন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন।"

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমান স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে গেছেন। তার স্ত্রী সায়েমা আক্তার একজন গৃহিণী। শহীদের ২০ বছর বয়সী বড়ো মেয়ে তৌফিকা রহমান এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। ১৬ বছর বয়সী ছোট মেয়ে তৌহিদা রহমান এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। আর ১৪ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে মোঃ তৈবুর রহমান নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

কাজী মোঃ আব্দুর রহমান শহীদ হওয়ায় তারা তিন ভাইবোন বাবাহারা এতিম হয়ে গেলো। পরিবারের একমাত্র অভিভাবক শ্রদ্ধেয় পিতার এমন করুণ মৃত্যু তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। শোক প্রকাশের ভাষাও যেন হারিয়ে ফেলেছে শহীদের স্ত্রী ও সন্তানেরা।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

বর্তমানে খুবই সীমত পরিসরে শহীদ পরিবারকে সহযোগিতা দিচ্ছেন শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমানের শ্যালকরা। তার ৬ শতাংশ জমির উপর একটা পাকা ঘর আছে এবং ২২ শতাংশ আবাদী জমি আছে। আশেপাশের মানুষের সহায়তায় বর্তমানে শহীদের পারিবারিক ভরণপোষণ চলছে। শহীদ কাজী মোঃ আব্দুর রহমানের পরিবার প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার ঋণে আছে। তার তিন সন্তানের পড়ালেখা অনেকটা বন্ধের পথে। একমাত্র উপার্জনক্ষম অভিভাবককে হারিয়ে শহীদ পরিবার অর্থনৈতিকভাবে খুব কষ্টে এবং শোকে দিন কাটাচ্ছে।

প্রস্তাবনা

শহীদের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করা, শহীদ সন্তানদের পড়ালেখার সুব্যবস্থা করা, সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য চাকরি নিশ্চিত করা, একমাত্র বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক ভাতা চালু করা এবং দুটি মেয়েকে সুপাত্রের কাছে পাত্রস্থ করার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলের।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র
নাম
কাজী মোঃ আব্দুর রহমান
Name
KAZI MD ABDUR RAHAMAN
পিতা
কাজী মোঃ আমির উদ্দিন মিয়া
মাতা
মোসাঃ ফাতেমা বেগম
Date of Birth 03 Jul 1980
NID No 145 282 4616

একনজরে শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমান

পূর্ণ নাম	: কাজী মো: আব্দুর রহমান
জন্ম তারিখ	: ৩ জুলাই ১৯৮০
জন্মস্থান	: নরসিংদী
নিজ জেলা	: নরসিংদী
পেশাগত পরিচয়	: কৃষক
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : দক্ষিণ চৌয়া, ইউনিয়ন : মেহেরপারা, থানা : মাধবদী, জেলা : নরসিংদী
পিতার নাম	: কাজী মোঃ আমির উদ্দিন মিয়া
মায়ের নাম	: মোসাঃ ফাতেমা বেগম
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ০৪
মাসিক আয় ছিলো	: ১৫০০০ টাকা
ঘটনার স্থান/পয়েন্ট/এলাকা	: পাঁচদোনার মোড়, মাধবদী
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: শেখ হাসিনার ঘাতক বিজিবিবাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩.৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ, সময়, ও স্থান	: ৩১ জুলাই ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শহীদের জানাজা	: বাদ এশা, দক্ষিণ চৌয়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চৌয়া মেহেরপাড়া, পাথরপাড়া সামাজিক কবরস্থান

শহীদ মোঃ শাওন

ক্রমিক : ১৯৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৩

দীর্ঘ ষোলো বছর বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশীদের উপর, বিশেষ করে এদেশের মুসলমানদের ঘাড়ের উপর সিন্দাবাদের ভুতের মতো চেপে বসে মেটিকিউলাস ডিজাইন এক্সপার্ট খুনি হাসিনার শত সহস্র অপকর্মের বিরুদ্ধে সর্বশেষ আন্দোলন তথা সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে রাজপথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা এক সাহসী তরুণ শহীদ মোঃ শাওন।

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: শাওন ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর নরসিংদী জেলার ইসলামাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৃত মো: মজিবুর মিয়া এবং মাতা মোসাঃ হাসিনা বেগম।

শহীদ শাওনের দিনকাল

পিতা অসুস্থ হওয়ার পরে মো: শাওন অভাবের সংসারে নিজের পড়াশুনা বাদ দিয়ে চাকুরীতে যোগদান করেন। ২ বছর আগে শহীদের পিতা ইহজগৎ ত্যাগ করেন। শাওন গত ৪/৫ বছর ধরে শফি টেক্সটাইলে একজন শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। সকালে নাস্তা করে ডিউটিতে যাওয়া। ডিউটি শেষ করে এসে ফ্রেশ হয়ে পরিবারের কাজে সহযোগিতা করা। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, গল্প করা। ছুটির দিনে ঘুরতে যাওয়া। মাকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে সময় দেয়াসহ ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকা। পত্র-পত্রিকা পড়া। দেশ বিদেশের রাজনৈতিক খোঁজ খবর রাখা। এগুলোই ছিলো শহীদ মোঃ শাওনের প্রতিদিনকার রুটিন।

গত ষোলো বছরে বাংলাদেশ

মাথায় পট্টি আর হাতে তসবিহ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশকারী দিনের ভোট রাতে করা ভোট-ডাকাতদের ডাকুরানী হাসিনা টানা চতুর্থ বারের মতো প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রের অস্ত্রের মুখে ২০২৪ সালে ড্রাকুলার মতো আবারো হরন করে জাতির ভবিষ্যত; শুষে নেয় মানুষের মৌলিক অধিকার; গিলে খায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব।

নিজেকে একচ্ছত্র অধিপতি মনে করা কাঁঠালরানী খ্যাত হাসিনা এই দেশ রাষ্ট্রকে তার বাপ-দাদার রেখে যাওয়া জমিদারি সাব্যস্ত করে চরম নির্লজ্জতার সাথে। ধূর্তবাজ, মূর্খ, গোবর-মগজে হাসিনা নিজেকে দেখে খেঁকশিয়াল হিসেবে আর দেশের আমজনতাকে দেখে, কখনো তুলতুলে মাংসোল খরগোশ; কখনো কুড়মুড়ে হাড্ডিসার কানাবগি। এই দেশটা যেন তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একটা খামার। আর দেশের মানুষগুলো যেনো সেই খামারের গরু-ছাগল-গাধা-ভেড়া-বকরির বিশাল এক পাল। ভিনদেশী হিংস্র জানোয়ার ব্যাঘ্র দাদারা যখন যা চায়; যাকে চায়, পরকিয়াপ্রেমী আওয়ামী সরকার তাকে নিয়েই বলি করে স্বামীর মতো প্রতিবেশী দেবতার চরণে।

'ভাঙা আর শাসন করা'য় প্রশিক্ষিত কাঁঠালরানী এই দেশ এই জাতিকে বিভিন্নভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করে শাসন শোষণ করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। সকল ধরনের অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-অনাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে বিরোধী দলমত দমন করা তার স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য।

আর টানা ষোল বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ঔরসে অবৈধ গর্ভপাতের ফসল সন্ত্রাসবাদী অপরাজনীতির কূটকৌশল দমন-পীড়ন নীতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে নিজের জন্য খাল কেটে কুমির ডেকে আনে নৈরাজ্যের উত্তরসূরী স্বৈরাচারী হাসিনা।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০১৮ সালের কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন নামে রাজপথে ফিরে আসে। সরকার আগের বারের মতো এবারো নানা কূটচালে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবিতে ব্যাপক সারা জাগানো এই আন্দোলনক; কিন্তু না। সেবার ঘুঘু এসে ধান খেয়ে গেলেও এবার আর পারলো না। এবার শিক্ষার্থীরা অনেক সচেতন। তারা লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিলো। আর শিক্ষার্থীদের এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ডাকে সারা দিলেন শহীদ মো: শাওন।

সকল ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই আন্দোলনের সর্বশেষ খবর রাখার চেষ্টা করতেন। কিছু কিছু বন্ধুকেও যুক্ত করেন এই আন্দোলনের সাথে। তাঁর ফুফাতো ভাই মো: আক্তার হোসেন নিরব একসাথেই চলাফেরা করতো। তাকেও তিনি আন্দোলনে যোগদান করালেন। এভাবে একে একে প্রায় অধিকাংশ বন্ধুকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন শহীদ শাওন। কোনো কোনো বন্ধু তো নিজে থেকেই প্রস্তুত ছিলো, শাওন বলার সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল। এভাবে একদিন দুইদিন করে যত দিন যাচ্ছে ততই যেন চাঙা হয়ে যাচ্ছে আন্দোলন। দাবি আদায় না করে ঘরে ফিরবে না তারা।

শিক্ষার্থীদের এমন কঠিন অবস্থান দেখে স্বৈরাচার সরকার গুলি করলো নিরহ নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের উপর। ১৬ জুলাই রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারা দেশে প্রায় ৬ জন শিক্ষার্থী শাহাদাত বরণ করেন। ১৭ জুলাইও হত্যাকাণ্ড চালায় হাসিনা সরকার। ১৮ জুলাই এক প্রকার গণহত্যা করে রক্তপিপাসু ড্রাকুলা পিশাচ হাসিনা। শহীদ মোঃ শাওন এবার আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। খুনি সরকারের এই ন্যাক্কারজনক কাজের প্রতিবাদ না করলে আর হচ্ছে না।

আন্দোলনে যোগদান

সর্বপ্রথম ১৮ জুলাই ২০২৪ মাধবদী বাসস্ট্যান্ডে সমবেত জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন শহীদ মোঃ শাওন। সেদিন ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অতর্কিত হামলা করে আওয়ামী সরকারের দোসর খুনি দূর্নীতিবাজ পুলিশবাহিনী। তারা ছাত্র-জনতার সমাবেশ লক্ষ্য করে টিয়ারগ্যাস, ছররাগুলি, রাবার বুলেটসহ বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে। তবুও থামে না আন্দোলনকারীদের সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত স্লোগান। থামে না ' নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার ' ধ্বনি। বরং দিগুণ, তিনগুণ, শতগুণ শক্তিতে উচ্চারিত হচ্ছে ছত্র আন্দোলনের নতুন নতুন

বিভিন্ন জাগরণী স্লোগান। কিন্তু অনবরত গুলি আর কাঁদানো গ্যাসের সামনে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে আহত, নিহতের সংখ্যা। চারদিকে মানুষের চিৎকার আহাজারি। কে কাকে কিভাবে সাহায্য করবে তারও কোনো দিশা নাই যেন। আন্দোলনকারী যোদ্ধারা একজনের পাশে লুটিয়ে পড়ছেন অন্যজন। একটা রাবার বুলেট এসে শহীদ শাওনের পিঠে লাগে। অবশেষে চরিত্রহীন পুলিশের অনবরত আক্রমণে সেদিনের জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন।

শহীদ মো: শাওন পিঠে রাবার বুলেট নিয়ে ছুটে পার্শ্ববর্তী ক্লিনিকে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবার ঘটনাস্থলে যান কাউকে উদ্ধার করা লাগবে কি না তা দেখার জন্য। অবশেষে বন্ধু আর সহযোদ্ধাদের সাথে পরের দিন আবার সমাবেশ বা বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরে আসার পর শহীদ শাওনের মা তাঁকে আর আন্দোলনে যেতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন এসব করে আমাদের লাভ কি? আজকে যেহেতু গুলি খেয়ে বেঁচে এসেছিস তাহলে কালকে আর যাসনে বাবা। শহীদ শাওন মায়ের কথায় কোনো উত্তর দেন না। তাঁর মাথায় শুধু আন্দোলনের চিন্তা। যাকে যাকে বলার আজকেই বলে রাখতে হবে। তাই মাকে আপাতত একটা বুঝ দিয়ে শান্ত করলেন শহীদ শাওন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার শহীদ মো: শাওন তাঁর নিজ এলাকার মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়েন। তারপর মসজিদের পাশে দাঁড়িয়েই উপস্থিত বন্ধু আর এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা সেরে নেন। সবাই ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। অতঃপর তিনি বাসায় গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাসা থেকে বের হয়ে যান। মাকে বলতে খুব ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু না! মা জানতে পারলে কোনভাবেই আন্দোলনে যেতে দিবেন না। তাই মায়ের কাছে বিদায় বা দোয়া নেয়ার বাসনা আপাতত কোরবানি করা হলো।

শহীদ মো: শাওন বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ একা একাই হাঁটলেন। একটু সামনে গেলে তাঁর সাথে যোগদেন আরও দুই বন্ধু। তিনজন হেঁটে আর একটু সামনে গেলে তাঁদের সাথে যোগ দিলেন আরও তিনজন ছাত্র। এবার ছয়জনের দল মহল্লার সরু রাস্তা পার হয়ে বড়ো রাস্তায় উঠলে তাঁদের সাথে যোগদান করেন অপেক্ষারত ৫ জন এলাকাবাসী। এখানে এসে শহীদ মোঃ শাওনের মনে পড়লো ফুফাতো ভাই আক্তার হোসেন নিরবের কথা। সে তো এখনো আসেনি। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফুফাতো ভাইকে কল করলেন তিনি। ওপাশ থেকে তাঁর ফুফাতো ভাই জানালো যে সে একটু দূরে আছে। তার পৌঁছাতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। অতঃপর নিরবকে ছাড়াই তাঁরা রওনা দেন গন্তব্যস্থান মাধবদী চৌরাস্তা বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকেই মূলত আন্দোলন শুরু হবে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর তাদের দলে যোগ হন আরও ৪ জন। তাঁদের চলার পথে এখনো সেনাবাহিনী, বিজিবি বা পুলিশ দেখা যায়নি। এটা একটা ভালো দিক। তবে কখন যে চলে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সবসময় চোখ কান খোলা রাখতে হবে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেলো নির্ধারিত পয়েন্ট মাধবদী বাসস্ট্যান্ড সোনালী টাওয়ারের সামনে। এই টাওয়ারের মালিক আওয়ামীলীগ নেতা পৌরসভার মেয়র মোশাররফ হোসেন মানিক। এখানে অনেক লোকের সমাগম। এখান থেকেই শুরু হবে বিক্ষোভ মিছিল। সবাই প্রস্তুত বিক্ষোভ মিছিলের জন্য। এমন সময় অতর্কিত গুলি! শহীদ মো: শাওন লুটিয়ে পরলেন রাস্তায়। তাজ্জব ঘটনা চারপাশে তো প্রশাসন বা অন্য কোন বাহিনীর কাউকে চোখে পড়ছে না! তাহলে?

হ্যাঁ গুলি তো আসছে উপর থেকে! সোনালী টাওয়ারের দিক থেকে! ওদিকে তাকালেই সবাই দেখতে পায় সোনালী টাওয়ারের উপরে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা স্বৈরাচারের লেলিয়ে দেয়া কুকুর, আওয়ামী সন্ত্রাসী পৌরসভার মেয়র মোশাররফ হোসেন মানিক তার অস্ত্রধারীদেরকে নিয়ে ছাত্রজনতার উপর একযোগে গুলি ছুঁড়ছে! কিছু বুঝে ওঠার আগে আবার গুলি। আবার একজন পড়ে গেলেন রাস্তায়। এতক্ষণে সবাই ছুটাছুটি শুরু করেছে নিরাপদ

অবস্থানের খোঁজে। গুলি আসছে উপর থেকে। মানুষ পালাচ্ছে এদিক সেদিক। কেউ একজন তুলতে এলেন শাওনকে। সাথে সাথে গুলিবিদ্ধ হলেন তিনিও। উপর থেকে বৃষ্টির মতো ছুঁড়ছে গুলি আর নিচে অসহায় মানুষের দৌড়াদৌড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো। অর্থাৎ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলি ফুরিয়ে গেছে। ওরা এখন দ্রুত গতিতে নিচে নেমে আসছে। ছাত্র-জনতাকে আহত করার জন্য। এবার সাহসী কয়েকজন ছাত্র আর কয়েকজন যুবক ছুটে গেলো তাদের প্রতিরোধ করতে। মোঃ শাওন হঠাৎ একটা হিচকি দিয়ে বমি করে দিলেন। তারপর নিথর হয়ে পড়ে রইলেন আবার। কয়েকজন এসে শাওনকে তুলে নিলেন রাস্তা থেকে। বড়ো একটা গ্রুপ পথ আটকে দিয়েছে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের। বাকিরা এসে সকল আহতকে তুলে নিয়ে ছুটলেন সদর হাসপাতালের দিকে।

ভর্তি নেয়নি হাসপাতাল

শহীদ মো: শাওন সহ অন্যান্য আহতদের নিয়ে সদর হাসপাতালের দিকে ছুটছেন ছাত্র-জনতা। ভ্যান, রিকশা ও অটো ছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় নেই। অনেক অনুরোধ করেও পাওয়া যায়নি এম্বুলেন্স। তাদেরও তো জীবনের ঝুঁকি আছে।

সবাইকে নিয়ে নরসিংদির সদর হাসপাতালে পৌঁছালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের ভর্তি নিতে অপারগতা প্রকাশ করে। বলে, প্রশাসন থেকে নির্দেশনা আছে, যেকোনো সরকারি বা আধা সরকারি বাহিনী অথবা সরকার দলীয় কারো দ্বারা আহত বা নিহত কেউ সরকারি হাসপাতালে এলাউ না। ভর্তি তো দূরের কথা, আমরা ধরেও দেখতে পারবো না। এই সব ফ্যাসিস্ট কথাবার্তা শুনে কয়েকজন ছাত্র তাদের সাথে ঝামেলা করতে গেলে তারা প্রশাসনকে ডেকে আনার হুমকি দেয়। কর্তব্যরত ডাক্তার বলেন, "ভাই শুধু শুধু এখানে ঝামেলা করছেন কেনো। আমাদের হাত পা বাঁধা। আপনারা কাল বিলম্ব না করে দ্রুত অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।" আর নিথর শাওনের দিকে আঙুল ইশারা করে বললেন, "ওনাকে নিয়ে লাভ নাই। উনি মৃত্যুবরণ করেছেন। দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে পারেন।"

অবশেষে ধরে না দেখলেও ডাক্তারের মুখের এমন শক্ত ঘোষণায় সবাই বুঝতে পারলো, তরুণদের উদাহরণ মো: শাওন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হলেন। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

জানাজা ও দাফন কাফন

পরবর্তীতে নিজ গ্রামে শহীদ শাওনের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে আলগী মোনোহরপুর কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

হৃদয় বিদারক অনুভূতি

শহীদ মোঃ শাওনকে নিয়ে ছাত্র-জনতা তাঁর বাড়ি পৌঁছালে এক শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শহীদের মা যেন বিমূর্ত পাথর। প্রিয় ভাই, বন্ধুরা যেন থামাতে পারছেনা কান্না।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ শাওনের বিধবা মা হাসিনা বেগম (৪৫) একজন গৃহিণী। শাওনের বড়ো ভাই মোঃ রবিউল (২৬) সৌদি প্রবাসী। তাঁর আর এক বড়ো ভাই মোঃ অলিউল্লাহ (২৪) দোকানে চাকরি করেন।

পরিবারটির আয় ৩০০০/- টাকা; যা ঘরভাড়া থেকে আসে। ঘরভাড়া ছাড়া অয়ের অন্য কোন উৎস নেই। বর্তমানে ৫টি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে, তারা নিজ বাড়িতে থাকে। বাড়ির জায়গা পরিমাণ ৩.৭৫ শতাংশ। শাওনের বাবা ২ বছর পূর্বে মারা গেছেন। আধাপাকা বাড়িতে গোটা পরিবার বসবাস করছেন। শাওনের কোন ঋণ নেই।

প্রস্তাবনা

মায়ের জন্য নিয়মিত বিধবা ভাতা এবং শাওনের ইমিডিয়েট বড়ো ভাইয়ের জন্য স্থায়ী কোন ব্যবসা বা দোকান করে দেয়া যেতে পারে।

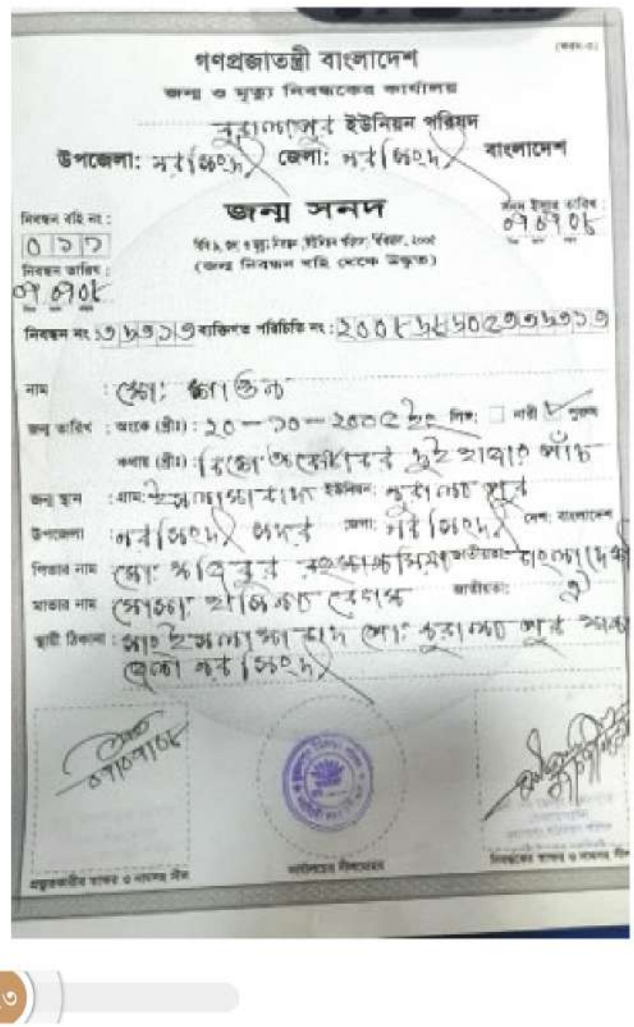

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: শাওন
জন্ম	: ২০ অক্টোবর ২০০৫
জন্মস্থান ও নিজ জেলা	: ইসলামাবাদ, নুরালাপুর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী
পেশা/পদবী	: চাকুরি, গার্মেন্টস কর্মী
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: শফি টেক্সটাইল
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: আলগী মনোহরপুর, ইউনিয়ন : নুরালাপুর, থানা: মাধবদী, জেলা : নরসিংদী
পিতার নাম	: মো: মজিবুর মিয়া (মৃত)
মাতার নাম	: মোসা: হাসিনা বেগম
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিণী (৪০)
আয়ের উৎস	: ৩০০০/- ঘর ভাড়া
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন।

মা এবং ২ ভাই

ঘটনার স্থান/পয়েন্ট/এলাকা	: সাদবদী বাস স্ট্যান্ড, সোনালী টাওয়ার
আক্রমণকারী/আঘাতকারীর	: মো. মোশারফ (মেয়র, মাধবদী পৌরসভা)
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪টা ৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, ৪টা ৩০ মিনিট, সাদবদী বাস স্ট্যান্ড, সোনালী টাওয়ার
জানাজা	: আলগী মনোহরপুর, ঈদগাহ মাঠে শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান: আলগী মোনোহরপুর কবরস্থান

“ইস ! গুলি খেলাম ।
মরলে তো শহীদ হতে পারতাম ।”

শহীদ সুমন মিয়া

ক্রমিক : ১৯৬
আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৪

শহীদ মোহাম্মদ অহিদ মিয়া গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানায় ১৯৯৭ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: খোরশেদ এবং মাতার নাম ফুরকান বিবি । অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন । পিতার মৃত্যুর পর আর পড়ালেখা করার সুযোগ পাননি মোহাম্মদ অহিদ মিয়া। এরপরই ঢুকে যান চাকরি জগতে। পোশাক কারখানার হেলপার হিসেবে নিয়োগ পান। স্বল্প বেতনে মাকে নিয়ে ভালোই বেশ ভালো চলছিল শহীদের সংসার । ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, হঠাৎ তার বড় বোনের তালাক হয়ে যায়। তালাকপ্রাপ্ত বোনের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। এরপর অপারেটরের কাজ শিখে ২০২২ সালে যোগ দেন শান টেক্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে । অপারেটর হিসেবে তার বেতন ছিল ১৫ হাজার টাকা ।

শহীদের পরিচয়

শহীদ সুমন মিয়ার জন্ম ২০০৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নরসিংদী জেলার খনমদী গ্রামে। তাঁর বাবা মৃত হাসেন আলী এবং মা আমিরুন বেগম। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন সুমন মিয়া । তিনি ছিলেন একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। জামিয়া এমদাদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১০ম শ্রেণিতে পড়তেন তিনি। শহীদ সুমন পড়াশোনার পাশাপাশি কাঁচা সবজি বিক্রয় করতেন। ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আলোলানে তিনি শহীদ হন।

শহীদ সুমন মিয়ার দিনকাল

ছোট বেলায় বাবা হারা এতিম সুমন মিয়ার ছিল পড়া লেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ। কিন্তু বড়ো ভাইদের উপার্জনে চলা অভাবের সংসারে লেখাপড়া যেন একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও শহীদ সুমনের মা এবং ভাইদের ইচ্ছা ছিল সুমন পড়ালেখা করুক। পরিবারের একজন অন্তত শিক্ষিত হোক। আর তাই, সকলের মনের বাসনা এক জায়গায় এসে মিলে গেলে অভাব আর দারিদ্রতা আটকিয়ে রাখতে পারেনি শহীদ সুমন মিয়ার পড়ালেখা। তিনি বহুগুণ আগ্রহ আর চেষ্টা নিয়ে নিজের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একটা পর্যায়ে তিনি নিজেই লক্ষ্য করলেন যে, এভাবে আর চলছে না। প্রত্যেকের হাড়ভাঙা খাটুনিতে যেখানে দুইবেলা খেয়ে, বেঁচে-বর্তে থাকতেই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে তিনি ঠান্ডামাথায় পড়ালেখা করবেন কিভাবে?

শহীদ সুমন তাঁর মা এবং বড়ো ভাইদের অনুমতি নিয়ে কাঁচা সবজি ব্যবসার কাজে নেমে পড়েন। ব্যবসা করেই নিজের পড়ালেখার খরচের পাশাপাশি মায়ের এবং পরিবারের কিছু খরচও চালাতেন তিনি।

শহীদ সুমন ছিলেন পরিবারের সকলের আদরের। আর তিনিও যেন সকলের না বলা কথা; প্রকাশ না করা আশা-আকাঙ্খা ঢের বুঝতে পারতেন। তাই সবার জন্যই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করতেন। সে জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেও পিছপা হতেন না।

প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে পাইকারী বাজার থেকে কাঁচা সবজি কিনে এনে সেগুলো ধোয়া মোছা করে দোকানে সাজাতে সাজাতে বাজার শুরু হয়ে যায়। শহীদ সুমন সকাল ১০ টা পর্যন্ত বেচা-কেনা করে মাদ্রাসায় চলে যান। বিকাল ৪ টায় মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরে কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবার বিকাল ৫টায় চলে যান কাঁচা সবজি বিক্রি করতে। তারপর একটানা রাত ১২ টা পর্যন্ত। এতো রাতে বাসায় ফিরে দুমুঠো খেয়ে, কখনো পড়তে বসতেন আবার কখনো ঘুমিয়ে যেতেন। আবার শেষ রাতের দিকে উঠে পড়ালেখা করতেন, নামাজ পড়তেন। সবকিছু কেমন যেন এক প্রাণোজ্জ্বল শক্তি দিয়ে সমন্বয় করে চলতেন তিনি। সোমবার ছিল তাঁদের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। অর্থ্যাৎ সেদিন তাঁরা বাজারে যেতেন না। তাই সোমবার বেশির ভাগ সময় তিনি পড়ালেখা করে কাটাতেন। বাকি সময়টা পরিবার, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদেরকে দেয়ার চেষ্টা করতেন। শহীদ সুমন একজন সদালাপি মিশুক ছেলে ছিলেন। অল্পতেই সবার সাথে মিশে যেতেন তিনি। আর এভাবেই কাটছিল অনাগত সুন্দর ভবিষ্যৎ তথা সফলতার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিনের সংগ্রামী জীবন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

শাহীদ সুমন নিয়মিত মাদ্রাসায় ক্লাস করার চেষ্টা করলেও সহপাঠী বন্ধুদের খুব বেশি সময় দিতে পারতেন না। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাঁকে একজন কঠোর পরিশ্রমী ও সৎ ছেলে হিসেবে জানতেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে শহীদ সুমন তাঁর সহপাঠীদের কাছে জানতে পারেন যে, সারাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

শহীদ সুমন শুরুতে ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও বন্ধুরা তাঁকে বিস্তারিত বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন। তাদের মাধ্যমে সুমন জানতে পারেন, ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই শুরু করেছিল সেই আন্দোলন। সে বছর কুচক্রী আওয়ামী সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি ঠিকই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবার দুইজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তানকে দিয়ে হাইকোর্টে আপিল করিয়ে ছাত্রদের পাক্ষে দেয়া রায়কে বাতিল করায়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে রাজপথ থেকে ঘরে ফিরিয়ে তারপর আবার এমন মুনাফেকি আচরণ! সাধারণ শিক্ষার্থীরা এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তারপর নিজেদের মধ্যে আরও প্রস্তুতি গ্রহণ; আরও শক্তি সঞ্চয় করণ; অতঃপর ২০২৪ সালে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে আবার ফিরে আসা রাজপথে।

শহীদ সুমনের মনে পড়ে যায়। ৪ বছর আগের ঘটনা। ২০১৮ সালে তিনি আরও ছোট ছিলেন। তখন সহপাঠীদের সাথে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে রাজপথে নেমেছিলেন তিনি।

সহপাঠী আর বন্ধুদের সাথে দিনের পর দিন রাজপথে থেকেছিলেন শহীদ সুমন। সে বছর এই স্বৈরাচার সরকারের কাছ থেকে যৌক্তিক কিছু দাবি আদায়ে অনেক কাঠ-খড় পোরাতে হয়েছিল স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে। ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের নামেও মামলা করেছিল এই ফ্যাসিস্ট হাসিনা। কিন্তু সে বছর কারো কোন চোখ রাঙানি কাজে লাগেনি। শহীদ সুমনদের মতো ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা নিজেদের দাবি আদায় করে তারপর রাজপথ ছোড়ছিল সেই ২০১৮ সালে। সে বছর অনেক বেশি ছোট থাকার কারনে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সুমন বুঝেওনি আর কেউ তাঁকে বুঝাতেও আসেনি। তাই যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এবার তো সুমন আরও পরিপক্ক। আরও বেশি বুঝেন; বুঝার ক্ষমতাও রাখেন। আবার যেহেতু ডাক এসেছে, এবার আর ঘরে বসে থাকা যায় না। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সম্মুখে থেকে অংশগ্রহণ করবেন।

তারপর জুলাইয়ের প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান আর শিক্ষার্থীদের হার না মানা আন্দোলন। হঠাৎ ১৬ জুলাই, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর স্বৈরাচার সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলি! শহীদ হলেন রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারা দেশে কমপক্ষে ৬ জন শিক্ষার্থী। গর্জে উঠলো ছাত্র সমাজ; গর্জে উঠালো বাংলাদেশ আর গর্জে উঠলেন শহীদ সুমন মিয়া। সারা জীবন হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না পোষণ করা সুমন আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। ১৭ জুলাই সরাসরি যোগ দিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। তারপর ১৮ জুলাই স্বৈরাচার খুনি সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ম্যাসাকার চালায়। সারা দেশের নিরীহ মানুষের সাথে সাথে বুক কেঁপে উঠে সম্মুখ সারিতে আন্দোলন করা সাহসী সুমনেরও। নিজের সামনে সহপাঠী আর সহযোদ্ধাদের আহত, নিহত হতে দেখেছেন তিনি। শোকে দুঃখে বুক যেন তাঁর অসহনীয় ভারি হয়ে উঠে। ১৮ জুলাই রাতে রক্তপিপাসু হাসিনা ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে সারা দেশে কারফিউ জারি করে। ১৯ জুলাই শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে বন্ধুদের সাথে কারফিউ ভেঙে আন্দোলনে নামেন শহীদ সুমন। সেদিন সুমনের সাথে তাঁর ইমিডিয়েট বড় ভাই জুলহাস মিয়া আন্দোলনে গিয়েছিলেন। সেদিনও রাজপথে শতশত লাশ ফেলেছিল খুনি আওয়ামী সরকার। শহীদ সুমন তাঁর ভাইকে নিয়ে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন বাড়িতে। দুইভাই বাড়ি ফিরে আসলে তাঁদের মা আমিরুন বেগম ছেলেদের কোন প্রকার আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে দেন।

দেশের এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখে তাঁদের মায়ের মনে ভয় বাসা বেঁধেছে বুঝতে পেরে আর ভাইদের সাথে সুমন নিজেও তাঁর মাকে শান্তনা দেন এবং তিনি আর আন্দোলনে যাবেন না বলে সেদিনের জন্য আশ্বাস দেন।

কিন্তু পরের দিন ২০ জুলাই কাউকে কিছু না বলে সুমন ঠিকই আন্দোলনে চলে যান।

ঘটনার দিন

২০ জুলাই শনিবার, দুপুর ৩ টার দিকে পরিবারের কাউকে কিছু না বলে শহীদ সুমন বন্ধুদের সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যান। কারফিউ ভেঙে তাঁরা আন্দোলন করতে চলে যান রাইনওকে মার্কেটে মাধবদী বাজার এলাকায়। সেদিন চার পাশ থেকে শত শত ছাত্র-জনতা এসে যোগ দেয় তাঁদের সাথে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত রাজ পথ। বিকাল ৫.৩০ টার দিকে হঠাৎ মাধবদী থানার খুনি পুলিশবাহিনী এসে ছাত্র-জনতার সমাবেশকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে কয়েকজন। ঘাতক পুলিশের একটি গুলি সুমনের পিঠ দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর বন্ধুরা পাশেই ছিল। কিন্তু স্বৈরাচার পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলির মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তারা।

উদ্ধার এবং হাসপাতালে ভর্তি

বেশ কিছুক্ষণ নারকীয় কাণ্ড সম্পাদন করে পালিয়ে যায় পুলিশ। তারপর বন্ধুরা এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় পাশের প্রাইম হাসপাতালে। সেখানে পরিচিত একজন সুমনের বাড়িতে খবর দেন। শহীদ সুমনের মা এই খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সাথে সাথে সুমনের ভাই জুলহাসকে ফোন করে জানান। জুলহাস মিয়া মায়ের কাছে নিজের সহদর ভাইয়ের এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনে পাগলের মতো ছুটে যান প্রাইম হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ডাক্তার শহীদ সুমনকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন।

জুলহাস মিয়া ডাক্তারের পরামর্শে সুমনকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেয়ার জন্য এম্বুলেন্স ডাকেন। এম্বুলেন্স সুমনকে নিতে আসার সময় মাধবদী থানার সামনে আটকে যায়। পুলিশ ঐপাশে কোন এম্বুলেন্স যেতে দিবে না। এমনকি থানার সামনে চেকপোস্ট বসিয়ে সকল প্রকার যানবাহন হতে নামিয়ে নামিয়ে যাত্রীদের চেক করছে গুন্ডা পুলিশ। এম্বুলেন্সের ড্রাইভার এই ঘটনা সুমনের ভাই জুলহাসকে জানায় এবং একটি সিএনজি নিয়ে পুলিশের চেকপোষ্ট পার হওয়ার বুদ্ধি দেয়।আর কোন উপায় নাই দেখে রাজি হয়ে যান জুলহাস মিয়া। একটি সিএনজি ভাড়া কার সহদর আহত ভাইকে নিয়ে রওনা দেন তিনি। সিএনজি থানার চেকপোস্ট পার হওয়ার সময় পুলিশ আটকিয়ে দেয়। তারপর পুলিশ সুমনের ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি পুলিশকে একটু মিথ্যা করে বলেন-"তেমন কিছু না, একটা রাবার বুলেট লেগেছে আমার ভাইয়ের পিঠে।" এক পুলিশ সন্দেহ করেও কি মনে করে যেন ছেড়ে দিলেন। তারপর তাঁরা চেকপোষ্ট পার হয়ে অপেক্ষারত এম্বুলেন্সে করে সুমনকে নিয়ে চলে যান কুর্মিটোলা হাসপাতাল।

এক ঝলক আশার আলো

কুর্মিটোলা হাসপাতালে অনেক চড়াই-উতরাই শেষে সুমনের সফল অস্ত্রোপচার হয়। তারপর আস্তে আস্তে সুমন মিয়া সুস্থতার দিকে এগোতে থাকেন। সবার সাথে কথা বলেন। খাওয়া দাওয়া করেন। মাকে শান্তনা দেন। একবার কথায় কথায় আফসোস করে বললেন - " ইস! গুলি খেলাম।মরলে তো শহীদ হতে পারতাম।"

নাড়ি ছিঁড়া ধন আদরের সন্তানের মুখে এমন কথা শুনে যেন আরও ভয় পেয়ে যান শহীদ সুমনের মা। আর যেন আন্দোলনে না যায় সে ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সুমনকে বুঝাতে থাকেন তিনি। অথচ আল্লাহ যেন শহীদ সুমনের ইচ্ছাকেই কবুল করে নিলেন।

আবার লড়াই জীবনের সাথে

কয়েকদিন পরেই সুমনের অপারেশনের জায়গায় ইনফেকশন হয়। তারপর থেকে কখনো বেডে কখনো আইসিইউতে রাখা হয় বাংলার বীর সুমনকে। এভাবে দিনে দিনে তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকলে কুর্মিটোলা হাসপাতাল থেকে তাঁকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ২১ আগস্ট ঢাকা পিজি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় শহীদ সুমনকে।

অবশেষে দোয়া কবুল

পিজি হাসপাতালে ভর্তি করানোর মাত্র দুই দিনের মাথায় স্বৈরাচারী হাসিনার বিষাক্ত কামড়ের কঠিন যন্ত্রণার সাথে লড়াই শেষে ২৩ আগস্ট সকাল ৭ টায় মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা পান করেন শহীদ সুমন মিয়া। পূর্ণ হয় তাঁর সারাজীবন হৃদয়ে লালন করা শহীদি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।

২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গিয়ে চরিত্রহীন পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে সুদীর্ঘ ৩৪ দিন জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মায়ের অতি আদরের সন্তান শহীদ সুমন এবার নিজের নাম লেখালেন শহীদি মিছিলে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল অন্তত একজনকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার একটি সম্মিলিত পারিবারিক স্বপ্ন।

শহীদের দাফন কাফন

পিজি হাসপাতাল হতে শহীদের লাশ এনে তাঁর বর্তমান বসবাসের এলাকা সিদ্দিক বাজার চায়না মিলের মাঠে বাদ যোহর হাজারো মানুষের- উপস্থিতিতে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আর দ্বিতীয় জানাজা হয় বিকাল ৩ টায় গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ মাঠে। সেখানে শহীদের আত্মীয় স্বজনসহ হাজার হাজার জনতার শোকার্ত কান্না আকাশ বাতাস ভারি কার তোলে। অতঃপর গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ কবরস্থানেই দাফন করা হয় জুলাই বিপ্লবের অন্যতম নায়ক শহীদ সুমন মিয়াকে।

পরিচিত জনের মন্তব্য

শহীদ সুমন মিয়ার ব্যাপারে তাঁর বন্ধু, পাড়াপ্রতিবেশী ও পরিচিতজনদের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা জানান, শহীদ সুমন একজন ভালো ছেলে হিসেবে ঘরে বাইরে ছিলেন পরিচিত মুখ। তিনি কখনো কারো সাথে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদে জড়াতেন না। তার ব্যাপারে এলাকায়, কর্মস্থলে, মাদ্রাসায় কারো কোন অভিযোগ নেই। তিনি সর্বদা একজন হাসিখুশি, সদালাপি ছেলে ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করলেও তাঁর চেহারায় কখনো বিরক্তি বা ক্লান্তির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। বড়ো পরহেজগার ছিলেন তিনি। সকলের বিপদে আপদে সব সময় ছুটে যেতেন শহীদ সুমন।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ সুমন মিয়া ছিলেন তাঁর বাবা মারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবার ছোট। পরিবারে মা ছাড়াও তাঁর আরও চার ভাই এবং তাদের স্ত্রী-সন্তান আছে। শহীদ সুমনের মা আমিরুন বেগম (৫৫) একজন গৃহিণী। সবার বড়ো ভাই মোঃ সুলেমান (৩৫) কাঁচা সবজির ব্যবসা করেন। তাঁর পরের ভাই আক্তার হোসেন (৩০) মালয়েশিয়া প্রবাসী। পরের ভাই মান্না মিয়া (২৮) একজন রিকশা চালক। তারপরের ভাই জুলহাস (২৫)। তিনিও কাঁচা সবজির ব্যবসা করেন।

প্রস্তাবনা

শহীদ সুমনের পরিবারের সবাই ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নাই। পড়াশোনা ও ব্যবসার কাজে শহীদ সুমন বিভিন্ন সময় ঋণ করেন। বর্তমানে তাঁর মোট ঋণের পরিমাণ ১২০০০০ টাকা। বৃদ্ধ মায়ের আয়ের কোন উৎস নেই। শহীদ সুমন মায়ের দেখাশোনা করতেন। এমতাবস্থায় এই শহীদ পরিবারের জন্য একটা স্থায়ী বাড়ি করে দেয়া; শহীদের ঋণ পরিশোধ করা এবং ভাইদেরকে স্থায়ী কোন ব্যবসা বা দোকান করে দেয়া রাষ্ট্র, সরকার এবং আমাদের সকলের জন্য বিবেচ্য বিষয় হতে পারে।

একনজরে শহীদ সুমন মিয়া

পূর্ণ নাম	: সুমন মিয়া
জন্ম	: ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ মৃত্যু : ২৩ আগস্ট ২০২৪ জন্মস্থান : খনমদী, মাধবদী, নরসিংদী
পেশাগত পরিচয়	: একজন ছাত্র, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। এবং একজন কাঁচা সবজি ব্যবসায়ী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: জামিয়া এমদাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা
বর্তমান ঠিকানা	: বদের কামরা। মশিশুরা, সিদ্দিক বাজার, মাধবদী, নরসিংদী
স্থায়ী ঠিকনা	: গ্রাম- খনমদী, ১২ নং ওয়ার্ড, মাধবদী, নরসিংদী
পিতার নাম	: হাসেন অলী (মৃত)
মাতার নাম	: আমিরুন বেগম
শহীদ পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ০৫
প্রথম আন্দোলনে যোগদান	: ১৭ জুলাই ২০২৪
ঘটনার দিন	: ২০ জুলাই, রাইনওকে মার্কেট, মাধবদী
আহত হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫.৩০, রাইনওকে মার্কেট
আঘাতকারী	: ঘাতক পুলিশবাহিনী, মাধবদী থানা
শাহাদাতের সময় ও স্থান	: ২৩ আগস্ট ২০২৪, সকাল ৭টা, ঢাকা পিজি হাসপাতাল
প্রথম জানাজা	: ২৩ আগস্ট ২০২৪, বাদ যোহর, সিদ্দিক বাজার চায়না মিলের মাঠ
দ্বিতীয় জানাজা	: ২৩ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩ টা, গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: গয়নারগাঁও শাহী ঈদগাহ কবরস্থান, মাধবদী, নরসিংদী

বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা পৃথিবীর প্রান্তিক জনতার অন্যতম প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলমের নির্মম মৃত্যুই প্রমাণ করে এদেশের স্বৈরশাসক আওয়ামী সরকার কিভাবে গণহত্যা সম্পাদন করেছে।

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম

ক্রমিক : ১৯৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৫

শহীদের পরিচয়

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার মাধবদী থানার আটপাইকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মজিদ মিয়া এবং মায়ের নাম আফিয়া। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় জাহাঙ্গীর। তিনি পেশায় একজন রিকশাচালক ছিলেন। অন্যের রিকশা ভাড়ায় চালাতেন। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে সরকার পতনের একদফা দাবিতে আন্দোলনে গিয়ে তিনি শহীদ হন।

তৃণমূল নাগরিক জাহাঙ্গীর আলম

দেশের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর একজন অন্যতম প্রতিনিধি হচ্ছেন শহীদ জাহাঙ্গীর আলম। মহাজনের রিকশা ভাড়া নিয়ে সারাদিন যাত্রী টেনে যা পান তাই দিয়ে দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের চেষ্টা চালান তিনি। রিকশা চালিয়ে কোনদিন ভালো খ্যাপ হয়, আবার কোনদিন হয়না। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতির বাজারে গিয়ে পরিবারের জন্য চাল, ডাল, নুন কিনেই ফুরিয়ে যায় তাঁর সারা দিনের উপার্জন। পরিবার পরিজনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য গায়ের রক্ত পানি করে পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। একটু ভালো খাওয়া, ভালো কাপড় পড়া, ভালো জায়গায় থাকার স্বপ্নই যেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। এই এতটুকু স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হয়। রিকশা চালক জাহাঙ্গীর আলমের মত সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষ যেখানে এক বেলার মাছ কিনতেও ১০ দোকান ঘুরে দেখেন; বারবার দামাদামি করেন দোকানিদের সাথে ; আর বেশিরভাগ সময় দামে না মিলার কারণে বাজারেই রেখে যেতে হয় পছন্দের একভাগা গুরামাছ, সেখানে ভালো খাবার, ভালো পোশাক, ভালো বাসস্থান আর ভালো কোন স্কুলে সন্তানদের লেখাপড়া করানোর স্বপ্ন বড়ো বেমানান বটে।

কিন্তু তাঁরা যখন একজন স্বামী; একজন পিতা; একজন বড় ভাই বা পরিবারের অন্যতম একজন অভিভাবক, তখন তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কি তাঁরা অবহেলা করতে পারেন?

না, পারেননা। পারেননা বলেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা করে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পরিবারের জন্য, স্বপ্ন পূরণের জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যান তাঁরা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সারাটা জীবন। এই জীবনযুদ্ধে তাঁরা কখনো আহত বা অসুস্থ হন। কিন্তু কখনোই তাঁরা হেরে যাননা। হেরে যাননি শহীদ জাহাঙ্গীর আলম নিজেও। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন পরিবারের জন্য; দেশের জন্য; দেশের মানুষের জন্য; গণমানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্য; সমাজ, রাষ্ট্র আর জাতির সমস্ত বৈষম্য দূরীকরণের জন্য।

রিকশাচালক যে কারণে আন্দোলনে আসলেন

গ্রামের সহজ সরল একজন রিকশাচালক জনাব জাহাঙ্গীর আলম। পেটের ক্ষুধা, মনের ব্যথা ঢেকে রাখা সদা হাস্যোজ্জ্বল বোকা-সোকা এই ব্যক্তিকে সবাই ভালবাসতো কেবলমাত্র তার সরলতা আর সততার জন্য। এমনকি এলাকার ছোট বড় অনেকেই শহীদ জাহাঙ্গীর আলমের সাথে দুষ্টামি করতো। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কথায় তাঁকে খোঁচাতো, মজা করতো। উদার মনা জাহাঙ্গীরও প্রাণ ঢেলে তাদের ভালোবাসা দিতেন। জীবনের না পাওয়া দুঃখটুকু ভোলার চেষ্টা করতেন। অন্যদের দুঃখও ভুলিয়ে দিতে চাইতেন। তাই কখনো কারো সাথে রাগ করতেন না। আর রাগ কেন করবেন? তিনি তো একজন রিকশাওয়ালা। আপামর জনতার নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী। রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, অলি-গলিতে এক কথায় ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী। তাই তিনিই তো ভালো বুঝেন আমজনতার পালস; তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। ২০২৪ সালের জুলাই মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, রাজপথে বিভিন্ন রকম শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ, মিছিল মিটিং, শোডাউন করে যাচ্ছে। ১৬ জুলাই স্বৈরাচার সরকার শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে চালায় গুলি। রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারাদেশে অন্তত ৬ জন শিক্ষার্থী শহীদ হয়। আহত হয় শত শত শিক্ষার্থী। বাস! মৌচাকে ঢিল মারার মত বোকামি করল মাথামোটা আওয়ামী সরকার। একবার দুইবার নয়, বারবার বহুবার। গুলি খেয়ে ফুঁসে উঠে সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও যোগ দেয় তাদের সাথে। দাবি আদায় না করে তারা ঘরে ফিরবে না । চার বছর আগে ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে স্কুল কলেজের ছোট ছোট বাচ্চারা তখন ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেছিল সুশৃংখলভাবে। তারা গাড়ির কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় আটকিয়ে দিয়েছিল পুলিশ আর র‍্যাবের গাড়িও! এক প্রকার নাকানিচুবানি খাইয়ে ছেড়েছিল স্বৈরাচারী হাসিনার প্রশাসনকে। সেই চার বছর পর আজ আরো পরিপক্ক হয়েছে তারা। সিনিয়রদের সাথে মিলে গড়ে তুলেছে বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যেমন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে খুনি হাসিনার পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সোয়াট, আনসারবাহিনী তেমনি শিক্ষার্থীদের রক্তে হলি খেলায় মেতে উঠেছে। ১৬ জুলাইয়ের পর প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, হোস্টেল, বাসা-বাড়ি সবকিছু। ১৮ জুলাই শিক্ষার্থীদের উপর ম্যাসাকার করে কারফু জারি করে আর ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় খুনি হাসিনা। তারপর জায়গায় জায়গায় চালায় গোপন গণহত্যা, গণকবর আর রাতের আধারে ২৫ মার্চের কাল রাতের মত গণ গ্রেপ্তার। একদিকে কারফিউর কারণে সাধারণ মানুষ ঘরবন্দি অন্যদিকে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় সামাজিক

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনতা স্বৈরাচার সরকারের গোপন অপকর্মের কোন কিছুই জানতে পারলনা। এক সময় কারফিউ তুলে নিলে ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীরা আবারও রাজপথে নামে। আবারও শুরু হয় খুনি হাসিনার ম্যাসাকার। বিশ্ব বেইমান হাসিনার ইশারায় চলে আদালতে দাবি মেনে নেওয়ার নাটক।

অবশেষে জনতার ক্ষুব্ধ রোষে এবং আন্তর্জাতিক চাপে ইন্টারনেট চালু করে দেয় আওয়ামী সরকার। অতঃপর বাংলাদেশের মানুষের সাথে সারা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে যে, কারফিউ দিয়ে আর ইন্টারনেট বন্ধ করে কিভাবে শিক্ষার্থীদের গণহত্যা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেসব ছবি আর ভিডিও পৌঁছে যায় মানুষের হাতে হাতে। সাধারণ জনতা আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। জনস্রোত হয়ে নেমে আসে রাস্তায়। এবার শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আইনজীবী, মুটে-মজুর, শ্রমজীবীসহ বাংলার আপামর জনতা। শুরু হয় সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন। স্বৈরাচার খুনি হাসিনা রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন কোন অস্ত্র বাকি রাখেনি যা আন্দোলনকারীদের উপর প্রয়োগ করেনি। কেবলমাত্র স্বৈরাচারীর সীল মারা তাদের নিজস্ব কিছু পাপাচারীদের বাদে যেখানে যাকে যে অবস্থায় পেয়েছে তাকে সেই অবস্থায় গুলি করে, পিটিয়ে, কুপিয়ে খুন করেছে রক্তপিপাসু হাসিনার প্রশাসন এবং তাদের চরিত্রহীন লম্পট গুণ্ডা পেটোয়া ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর আওয়ামী লীগ। শাহবাগী নাস্তিক আর ওলামালীগদেরও নামিয়েছে ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে। হেলিকপ্টার দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করে মেরেছে সাধারণ মানুষ। রক্ষা পায়নি ঘরের ভিতরে খেলতে থাকা ছোট ছোট শিশু বাচ্চারাও। খুনি হাসিনার গুলি খেয়ে নিজের পুতুলের সামনে লুটিয়ে পড়েছে নাবালক শিশুরা। দেশের এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে নড়ে ওঠে দেশের অতি সাধারণ নাগরিক রিকশাচালক জাহাঙ্গীর আলমের হৃদয়। শত সহস্র প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে।

এই লাশের নগরী; এই মৃত্যু বিভীষিকাময় দেশ; এই আস্থাহীন অবিশ্বাসের রাষ্ট্র; এই রক্ষকরুপী ভক্ষকদের উল্লাসমঞ্চ; রক্তে রঞ্জিত রাজপথ; মজলুমের আহাজারিতে পরিপূর্ণ আকাশ; হতাশা,অভিশাপ মিশ্রিত বাতাস; এই গজবের মহাদেশ কি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি? তার বাংলাদেশ? প্রতিনিয়ত এমন রাক্ষসের কামড় খাওয়া আর কত? রক্ত পানি করা উপার্জনের ভাগ ঘুষখোর হারামখোর ট্রাফিক পুলিশকে দিতে হবে আর কতকাল? রাস্তা ঘাটে অলিতে-গলিতে সারাদিনের কামাই ছাত্রলীগ যুবলীগ ছিনতাইকারীদের, চাঁদাবাজিদের হাতে তুলে দিতে হবে আর কত?

বৃদ্ধ বাবা-মা টাকার অভাবে চিকিৎসাহীনতায় ভুগবে আর কত দিন? স্ত্রীর শরীরে জরাজীর্ণ পোশাক আর কত দিন? সন্তানের সামনে শূন্য ভাতের থালা আর কত? ভাই-বোনদের সামনে ব্যর্থতার লজ্জিত মুখ আর কত দিন? বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরনের এই সংগ্রাম আর কতদিন? আর কতকাল?

সরল সহজ জাহাঙ্গীর আলমের মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু উত্তর কোথায়?

উত্তর আসে রাজপথ থেকে! উত্তর আসে ছাত্র-জনতার আন্দোলন থেকে! উত্তর আসে একের পর এক মৃত্যু থেকে! উত্তর আসে শহীদি মিছিল থেকে! উত্তর আসে দেশব্যাপী বৈষম্যের অরাজকতা থেকে।

একদিকে ঘরে খাবার নেই। অপরদিকে রাস্তায় বের হওয়া যাবে না। বের হলেই গুলি! পাখির মতো গুলি করে ওরা মানুষ মারে! সাপের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে ওরা মানুষ মারে! কসাইয়ের মত কুপিয়ে কুপিয়ে ওরা মানুষ মারে!

হয় ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে না খেয়ে মরতে হবে, না হয় রাস্তায় গিয়ে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

বেঁচে থাকার আর কোন উপায়-ই যেন ওরা খোলা রাখলো না সাধারণ মানুষের জন্য।

এই যখন দেশের অবস্থা; এটাই যখন নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তবতা তখন জাহাঙ্গীর আলমের মত এক সাধারণ রিকশাওয়ালার জেগে ওঠাও অবান্তর নয়; অবাস্তব, অকল্পনীয়, অযৌক্তিক নয়। এটা সময়ের অপরিহার্য দাবি; যৌক্তিক বাস্তবতা। অতঃপর শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে।

যেভাবে আহত হলেন

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দুপুর ১১ টায় শহীদ জাহাঙ্গীর আলম রিকশা চালাতে যাওয়ার কথা বলে জন্মদাত্রী মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

রিকশা চালাতে না গিয়ে তাঁর পরিচিতজনদের সাথে যোগ দেন সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে। পৌরসভার সামনে স্বৈরাচার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন তাঁরা। মানুষ মারতে মারতে যেন প্রশাসনের খুনি বাহিনীরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই যেন সেদিন পৌরসভার সামনে নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর প্রশাসনের কোন বাহিনীর আগ্রাসন লক্ষ্য করা যায়নি। শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবির পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা।

দুপুর ১২ টার দিকে হঠাৎ খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া কুকুর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এসে এলোপাতাড়ি গুলি করে আন্দোলনরতদের উপর। এমন অতর্কিত হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ছাত্র-জনতা। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কয়েকজন। সবাই ছুটাছুটি করে নিরাপদ অবস্থানের জন্য। এমন সময় খুনিদের একটা বুলেট পিছন

দিক থেকে এসে ঢুকে যায় জাহাঙ্গীর আলমের মাথায়। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। আওয়ামী গুন্ডারা অস্ত্রবাজি শেষে পালিয়ে গেলে ছাত্র-জনতা আবার ছুটে আসে আহত, নিহতদের উদ্ধার করতে। সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে।

যেভাবে শহীদ হলেন

গুলিবিদ্ধ জাহাঙ্গীর পড়েছিলেন রাস্তার একপাশে। কেউ তাকে খেয়ালই করেনি। কিছুক্ষণ পরেই একজনের নজর আটকে যায় পড়ে থাকা গুলিবিদ্ধ জাহাঙ্গীরের উপর। সাথে সাথে তাঁকেও তুলে নিয়ে যায় আন্দোলনকারীরা। পৌরসভার পাশেই দেওয়ান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মাথায় গুলিবিদ্ধ জাহাঙ্গীর আলমকে। পরিচিত একজন দেখে তার পরিবারকে খবর দেন। খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর আলমের ছোট ভাই মোঃ সাইদুল ছুটে আসেন হাসপাতালে। দেওয়ান হাসপাতালে জাহাঙ্গীর আলমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে ডাক্তারের পরামর্শে তাকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর ভাই ও ছাত্র-জনতা। সেখান থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। এখানে রক্ত পিপাসু হাসিনার ধারালো দাঁতের বিষের সাথে লড়াই করতে করতে রাত ৯ টায় নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শহীদ জাহাঙ্গীর আলম। মজলুম শহীদদের গণনা খাতায় যোগ হয় আরও একটি সংখ্যা। ত্যাগ আর কোরবানির ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা হয় আরো একটি নাম - জুলাই বিপ্লবের বীর; বিশ্ববাসীর কাছে আওয়ামী স্বৈরাচারের গণহত্যার প্রমাণ রিকশাচালক শহীদ জাহাঙ্গীর আলম।

শহীদের লাশ উদ্ধার

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম ৪ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে শুরু হয় নানা টালবাহানা। পোস্টমর্টেম ছাড়া লাশ দেওয়া যাবে না; আজকে রাতে পোস্টমর্টেম করা যাবে না; পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে; পরেরদিন পোস্টমর্টেম করতে বহু লাশের সিরিয়াল; পোস্টমর্টেম করতে চিকিৎসকদের ধীরগতি; দেশের সার্বিক খারাপ পরিস্থিতি; এরকম নানা অজুহাত তুলে ধরে হাসপাতাল থেকে। অবশেষে ৫ আগস্ট খুনি হাসিনা লক্ষণ সেনের মত খিড়কী দিয়ে পালানোর পরে ছাত্র-জনতা আর হাজার হাজার অভিভাবকদের তোপের মুখে লাশ দিতে বাধ্য হয় হাসপাতাল। ৫ আগস্ট পোস্টমর্টেম শেষে বিকাল ৩ টায় জাহাঙ্গীর আলম এর মরদেহ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেয় এম্বুলেন্স।

শহীদের দাফন কাফন

বিকাল ৩ টায় জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে রওনা দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার বাড়িতে পৌঁছে যায় এম্বুলেন্স। গাড়ি থেকে লাশ নামানোর সাথে সাথেই শোকে বিহ্বলে আকাশ বাতাস ভারী করে তোলে উপস্থিত জনতা। তাঁর বাবা-মায়ের আর্তনাদ দেখে সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না কারো। ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান আর পাড়া-প্রতিবেশীদের কান্নায় অশ্রু ঝরাতে বাধ্য হয় উপস্থিত প্রতিটি নয়ন। অবশেষে নিজের গ্রামের ঈদগা মাঠে হাজারো জনতার উপস্থিতিতে জানাজা শেষে ওই ঈদগাহ কবরস্থানে দাফন করা হয় শহীদ জাহাঙ্গীর আলমকে। পৃথিবীর প্রান্তিক জনতার অন্যতম প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম কবরের মধ্যে নিজের আবাস করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিয়ে গেলেন সুন্দর একটা বসুন্ধরা; দিয়ে গেলেন মুক্তি; রেখে গেলেন বিপ্লবের ধারাবাহিকতা।

পরিচিতজনের মন্তব্য

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সম্পর্কে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপ্রতিবেশিদের কাছে জানা যায়, তিনি ছিলেন একজন অতি সহজ সরল মানুষ। কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করতেন না। ছোট বড়ো অনেকেই তাঁর সাথে হাসিঠাট্টা করলেও তিনি কখনো রাগ করতেন না। সদাহাস্যজ্বল জাহাঙ্গীর আলম সবার সাথেই মিশতে পারতেন। তাঁর কোন মান অভিমান ছিলো না। একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন তিনি।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম মৃত্যুর আগে তাঁর পরিবারের ছয়জন সদস্যকে রেখে গেছেন। তাঁর বাবা মজিদ মিয়া (৫৫) একজন প্রান্তিক কৃষক। মা আফিয়া (৪৫) একজন গৃহিণী। একমাত্র বোন মানসুরা (২৭) স্বামী পরিত্যক্ত গৃহিণী। এখন সে বাবার বাড়িতেই থাকেন। একমাত্র ভাই মোহাম্মদ সাইদুল (২৫) ব্যাটারি তৈরির কারাখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। স্ত্রী (২৬) একজন গৃহিণী। একমাত্র কন্যা মোছাম্মৎ মোহনা (৬) উইসডম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্লে-তে পড়ে। শহীদের বাবা মজিদ মিয়ার ঘর টিনের তৈরি। নিজেদের জায়গায় মাত্র ২% জমি আছে। ভরণপোষণ চলছে ছোট ভাইয়ের সীমিত উপার্জনে। পরিবারের অন্য কোন সদস্যরা উপার্জন সংক্রান্ত কোনো কাজের সাথে জড়িত নন।

প্রস্তাবনা

এমতাবস্থায় শহীদ জাহাঙ্গীর আলমের রেখে যাওয়া পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

শহীদের স্ত্রী-সন্তান ও মা-বাবার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা;

একমাত্র মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানো;

ছোট ভাইকে কোন ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়া;

শহীদের বিধবা স্ত্রী আর স্বামী পরিত্যাক্ত বোনের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা এবং তারা সম্মতি দিলে উপযুক্ত জায়গায় পাত্রস্থ করা এই পরিবারের জন্য সময়ের দাবি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

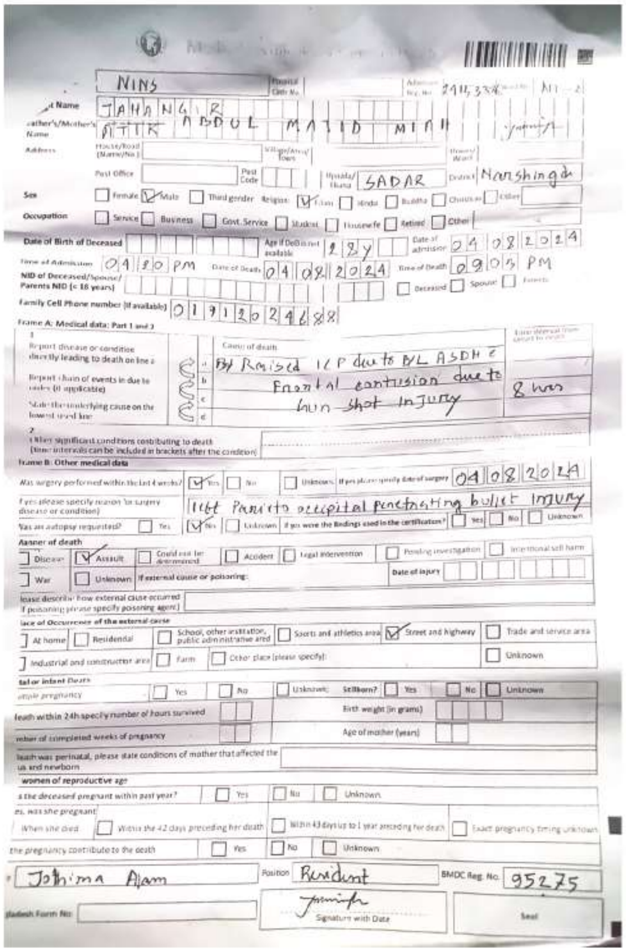

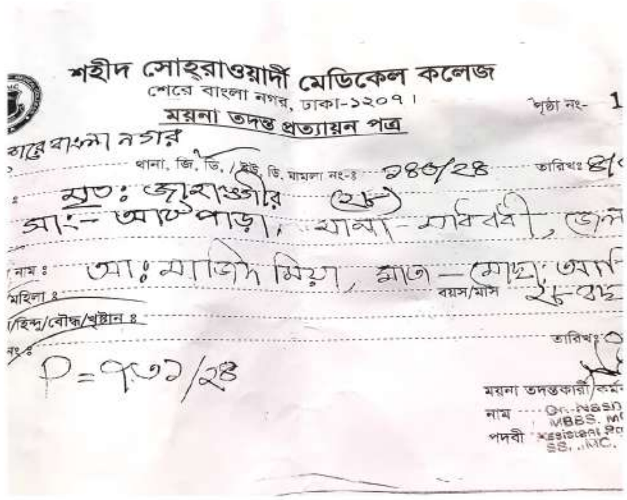

এক নজরে শহীদ জাহাঙ্গীর আলম

পূর্ণ নাম	: জাহাঙ্গীর আলম
জন্ম	: ১ জানুয়ারি ১৯৯০
মৃত্যু	: ৪ আগস্ট ২০২৪
জন্মস্থান	: আটপাইকা, নরসিংদী
পিতার নাম	: মজিদ মিয়া
মাতার নাম	: আফিয়া
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম - আটপাইকা, ওয়ার্ড নং ৭, থানা - মাধবদী, জেলা- নরসিংদী
পেশাগত পরিচয়	: রিকশাচালক
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ০৬
আন্দোলনে যোগদান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, মাধবদী পৌরসভার সামনে
আহত হওয়ার সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২ টা, পৌরসভার সামনে
আঘাতকারী	: আওয়ামীলীগ সন্ত্রাস
শহীদ হওয়ার দিন সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, রাত ৯ টায়, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল
জানাযার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বাদ আসর, গ্রামের ঈদগাঁহ মাঠ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজের গ্রামের কবরস্থান

শহীদ মো: মোহসীন

ক্রমিক : ১৯৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৬

পরিচিতি

মো: মোহসীন পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি ২১ অক্টোবর ১৯৬০, নারায়াণগঞ্জের বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার স্থায়ী ঠিকানা বাহাদুরপুর। তার পিতার নাম মো: ছলিমউদ্দীন, মাতার নাম অহিয়া বেগম। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। আগেকার দিনে মানুষ মনে করত মেয়ে হলে তার উপর মনে হয় আল্লাহ খুশি নয় তাই সকলেই ছেলে চাইতো। ছলিমুদ্দিন ও আহিয়া বেগমের ঘরে প্রথমে মেয়ে সন্তান আসায় তারা একটু অখুশিই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান যখন ছেলে হলেন তখন তাদের আনন্দ দেখে কে। আর সেই সন্তানের নামই মোহসীন। জন্মের সময় যেমন মা বাবাকে খুশি করেছিলেন তেমনই মৃত্যুর সময়ও আল্লাহকে খুশি করে তিনি পরকালে পাড়ি দিলেন। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ইসলামী আন্দোলন করা ফরজ তাই তিনি এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। শহীদ মো: মোহসীন ডায়বেটিকস এর রোগী ছিলেন। তিনি একবার ব্রেইন স্ট্রোক এবং হার্ট এটাক করেছিলেন। ২৫-৩০ বছর যাবত ব্যবসা করত। শহীদ মো: মোহসীনের ব্যবসা থেকে মাসে আনুমানিক ৭০০০ টাকা আয় হতো। তার ১৫ শতাংশ জমির উপর একটি বাড়ি আছে এবং ঘরভাড়া বাবদ ৭০০০ টাকা আসে। টিনের তৈরি ৫ টি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। তাদের কোন ফসলি জমি নেই। এসব কিছু রেখে গত ২২ জুলাই ২০২৪ তারিখে তিনি আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে শাহাদাতের সুধা পান করলেন।

শাহাদাতের ঘটনা

গত ১৫ বছর আওয়ামী লীগ এদেশের মানুষকে বন্দী করে রেখেছিল। যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করেছে, জেলে দিয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। তাদের মত করে তারা দেশ চালিয়েছে, জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্খার দিকে কোন নজর দেয়নি। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল মানুষ তাদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে। হাজার হাজার মা বোনকে ধর্ষণ করেছে কিন্তু কোন বিচার হয়নি। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তারা দেশ থেকে পাচার করেছে। এত অত্যাচার নির্যাতনের পরেও কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি তাদের ভয়ে। কিন্তু আজ ছাত্র-জনতা তাদের রক্ত চক্ষুর বিপরীতে জীবন বাজি রেখে রাজপথে নেমেছে। তারা শপথ করেছে এ দেশ থেকে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েই ঘরে ফিরবে নয়তো শহীদ হবে। অবশেষে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সেই অত্যাচারীরা নিজেরাই এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন। এটা থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা কী পরিমাণ অত্যাচার-নির্যাতন করেছেন মানুষের ওপর। তাদের পতন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর জন্য তারা শহীদ মোহসীনের মত হাজারো নিষ্পাপ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

সেদিন যা হয়েছিল

আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী এবং কুখ্যাত পুলিশবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন দেখে মোহসীন নিজেকে বাড়িতে বন্দী করে রাখতে পারেনি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামীলীগ সরকার ও তার দোসররা যখন সাধারণ ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে, তাদেরকে গ্রেফতার করছে তখন তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রাজপথে নেমে আসলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তার নৈতিক দায়িত্ব এটা ভেবেই তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মাধবদী বড় মসজিদ বাজারে ২২ জুলাই ২০২৪ দুপুর ১.৩০ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায় তাঁর হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ছাত্র-জনতা তাকে মাধবদী সিটি হাসপাতাল নিয়ে যায়। এরপর এখান থেকে তাকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার জন্য দায়ী এই খুনি হাসিনা সরকার, তাদের এ সকল নরকী কর্মকান্ডের ফলে কত মানুষের জীবন চলে গেছে তার কোন হিসাব নেই। তারা ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ, হত্যা, গুম, খুন সকল ধরনের অরাজকতা চালিয়েছে। তাদেরকে নিশ্চুপ করে দিতে চেয়ে ছিলো। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয়নি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ সহযোগিতায় সাধারণ ছাত্র-জনতা তাদের পতন ঘটিয়েছে। এ দেশ থেকে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের উৎখাত হয়েছে।

তার এক সহকর্মীর বক্তব্য

শহীদ মো: মোহসীন ছিলেন একজন সৎ কাপড় ব্যবসায়ী। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না এবং মিথ্যাকে প্রশ্রয় ও দেননি। যেখানে অন্যায় হতো সেখানে তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তার সব সময় চাওয়া ছিল দুর্নীতিমুক্ত এবং অভাবমুক্ত একটি বাংলাদেশ। তিনি বলতেন বাংলাদেশে যদি কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই এ দেশে শান্তি ফিরে আসবে। তাই তিনি কুরআনের আন্দোলনে সব সময় সক্রিয় ছিলেন।

পারিবারিক অবস্থা

সে কাপড় ব্যবসা কমিশনে করত। ২৫-৩০ বছর যাবত ব্যবসা করত। শহীদ মো: মোহসীনের ব্যবসায় থেকে মাসে আনুমানিক ৭০০০ টাকা আয় হয়। তার ১৫ শতাংশ জমির উপর একটি বাড়ি আছে এবং ঘরভাড়া বাবদ ৭০০০ টাকা আসে। টিনের তৈরি ৫ টি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। তাদের কোন ফসলি জমি নেই। তার বাসায় শুধু তার স্ত্রী থাকেন।

এক নজরে শহীদ মো: মোহসীন

নাম	: মো: মোহসীন
জন্ম তারিখ	: ২৯-১০-১৯৬০
জন্মস্থান	: আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ,
পেশা	: কাপড় ব্যবসায়ী
বর্তমান ঠিকানা	
গ্রাম	: বাহাদুরপুর
ইউনিয়ন	: রসুলপুর
থানা	: আড়াই হাজার , জেলা : নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : বাহাদুরপুর
ইউনিয়ন	: রসুলপুর
থানা	: আড়াই হাজার , জেলা : নারায়ণগঞ্জ
পরিবার	
পিতার নাম	: মৃত: ছলিমউদ্দীন, মাতার নাম: মৃত : আহিয়া বেগম
মেয়ে	: ৩ জন ১. অনিয়া(২৮) বিবাহিতা ২. রুনা আক্তার (২৫) বিবাহিতা ৩. মোছা: রিয়া (২০) বিবাহিতা
আঘাতকারীর	: আওয়ামীলীগ, পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: সাদবদী বড় মসজিদ বাজার ,নারায়ণগঞ্জ ২২-৭-২০২৪, দুপুর ১:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: নরসিংদী সদর হাসপাতালে ২২-৭-২০২৪ দুপুর ২:৩০
কবরস্থান	: বাহাদুরপুর ঈদগাহ ময়দান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান
২. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

শহীদ আমজাদ হোসেন

ক্রমিক : ১৯৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৭

পরিচিতি

আমজাদ হোসেন শিবপুর আসাদ কলেজের প্রাণীবিদ্যা গ্রুপের অনার্স ৩য় বর্ষে একজন ছাত্র। সে ৯ ডিসেম্বর ২০০১ সালে নরসিংদী জেলার রামপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আরমান,তিনি পেশায় একজন কৃষক। ময়ের নাম মোসাঃ দেলোয়ারা, তিনি একজন গৃহিণী। আমজাদ হোসেন নানুর বাড়িতে থাকতো। বাড়ি পলাশ থানায় হলেও লেখাপড়া শিবপুর থানায় করেছে। কারণ শিবপুর থানা গ্রাম থেকে কাছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অনেক বেশি। জীবনে অনেক বড় স্বপ্ন ছিল ভালো চাকরি করবে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করবে। এজন্য শহীদ আমজাদ এসএসসি এবং এইচএসসি তে বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করেছেন। পরবর্তীতে অনার্সেও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে লেখাপড়া করেন। সকল দিক থেকে সে ছিল গোছালো ও রুচিশীল মানুষ ছিলেন। টিউশনি করে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালাতো। শিবপুর সরকারি শহীদ আসাদ কলেজে প্রাণিবিদ্যা বিষয় নিয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়লেও পারিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য ছোটখাটো কোন চাকরির খোঁজ করছিলেন। কিন্তু ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার গোপনে মুক্তিযোদ্ধা এবং আওয়ামীলীগ ছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের সরকারি চাকরিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাই আমজাদ হোসেন এই বৈষম্য দূর করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। অবশেষে ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে ইটাখোলা ফাঁড়ি পুলিশের গুলিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের ঘটনা

আমজাদ বাড়ি থেকে বের হয় খেলার মাঠে যাবে বলে যাওয়ার আগে তার মাকে বলল মা একটু ক্ষুধা লেগেছে নুডলস রান্না করে দাও। মা ছেলের কথা শুনে নুডলস রান্না করে দিল। কিন্তু কে জানে শহীদ আমজাদের মায়ের হাতের এই নুডলস জীবনের শেষ খাওয়া হবে! মা মনে করল তার ছেলে বুঝি প্রতিদিনের মতো খেলে সন্ধ্যায়

বাড়ি ফিরবে। ছেলে বাড়ি ফিরল একটু রাত করে। কারণ ওই সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করার পর হাসপাতালে বিভিন্ন কাগজপত্রের সমস্যায় তার বাড়ি ফিরতে দেরি গেছে। মায়ের কাছে ছেলে ঠিকই ফিরে আসলো কিন্তু বড় একটি সার্টিফিকেট নিয়ে সেটি হল শাহাদাতের মর্যাদা। আমজাদ হোসেন ১৯ জুলাই বিকাল আনুমানিক ৪ টার দিকে ছাত্র বন্ধুদের সাথে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র-জনতা মিছিল করতে করতে ইটাখোলা ফাঁড়ির সামনে যায়। মিছিলের সামনের দিকে ছিলেন আমজাদ হোসেন। তিনি তার হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে ছাত্রদের এই মিছিলে স্লোগান দিচ্ছিলেন। আমজাদ হোসেনের স্লোগানের শক্তিতেই যেন পিছনের সকল ছাত্র-জনতা তাদের হৃদয়ে শতগুণ শক্তি বৃদ্ধি করে নিচ্ছিল। কিন্তু স্বৈরচার আওয়ামী সরকার প্রধান শেখ হাসিনর নির্দেশে তার পোষা কিছু পুলিশ নামে সন্ত্রাসী ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ হায়েনারা মিছিলের উপর এলোপাতাড়ি গুলি করার প্রস্তুতি নেয়। প্রথমে চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। হঠাৎ পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করা শুরু করলো। দেশের মানুষের ঘাম ঝরানো টাকায় যে পুলিশের বেতন হয় সেই সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের টাকায় কেনা রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়তে থাকে সাধারণ ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। একটু পরেই সামনের দিকে স্লোগান দিতে দেখে অকুতোভয় বীর আমজাদকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুড়ে। একটি গুলি এসে লাগে তার মাথায়। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থল থেকে ছাত্র-জনতা তাকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত্ ঘোষণা করে । তখন সময় রাত ৮:৩০।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে। শাশ্বত সত্য উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আল্লাহর একান্ত প্রিয় নির্ভীক সিপাহসালার যোদ্ধাগণ যুগ যুগ ধরে সদা-সর্বদা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। অপরদিকে মিথ্যার ধারক-বাহক বলে পরিচিত যারা, সত্য যাদের অন্তরে তীরের ন্যায় বিঁধে, তারা সব সময়ই এই শাশ্বত সত্যের টুঁটি চেপে ধরে রাখতে চেয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস সাক্ষী দেয়, ন্যায় এবং ইনসাফকে বারবার ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্মই হয়েছে সত্যের বিরুদ্ধে। তাই তারা বারবার সত্যনিষ্ঠ পথে যারা চলতে চায় তাদেরকে জেল-জুলুম, খুন, গুম এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিঃশেষ করতে চেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোন স্বৈরশাসক শত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরেও শত জুলুম নির্যাতনের পরেও ন্যায় এবং ইনসাফের পথে মানুষদের দাবিয়ে রাখতে পারেনি। অবৈধ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাও পারলো না।

রায়হান নামে তার এক বন্ধুর মন্তব্য

শহীদ আমজাদের সাথে আমার দীর্ঘ ৮ বছরের বন্ধুত্ব। সে একজন ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী মানুষ ছিল। নিয়মিত নামাজ পড়ত। তার ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করত সে খেলাধুলায় যেমন ভাল ছিল পড়াশুনায়ও তেমন ভালো ছিল। পরোপকারী ও মিশুক প্রকৃতির ছিল। এই আন্দোলনে শুরু থেকেই স্বক্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে আমজাদ । আমি আমার বন্ধুর হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করছি এবং হুকুমদাতা সহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রত্যাশা করছি।

বড় ভাই আকরাম হোসেনের মন্তব্য

আমজাদ ছিল আমাদের পরিবারের স্বপ্ন। সে মেধাবী ছিল তাই তাকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন আঁকতাম। আমাদের নিজস্ব কোন জমি জমা নেই। তাই ছোটকাল থেকেই আমরা নানার বাসায় বসবাস করি। ভেবেছিলাম আমজাদ বড় হয়ে অনেক বড় চাকরি করবে এবং আমাদের সকলের অভাব দূর করবে। যেখানেই খেলতে যেত সে সবার চাইতে ভালো খেলতো। কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সে পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। আন্দোলনে যাওয়ার আগের দিন সে আমার সাথে পরামর্শ করেছিল যে আমরা সাধারণ ছাত্ররা কি করতে পারি এখন? আমি বলেছিলাম যেটা সঠিক সেটাই করবে। তবে আমরা যেহেতু গরিব তাই এমন কিছু যেন না করা হয় যা আমাদের ক্ষতি ডেকে আনবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সে মন থেকে যোগ দেয়।

শহীদ আমজাদ হোসেনের শিক্ষা জীবন

দারিদ্র পরিবারের জন্ম নিলেও শহীদ আমজাদ হোসেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য ছোটকাল থেকেই অভাবের সাথে সংগ্রাম করে অনেক ভালোভাবে লেখাপড়া করে আসছিল। প্রাইমারি থেকেই শুরু করে কলেজ পর্যন্ত শিবপুর শহরেই তিনি লেখাপড়া করেছেন। প্রতিটি ক্লাসেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতেন। গরিব ঘরের সন্তান হলেও অনেক ধনী পরিবারের সন্তানকে পেছনে ফেলে ক্লাসে তার স্থান হত সামনের দিকে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ভালো ফলাফল নিয়ে উত্তীর্ণ হন। অবশেষে শিবপুর সরকারি শহীদ আসাদ কলেজে প্রাণিবিদ্যা নিয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষে লেখাপড়া করছিলেন।

পারিবারিক অবস্থা

নিজস্ব জমি,বাড়ি কিছুই নেই। অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল। বাবা কৃষিকাজ করে। বড় ভাই আকরাম হোসেন বেকার অবস্থায় বাড়িতে আছেন । ছোটকাল থেকেই নানার বাসায় বসবাস। ছোট একটি ভাই আছে নবম শ্রেণীতে পড়ে। বর্তমান অবস্থায় ছোট ভাইয়ের লেখাপড়া চালানো অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: আমজাদ হোসেন
Name: AMZAD HOSSAIN
পিতা: আরমান মিয়া
মাতা: সেলোয়ারা বেগম
Date of Birth: 09 Dec 2001
ID NO: 9585147987

এক নজরে শহীদ আমজাদ হোসেন

নাম	: আমজাদ হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০৯-১২-২০০১
জন্মস্থান	: রামপুর, পলাশ, নরসিংদী
পেশা	: ছাত্র, শিবপুর সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ ,অনার্স তৃতীয় বর্ষ, বিষয়: প্রাণিবিদ্যা
বর্তমান ঠিকানা	
গ্রাম	: রামপুর
ইউনিয়ন	: গজারিয়া
থানা	: পলাশ, জেলা : নরসিংদী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : রামপুর
ইউনিয়ন	: গজারিয়া
থানা	: পলাশ, জেলা : নরসিংদী
পিতার নাম	: আরমান (৬২)কৃষিকাজ
মাতার নাম	: মোছাঃ দেলোয়ারা (৫৫)গৃহিণী
শহীদের ভাই-বোন	: ১. আকরাম হোসেন, (২৬)বিবাহিত
	: ২. নাসরিন, গৃহিণী (২৪)
	: ৩. নাজমিন, গৃহিণী (২০)
	: ৪.আকতার হোসেন (১৫) ছাত্র, নবম শ্রেণী
আঘাতকারীর	: ইটাখোলা ফাড়ির পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: ইটাখোলা নরসিংদী ১৯-৭-২০২৪, রাত ৮;০০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: নরসিংদী সদর হাসপাতালে ১৯-৭-২০২৪, রাত ৮;৩০
কবরস্থান	: রামপুর বাজার, কবরস্থানপুর

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. বেকার ভাইয়ের চাকরীর ব্যবস্থা করা
৩. ছোট ভাইয়ের পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করা
৪. বাসস্থান নির্মাণ করে দেয়া

শহীদ রিয়া গোপ

ক্রমিক : ২০০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৮

পরিচিতি

সদা চটপটে, হাস্যোজ্জ্বল রিয়া গোপ ২৪ নভেম্বর ২০১৭ সালে জন্মগ্রহণ করে। মারা যাওয়ার সময় সে ৬ বছর ৬ মাস বয়সী একজন ছাত্রী। সে নারায়ণগঞ্জের ৩২ নং নয়ামাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। রিয়ার হাতের লেখা খুবই সুন্দর এবং সে পড়াশুনায় খুবই আগ্রহী ছিল। তার বাবা দিপক কুমার গোপ, বয়স ৪০ বছর, এবং মা বিউটি ঘোষ, বয়স ৩০ বছর। রিয়া খুবই ভ্রমণপ্রিয় ছিল। বাবার আদুরে সুযোগ পেলেই বাইরে ঘুরতে যাওয়ার বায়না ধরতো।

জ্ঞানপিপাসু রিয়া

শিশু শহীদ রিয়া কেবলমাত্র ঘুরাফেরা, খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করেই বেড়াতো না। পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবেশীর কাজেও সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো এতো অল্প বয়সী হওয়ার পরেও। এতোকিছু করেও পড়াশুনা আর জ্ঞান-সাধনার আগ্রহে মোটেও ভাটা পড়েনি তার। সে যেমন ছিলো ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী তেমনি স্কুলের পড়ালেখায়ও ছিলো মেধাবী, বুদ্ধিমান ও চৌকস। সহপাঠীদের সাথে সবসময় সে আপন ভাই-বোনের মতো মেশার চেষ্টা করতো। নিজের পাঠ শেখার পাশাপাশি অন্যদেরকেও যথাসাধ্য সাহায্য করতো রিয়া।

শহীদ রিয়ার ছিলো বই পড়ার নেশা। সমবয়সী অথবা বড় কাজিন ভাই-বোন ও স্কুলের প্রিয় শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বই নিয়ে পড়তো জ্ঞানপিপাসু রিয়া। বাবার পুরাতন এন্ড্রয়েড মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন কিছু জানা আর শেখার চেষ্টা করে সে। স্কুলে বন্ধুর সংখ্যাও বেড়েছে তার। সেখানেও নিয়মিত গপ্পো সপ্পো করে, বড়দের অভিজ্ঞতার কথা শুনে। বন্ধু, সহপাঠী আর বড়দের সাথে আড্ডায় চলে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের গল্প।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা তরুণ প্রতিবাদী সমাজ সচেতন আযিযুল মিয়ার দেখে মনে আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

পরপারে পাড়ি

সারাদেশ ছাত্র-জনতার আন্দোলন সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠে। রাজপথে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার বজ্রকণ্ঠ হুংকার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। ক্ষমতা লোভী স্বৈরাচারী হাসিনা এমন বিপ্লবী আওয়াজ চিরতরে শেষ করে দিতে লাশের মিছিলে মেতে উঠে, হয়ে উঠে রক্ত পিপাসু পিশাচ। তার বর্বরোচিত পৈশাচিকতা থেকে বাদ যায়নি আবালবৃদ্ধবনিতা। বাদ যায়নি হেসে খেলে বেড়ে উঠা অবুঝ শিশু রিয়াও।

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক দুঃখজনক দিন। দেশের ছাত্র-জনতা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছিল। সেই সময় রিয়া তার বাসার ছাদে খেলছিল। বিকাল ৫ টার দিকে, একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় রিয়া গুলিবিদ্ধ হয়। নিভে যায় তার জীবন প্রদীপ। ঘটনাটি ঘটে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার ঘাতক সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের সময়। রিয়ার মাথায় গুলি লাগে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুঃখজনকভাবে, রিয়া ২৪ জুলাই ২০২৪, সকাল ১০ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। তার মৃত্যুর খবরটি পরিবার এবং প্রতিবেশীদের জন্য গভীর শোকের সৃষ্টি করে।

অনুভূতি

রিয়ার মৃত্যু শুধুমাত্র একটি পরিবারকে নয়, বরং পুরো সমাজকে আহত করেছে। তার স্বপ্ন, খেলাধুলা এবং জীবনযাত্রা অকালেই থেমে গেছে। এই ঘটনার মাধ্যমে দেশবাসী একটি কঠিন সত্যের সম্মুখীন হয়েছে, যা আমাদের সবাইকে ভাবতে বাধ্য করে। রিয়া গোপের মতো নিরীহ শিশুদের প্রতি যে অন্যায় ঘটেছে, তা আমাদের মানবিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: রিয়া গোপ
জন্ম তারিখ	: ২৪/১১/২০১৭
বয়স	: ৬ বছর ৬ মাস
পেশা	: ছাত্রী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	: নয়ামাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শ্রেণি	: ১ম

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমান ঠিকানা

বাসা	: ২৭
এলাকা	: নয়ামাঠ
থানা	: সদর
জেলা	: নারায়নগঞ্জ

পরিবারের তথ্য

পিতার নাম	: দিপক কুমার গোপ
বয়স	: ৪০
মায়ের নাম	: বিউটি ঘোষ
বয়স	: ৩০
ঘটনার স্থান	: বাসার ছাদে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার ঘাতক সশস্ত্র বাহিনী
আহত হওয়ার তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২৪, বিকাল ৫টা
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ২৪ জুলাই ২০২৪, সকাল ১০ টা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
সমাধী	: নিজ এলাকা (দাহ)

প্রস্তাবনা

১. ভালো একটা বাসস্থান খুব জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন।

২. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

শহীদ আহসান কবির (শরিফ)

ক্রমিক : ২০১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৬৯

পরিচিতি

আহসান কবির (শরিফ) ১৯৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ সানার পাড়, ডেমরা, ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রো বায়োলজিতে এমএ এবং প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সম্পন্ন করেছেন।

আহসানের পিতার নাম মো: আনোয়ার হোসেন, যিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বয়স ৬২ বছর। তাঁর মায়ের নাম মোসা: খালেদা কবির, যিনি ৫১ বছর বয়সী গৃহিণী। আহসান ডিভোর্সি এবং তাঁর পরিবারে ৯ সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে বড় ভাই মাহবুব কবীর সিঙ্গাপুরে বসবাস করছেন এবং বোন রোকেয়া কবীর বিবাহিত ও গৃহিণী। তিনি মাস্টার বাড়ী, দক্ষিণ মানার পার, ডেমরা, ঢাকায় পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। তার মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা ছিল।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ

জনাব আহসান কবীরের ৬ কাঠা জমি আছে ঢাকার ডেমরা সানার পাড় এলাকায়। দুই তলা ৪০০ স্কয়ার ফুট বিশিষ্ট বিল্ডিং আছে। কুমিল্লার তিতাস গ্রামে ৬ শতাংশ জমি আছে। শহীদ পরিবারের বর্তমানে নিয়মিত কোন মাসিক আয় নেই। শহীদের বড় ভাই সিঙ্গাপুর থাকেন। মাঝে মধ্যে পরিবারের জন্য খরচের টাকা পাঠান।

পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ আহসান কবীর বিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে তাদের ডিভোর্স হয়।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে দেশে চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন শহীদ আহসান কবীর। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে একটা সংগঠন তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহবান জানানো হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এ কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবিতে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। লাগাতার আন্দোলনের ফলে ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর ২০২১ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কে এম কামরুল

কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন।

৬ জুন ২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (Anti-discrimination Students Movement) ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়। এরপর থেকেই পরিস্থিতি বুঝে তাদের পক্ষ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা আসতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনে গুন্ডা ছাত্রলীগ যুবলীগ আর আওয়ামীলীগসহ ক্ষমতাসীন দলের অন্য কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। ১৬ জুলাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটা অপ্রত্যাশিত ভিডিও দেখা যায়। ভিডিওতে সে দেখে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করছে। অকুতোভয় আবু সাঈদ দুইহাত প্রসারিত করে বুক পেতে দিয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকারের পদলেহনকারী বজ্জাত পুলিশের কাছে। কতোটা কাপুরুষতা আর কতটা নির্লজ্জতার সাথে তারা গুলি করো আবু সাঈদের বুকে, পেটে। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনায় গোটা দেশের ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ

২১ জুলাই ২০২৪ ঢাকার ডেমরা সানারপার চউক পাম্পের পশ্চিমে-রাস্তার পাশে চায়ের দোকানের পাশে আন্দোলনের ছবি তুলছিলেন। তখন দুপুর প্রায় ৩ টার সময় হঠাৎ হেলিকপ্টার থেকে গুলি এসে আহসান কবীরের বুক বরাবর লেগে কোমরের পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। তাৎক্ষনিক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শহীদ আহসান কবির।

জানাজা ও দাফন

শহীদ আহসান কবীরের মরদেহ হাসপাতালে থাকা অবস্থায় স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসী কর্তৃক পোষ্টমর্টেম না করে দ্রুত লাশ দাফন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, অতপর শহীদের পরিবার হুমকি ও ভয়ে পোষ্টমর্টেম না করিয়া বাদ মাগরিব জানাজা শেষে স্থানীয় শুকুরসী কবরস্থানে তাকে দাফন করেন।

শহীদ সম্পর্কে পিতার অনুভূতি

শহীদের পিতা মোঃ হুমায়ুন কবীর নিজ পুত্র সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আহসান কবীর ছাত্র জীবনে খুব মেধাবী ছিলেন এবং অনেক মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। বাবা মায়ের ছোট সন্তান ছিলেন। পরিবার এবং গ্রামের মানুষদের খুব ভালোবাসতেন। খুব সহজেই সবাইকে আপন করে নিতেন। কর্ম জীবনে খুবই দক্ষ ছিলেন।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

শহীদের পিতা মোঃ হুমায়ুন কবির নিজে বাদি হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় খুনি শেখ হাসিনাকে এক নম্বর আসামী ও যথাক্রমে আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, ওবায়দুল কাদের, জুনায়েদ আহমেদ পলক, শামিম ওসমান কে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আসামী করে অভিযোগ দায়ের করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সারা দেশ যখন উত্তাল তখন প্রতিবাদী কণ্ঠ মেধাবী, কর্মঠ ব্যক্তিত্ব আহসান কবির সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে ঘাতক বাহিনী বিপ্লবী ছাত্র-জনতাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়লে ভিকটিম আহসান কবির শরিফ বুকের মধ্যখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। এক পর্যয়ে আসামীগণ জড়ো হওয়া ছাত্র-জনতাকে সাবধান করে বলে, এই ধরনের দাবী আবার উথাপন করলে সবাইকে খুন ও গুম করা হবে মর্মে হুমকী প্রদান করে।

মামলার এজাহারে আরও উল্লেখ আছে, শহীদের পিতা মোঃ হুমায়ুন কবির ছেলের বন্ধু মারফত খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং মোঃ আরিফ, রাকিব, রজ্জব ও জনি সহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন লোকের সহযোগীতায় তাকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ সানারপাড় ইস্ট ভিউ হাসপাতালে নিয়ে যান, তখন উপস্থিত ডাক্তার তাকে চিকিৎসা দেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় কর্তব্যরত ডাক্তার, বিকাল আনুমানিক ৩.৩০ টায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে স্থানীয় আসামীগণ পোষ্টমর্টেম না করে দ্রুত লাশ দাফন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে, অতপর শহীদের পরিবার আসামীগনের হুমকি ও ভয়ে পোষ্টমর্টেম না করিয়া বাদ মাগরিব জানাজা শেষে স্থানীয় শুকুরসী কবরস্থানে তাকে দাফন করেন।

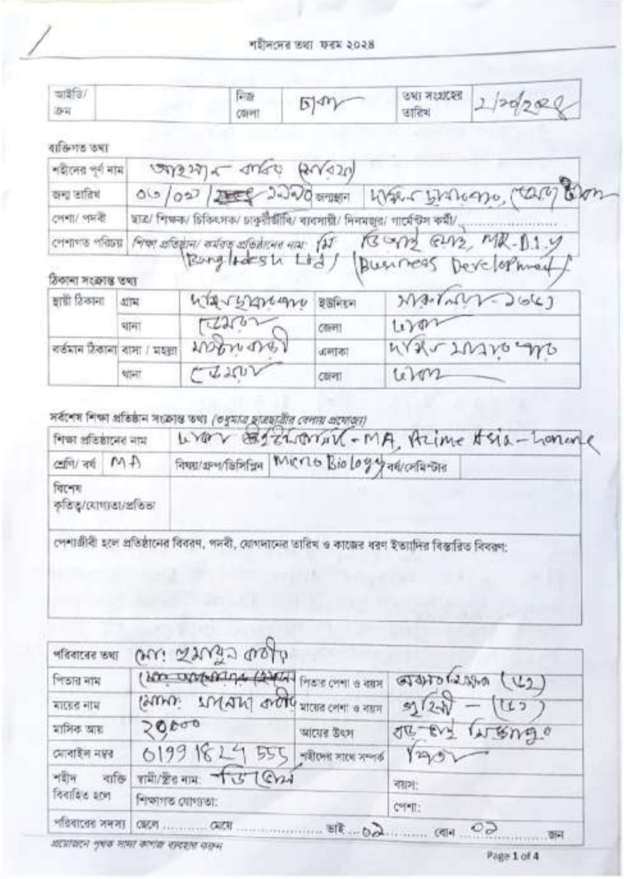

শহীদদের তথ্য ফরম ২০২৪

আইডি/ ক্রম		নিজ জেলা	ঢাকা	তথ্য সংগ্রহের তারিখ	২/১০/২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	আহসান কবির (শরিফ)		
জন্ম তারিখ	[illegible]	জন্মস্থান	[illegible]
পেশা/ পদবী	ছাত্র/ শিক্ষক/ চিকিৎসক/ চাকুরীজীবি/ ব্যবসায়ী/ দিনমজুর/ গার্মেন্টস কর্মী/		
পেশাগত পরিচয়	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম: [illegible] Bangladesh Ltd / Business Development		

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা	গ্রাম	[illegible]	ইউনিয়ন	[illegible]
	থানা	[illegible]	জেলা	ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	বাসা / মহল্লা	[illegible]	এলাকা	[illegible]
	থানা	[illegible]	জেলা	ঢাকা

সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য (শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীর বেলায় প্রযোজ্য)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	[illegible] - MA, Prime Asia - Honors				
শ্রেণি/ বর্ষ	MA	বিষয়/গ্রুপ/ডিসিপ্লিন	Micro Biology	বর্ষ/সেমিস্টার	
বিশেষ কৃতিত্ব/যোগ্যতা/প্রতিভা					

পেশাজীবী হলে প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, পদবী, যোগদানের তারিখ ও কাজের ধরণ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ:

পরিবারের তথ্য	মো: হুমায়ুন কবির		
পিতার নাম	[illegible]	পিতার পেশা ও বয়স	[illegible]
মায়ের নাম	মোসা: [illegible] কবির	মায়ের পেশা ও বয়স	গৃহিনী - [illegible]
মাসিক আয়	20,000	আয়ের উৎস	[illegible]
মোবাইল নম্বর	01991824555	শহীদের সাথে সম্পর্ক	পিতা
শহীদ ব্যক্তি বিবাহিত হলে	স্বামী/স্ত্রীর নাম: নট মেরিড	বয়স:	
	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	পেশা:	
পরিবারের সদস্য	ছেলে .... মেয়ে .... ভাই ...০২... বোন ...০১... জন		

প্রয়োজনে পৃথক সাদা কাগজ ব্যবহার করুন

Page 1 of 4

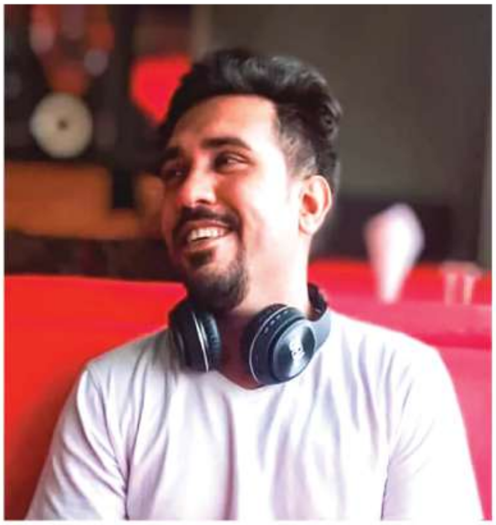

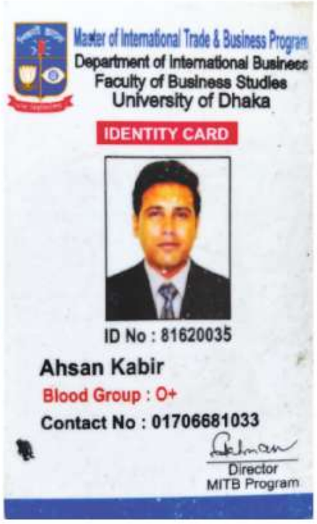

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম : আহসান কবির (শরিফ)
জন্ম তারিখ : ০৩/০৯/১৯৯০
পেশা : চাকুরীজীবি
জন্মস্থান : দক্ষিণ সানার পাড়, ডেমরা, ঢাকা
কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম : MR. DIY Bangladesh Ltd. (Business Development)

স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম : দক্ষিণ সানার পাড়
ইউনিয়ন : সারুলিয়া-১৩৫১
থানা : ডেমরা
জেলা : ঢাকা

বর্তমান ঠিকানা

বাসা/ মহল্লা : মাস্টার বাড়ী
এলাকা : দক্ষিন মানার পার
থানা : ডেমরা
জেলা : ঢাকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : ঢাকা ইউনিভার্সিটি - MA, Prime Asia- Honors
বিষয় : Micro Biology
শ্রেণি/বর্ষ : MA
আহত হওয়ার স্থান : সানার পার চউক পাম্পের পশ্চিম পাশে রাস্তায়
আক্রমণকারী : হেলিকপ্টার থেকে ঘাতক পুলিশ/বিজিবি
আহত হওয়ার তারিখ ও সময় : ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ৩.৩০ টা
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান : ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ৩.৩০ টা, ঘটনাস্থল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : শুকুরসী কবরস্থান ডেমরা

পরিবারের তথ্য

পিতার নাম : মো: হুমায়ুন কবীর, পিতার পেশা ও বয়স: অবসর শিক্ষক (৬২)
মায়ের নাম : মোসা: খালেদা কবির, মায়ের পেশা ও বয়স: গৃহিণী (৬১)
মাসিক আয় : ২০০০০/-
বৈবাহিক সম্পর্ক : ডিভোর্স
পরিবারের সদস্য : ছেলে মেয়ে ভাই ০৯.
বড় ভাই : মাহবুব কবীর (৩৭), সিঙ্গাপুর
বোন : রোকেয়া কবীর (৩৯), বিবাহিত, গৃহিণী

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতার জন্য ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে
২. শহীদের পরিবারেরে জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করা

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

যারা আমার জন্য হিজরত করেছে, নিজের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই পথে লড়াই করে নিহত হয়েছে, আমি তাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেব।

-সূরা আল-ইমরান-১৯৫

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

তৃতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী